উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা

মোছাঃ তছলিমা খাতুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

c_g Aa¨vq : Dwbk kZ‡Ki evsjv Dcb¨v‡m BwZnvm‡PZbv : cUfwg 1-15

wØZxq Aa¨vq : f‡'e g‡Lvcva¨v‡qi BwZnvm‡PZbv 16-49

ZZxq Aa¨vq : f‡'e g‡Lvcva¨v‡qi BwZnvm‡PZbv 50-93

PZ_ Aa¨vq : ew¼gP‡›'i Dcb¨v‡m BwZnvm‡PZbv 94-185

cÂg Aa¨vq : gxi gkviid †nv‡m‡bi BwZnvm‡PZbv 186-201

lô Aa¨vq : iex›'bv‡_i BwZnvm‡PZbvi ¯vZš¨ 202-222

Dcmsnvi 223-228

cwiwkó 229-232

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোছাঃ তছলিমা খাতুন কর্তৃক উপস্থাপিত 'উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। অভিসন্দর্ভটি তাঁর একক ও মৌলিক গবেষণার ফসল। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ প্রকাশ কিংবা ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জমা দেওয়া হয়নি।

(W±i iwdKDjøvn Lvb)

অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

mvi-ms‡¶c (Abstract)

বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ও জীবনের ইতিহাস বিশ্লেষণে ঊনিশ শতকের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃটিশ উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত বাংলা ভূখণ্ডে প্রথম পর্যায়ে বাণিজ্য পুঁজি (Mercantile Capital) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্প পুঁজির (Industrial Capital) বিকাশ জন-জীবনের সামগ্রীক জীবনচর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করে। দীর্ঘকালের পশ্চাদপদ সমাজ কাঠামোতে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা মানুষের মেধা, জ্ঞান, সমাজ ভাবনা ও ইতিহাস চেতনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন ঘটায়। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ভব ঘটে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), মীর মোশার্‌রফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), রমেশ চন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ উপন্যাসিক এ সময় উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া বাকি সবারই ঔপন্যাসিক প্রতিভার সাধনা ও সিদ্ধি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সঙ্গত কারণেই রেনেসাঁসীয় নবচেতনার সংঘাতে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিভাবনার সমান্তরালে ইতিহাসভাবনা বহুবিধ প্রশ্ন, পরীক্ষা ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। ওপন্যাসিকদের এই জটিল মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে গেলে ঐ সময়ের ইতিহাসভাবনার গতি-প্রকৃতি ও তার দ্বন্দ্বময় চরিত্রের স্বরূপ অনুধাবন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রস্তাবিত গবেষণায় বাঙালি ঔপন্যাসিকদের ইতিহাসচেতনার স্বরূপ অন্বেষণের সূত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-ইতিহাস, ঔপন্যাসিকদের ইতিহাসভাবনা, সমাজদৃষ্টি ও শিল্প-মনস্তত্ত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সে সময়ের সমাজমানস এবং ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন উপন্যাসে কিভাবে রূপায়িত হয়েছে, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক সমাজজীবন ঔপন্যাসিকদের চেতনাকে কিভাবে দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে তার স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে। ঊনিশ শতকের যে সমস্ত উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে লিখিত সেগুলি, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য

সমালোচনামূলক সাহিত্যকর্ম ইতিহাস ও সাহিত্য সংশ্লিষ্ট জার্নাল পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য উৎস থেকে গবেষণা কর্মটির বিশ্লেষণ আবর্তিত হয়েছে।

ঊনিশ শতকে প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহ আমার আলোচনার বিষয়বস্তু। এই সময়কালটি ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় সংঘটিত হয়েছিল উপমহাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ববহ ঘটনা সিপাহী বিপ্লব, বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ। এই সময়ে যেমন বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটেছে তেমন জাতীয়তাবাদী চেতনারও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা শুরু হয়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে।

গবেষণা কর্মটিতে ব্যবহৃত উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্যাদির তৎকালীন জ্ঞাত তথ্যের আলোকে যাচাই করা হয়েছে। এজন্য ইতিহাসের প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিসহ তথ্যের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের গ্রহণ ও বর্জনের বিষয়টিও আলোচনায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে। উপন্যাসে ব্যবহৃত তথ্যাদি প্রয়োগের উৎসসমূহ কি এবং কতটুকু শিল্পসম্মতভাবে এসেছে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যাদি প্রয়োগের সময় লেখক যদি কোন পরিবর্তন সাধন ও পক্ষপাত গ্রহণ ও কোন প্রভাবের কারণে এই কাজ করেছেন তারও স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক গবেষণার আলোকে উপন্যাসে ব্যবহৃত ঐতিহাসিক উপাদানের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া ও গবেষণা কর্মটির একটি বিশেষ দিক। সমগ্র আলোচনায় লক্ষ করা গেছে যে তৎকালীন ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহে ব্যাপকভাবে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার। ঐশ্বর্যশালী এই রাজবংশের ইতিহাসকে কেন এতো ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিভাবে তা জাতীয় জাগরণে প্রভাব ফেলেছে তারও একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া চার্লস স্টুয়ার্ট টড ও কন্টারের লিখিত মুঘল ইতিহাসের রোমান্সের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন তাও বলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচনাটি সর্বমোট পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস চেতনার বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় খণ্ডে রমেশ চন্দ্র দত্তের উপন্যাসে ইতিহাস চেতনা। তৃতীয় খণ্ডে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ইতিহাস ব্যবহারের মনস্তত্ত্ব। চতুর্থ খণ্ডে মীর মোশাররফ হোসেনের ইতিহাসবোধের স্বাতন্ত্র্য এবং ৫ম খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাস চেতনা। সবশেষে উপসংহারে গবেষণা কর্মটির সামগ্রীক আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্তি টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

f~gKv

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ হতে বিএ অনার্সসহ এম,এ ডিগ্রী লাভ করার পর সরকারী চাকুরীতে যোগদান করি। এরপর হতেই বহু দিনের সুপ্ত বাসনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষনার ও আগ্রহ প্রবল হয়। ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা শেষ করার পর সাহিত্যের প্রতি আলাদা একটি আকর্ষন বোধ করতাম। সে কারনে পি,এইচ,ডি গবেষণা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়ের উপর করার আগ্রহ জাগে। এ প্রসঙ্গে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানীর সঙ্গে আলাপ করলে তিনি আমার আগ্রহকে গুরুত্ব সহকারে নেন এবং বাংলা বিভাগের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। স্যার সবকিছু শোনার পর অনুগ্রহ করে আমার তত্বাবধায়কের ভার গ্রহণের সম্মতি প্রকাশ করেন এবং তিনি পি,এইচ,ডি গবেষণাকর্মের বিষয়টি নির্ধারণ করে দেন। গবেষণাকর্মের মূল শিরোনাম ‘ঊনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা’ বিষয়ের মূল কাঠামো তিনিই ঠিক করে দেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সহ কী ধরনের গ্রন্থ পাঠ করতে হবে তাঁর একটি দিক নির্দেশনাও তিনি দেন। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের ছাত্রী হওয়ার কারণে সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা ছিল সামান্য। এ বিষয়ে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ও প্রাজ্ঞ পরামর্শ আমার গবেষণাকর্মকে সহজ করে তুলেছে। আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমাকে গবেষণা কর্মে সুযোগ দেওয়ার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন সময় মূল্যবান তথ্যাদির অনুসন্ধান দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ইব্রাহিম ও বন্ধুবর প্রফেসর আতাউর রহমান তাদের মূল্যবান মতামত ও প্রাসঙ্গিক বই-পুস্তক দিয়ে সাহায্য করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব শরীফুল ইসলাম গবেষণার পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার কর্মস্থল ইডেন মহিলা কলেজের আমার বিভাগের সহকর্মীবৃন্দের বিভিন্ন সময়ের মূল্যবান পরামর্শ আমাকে উপকৃত করেছে। আমি তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, ইডেন কলেজের লাইব্রেরী ও আমার বিভাগের সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ও বাংলা বিভাগের সেমিনার ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে বাধিত করেছেন। আমি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভুমিকাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

গবেষণার জন্য যে গভীর মনোসংযোগের প্রয়োজন হয় সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহের মাঝে তা সুকঠিন হলেও সেক্ষেত্রে আমার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার মোঃ একিন আলী এবং দুই সন্তান মেজর আবু খালেদ আল মামুন ও আহমেদ সৈকত রুশদী তাদের নিরন্তর অনুপ্রেরণার মাধ্যমে আমার জন্য তা সম্ভব করে তুলেছে।

অভিসন্দর্ভটি নির্ভূল ও মানসম্পন্ন করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এর সম্ভাব্য যে কোন সীমাবদ্ধতার জন্য সকল দায়দায়িত্ব কেবলই আমার ।

মোছাঃ তছলিমা খাতুন

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq

Dwbk kZ‡Ki evsjv Dcb¨v‡m BwZnvm‡PZbv : cUfwg

উনিশ শতকের সাহিত্যে ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার যে প্রবণতা দেখা যায়, ইংরেজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে তার সূত্রপাত। ওয়ালটার, স্কট প্রমুখ ঔপন্যাসিক এই ধারার সূত্রপাত করেন। ইউরোপীয় রেনেঁসাসের পর থেকে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে মিথ ও ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন এবং সাহিত্যে তাকে রূপদানের প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করে। শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমাজজীবনের অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে রূপান্তর সাধন করে, তার ফলে ভূমিনির্ভর জনগোষ্ঠীকে শিল্পায়ন ও নগরায়নের সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত করে। এই মধ্যবিত্তই উপন্যাস সাহিত্যের স্রষ্টা ও পাঠক। প্রতিটি সমাজের সামাজিক রূপান্তরের এই পর্যায়ে গদ্য ও উপন্যাসশিল্পকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশের পথ সন্ধান করেছে।

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির পেছনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ইউরোপীয় রেনেঁসাসের প্রভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা ভূখণ্ডে বৃটিশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে এবং দীর্ঘকালের গ্রাম নির্ভর সমাজকাঠামোতে বাণিজ্য-পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বড় ধরনের রূপান্তর সাধিত হয়। এই রূপান্তরের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি ছিল ইংরেজি শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত হলো তখন দুই একটি ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ লেখকই ইতিহাসের উপাদানকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য উপন্যাসে ঐতিহাসিক রোমান্সগুলো ইতিহাসের উপকরণকে পরিবর্তিত রূপে ন্যস্ত করলেও সেখানে কুসংস্কার ধর্মীয় সংঘাতের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়নি।

কিন্তু ভারত বর্ষের জটিল সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের দীর্ঘ পরিসর মুসলিম এবং হিন্দু আধিপত্যের সংঘাতে এক নতুন বৈশিষ্ট লাভ করে। লেখকদের মনোজগত ইতিহাসের উপাদান সন্ধান করতে যেয়ে সেই জটিল সংঘাতময় জীবনকেই গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও দৃষ্টি-ভঙ্গির বিষবৃক্ষ রোপিত হয় ইংরেজদের হাতে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা দখলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর পরাজয় চেতনা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের এই নতুন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার মধ্যে উনিশ শতকের সমাজ মানসে জটিল বাস্তবতার মূলসূত্র নিহিত। ইউরোপীয়

রেনেঁসাসুলভ যে দৃষ্টিভঙ্গি উনিশ শতকে কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে আলোড়িত করেছিল তাদের মধ্যে ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রবণতা ইতিহাসের চরিত্রের মতই জটিল ও বিতর্কের কারণ হয়ে ওঠে।

শিল্পের কাজ হচ্ছে শুদ্ধ জীবন রচনা করা, সমাজ বাস্তবতা ও ব্যক্তির বিকাশের সূত্রসমূহ চিহ্নিত করা অথবা ইতিহাসের আলোকে সমাজ চেতনাকে যথা স্বরূপে উপস্থাপন করা। রেনেঁসাসোত্তর ইউরোপে ব্যক্তির আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা সন্ধানের প্রয়োজনে উপন্যাসিকরা ইতিহাসের উপকরণ পুনর্মূল্যায়ন ও পূনর্বিবেচনা করেছেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রচিত হয় তার অধিকাংশ রচয়িতাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্ম সন্ধানের প্রবণতায় বিশিষ্ট, যেহেতু ঐ সময়ের সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল উপনিবেশ-শৃংখলিত সে কারণে বর্তমানের পরিবর্তে ঐতিহাসিক উপকরণকেই নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ঔপন্যাসিকরা। ইতিহাসের বাস্তব সত্যকে ঐতিহাসিকরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, একজন ঔপন্যাসিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁকে নতুনভাবে রূপদান করতে পারেন। এই শিল্পমনস্তত্ত্বই এই সময়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসমূহে বিধৃত হয়েছে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লব এই উপমহাদেশ তথা বাঙালির সমাজ-মানসে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। এই দেশে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ইতিহাসবোধ জাগ্রত হতে থাকে। সিপাহী বিপ্লবের ফলে ভারতে ঔপনিবেশিক আমলের তেমন পরিবর্তন না ঘটলেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল উল্লেখযোগ্য। কারণ এই আন্দোলনের ফলে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি ভারতীয় সাধারণ জনগণের ঘৃণা তীব্র হয় এবং জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সেই সাথে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তর হয়।

কার্ল মার্কসের মতে, 'এই প্রথম সিপাহী-বাহিনী হত্যা করে তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পারিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ-মনিবদের বিরুদ্ধে, হিন্দুদের মধ্য থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে দিল্লীর সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে (দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ) বসিয়ে।'[১] ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষে তথা বাংলায় জনগণের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয় তা পরবর্তীকালে বাংলার লেখক সমাজকে প্রভাবিত ও আলোচিত করেছিল। এর বহি:প্রকাশ আমরা হিন্দু ও মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে লক্ষ্য করি এই চেতনাকে সাহিত্যে রূপদানের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে ইতিহাসের। তাই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখকরা লিখতে

থাকেন ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস। ইতিহাস হচ্ছে অতীত সমাজের ঘটে যাওয়া কর্মকাণ্ডের বিবরণ ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই অতীত যুগের রাজা-বাদশার জীবনে ঘটে যাওয়া যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা, নানান ঘাত-প্রতিঘাত ও পরিণতি। 'সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবন ব্যাখ্যাই ইতিহাস।'[২] অর্থাৎ ইতিহাস অতীত মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের কথা বলে। সুতরাং বলা যায় অতীত যুগের বর্ণিত কাহিনীই ইতিহাস। অতীতের প্রতি মানুষের দুর্বার আকর্ষণের কারণেই এর চর্চা অব্যাহত রয়েছে। অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যারা ইতিহাস নির্মাণ করেন তারা হলেন ঐতিহাসিক। তারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উৎসের সাহায্যে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন। "ইতিহাসবিদ যখন মানুষের বিবর্তনের কথা বলেন, তখন তাঁকে কেবল মানুষের বহিরঙ্গ জীবনের উপরই নির্ভর করলে চলে না। মানুষের কর্মচিন্তার অন্তরালে যে ধ্যান ও মনন ক্রিয়াশীল ছিল তার সন্ধান ও তাঁকে করতে হয়'।[৩] ইতিহাসের বিষয়বস্তু যেমন রাজা-বাদশাহদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী তেমনি সমাজ, অর্থনীতি ও জ্ঞানচর্চা ও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। 'মানবিক ঘটনা এবং মানবিক বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণই হল যথার্থ ইতিহাস'।[৪]

উপন্যাস সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা যেখানে মানব জীবনের বিচিত্র গতির প্রতিবিম্বন ঘটে থাকে তার নিজস্ব রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে। সমাজ জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নানাবিধ জটিলতা ও ব্যক্তি জীবনের সুখ-দু:খ, ব্যথা-বেদনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়-সংঘাত আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র রূপায়িত হয় উপন্যাসে। উপন্যাস সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যেসব নুতন ধরনের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম। এই উপন্যাসের অনুরূপ কোন বস্তু আমাদের পুরাতন সাহিত্যে খুজিয়া পাওয়া যায় না। .... উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী। ..... আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক একেবারে ঘনিষ্ট ও অন্তরঙ্গ। সবশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসই সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত।"[৫]

মানুষের জীবনে নিত্যদিন ঘটে যাওয়া বিষয়গুলিই সাধারণত উপন্যাসিকগণ উপন্যাসের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে সেখানে তিনি যে কাহিনী বা আখ্যান রচনা করেন তার ঘটনা, সংলাপ চরিত্রের বর্ণনা ও রচনাশৈলিতে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-দর্শন প্রয়োগ করে থাকেন। এক্ষেত্রে একজন উপন্যাসিকের জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হতে পারে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ জীবন সম্পর্কে একজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় একইরূপ থাকে না। তবে যে ঔপন্যাসিক সমাজ ও বাস্তবতার সঙ্গে জীবনচেতনাকে উপন্যাসের অন্যান্য

অনুষঙ্গের সঙ্গে সমন্বিত করে তাঁর আপন ভাষাশৈলির মাধ্যমে দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেন তাঁর উপন্যাস তত স্বার্থক।

সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা ছাড়াও উপন্যাসের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে রোমান্স। উপন্যাস জীবনের বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে অপর দিকে রোমান্স জীবনকে কল্পনার আধারে আনন্দময় করে তোলে। রোমান্সই পারে জীবনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত করতে এবং আমাদের রহস্যগুলোকে নিয়ে যেতে। রোমান্সে রহস্যের প্রাধান্য থাকায় এটি আমরা সাধারণত অতীত প্রেক্ষাপটে রচিত হতে দেখি কেননা দূরের সবকিছুই বিস্মিত ও অভিভূত করার ক্ষমতা রাখে। রোমান্স সম্পর্কে রিচার্ড চেজের অভিমত হচ্ছে, æThe Romance is of loftier origin than the novel. It approximates the poem. It may be described as a malgum of the two."[6]

ঊনিশ শতকে ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাঙালি পাঠক-সমাজ রোমান্সের নতুন সংস্করণ চেতনার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে তাদের অনুসন্ধিৎসু মন পাশ্চাত্যের এই নবধারণার সঙ্গে প্রাচ্যের সমন্বয় সাধন করে সৃষ্টি করল রোমান্স-সাহিত্যের। লেখক স্বাধীনভাবে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে পারেন যা রোমান্স-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য – এ সম্পর্কে Nathaniel Hawthorne তাঁর The House of the Seven Gables গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন − When a writer calls his work a romances, it need hardly by observed he wishes to claim a certain Latitude, both as its fashion and material, which he would not have felt himself entitled to assume had he professed to be writting a novel.[৭]

রোমান্স মূলত উপন্যাস বা কথাসাহিত্যের এমন একটি আঙ্গিক যেখানে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার পরস্পর মিলনে ঐশ্বর্য ও আদর্শানুযায়ী কাহিনীর রূপান্তর সম্ভব। রোমান্সের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দার যে মন্তব্য করেছেন, – "উপন্যাসের স্বাভাবিক প্রকৃতি এই যে,ইহাতে বাস্তব জীবন হইতে উপকরণ আহরণ করিয়া পরিবেশের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, ব্যক্তির সংগ্রামের কাহিনী প্রতিফলিত করিতে হয়। কিন্তু উপন্যাস যে অর্থে বাস্তব, রোমান্স সে অর্থে বাস্তব নয়; ইহাতে কাজের গুন সুরক্ষিত। জীবনের গদ্য এবং কাব্য উভয় সুরের অপরূপ সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে ইহার সৃষ্টি। ফলে রোমান্সে আমরা যেমন বাহিরের সাহিত্য পরিচিত হই, তেমনি আবার আমাদের মনের অন্দর মইলের

সংবাদও পাই; কাব্যের মত আংশিকভাবে ইহা বাহির বিশ্বকে আপনার মধ্যে আকর্ষণ করে এই গুনের ফলেই ইহা উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র। ... সুতরাং রোমান্স ঠিক বাস্তব বিরোধী বা অবাস্তব নয়। ইহা বাস্তবকে সেই রংএ ও সেন্দর্যে পরিমণ্ডিত করিতে চায় শুস্ক বাস্তবে যাহার স্বাক্ষর নাই।"[৮]

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই রোমান্সের আবির্ভাব ঘটেছে। যদিও রোমান্স এবং ইতিহাস সব সময় একই সম্পর্কে যুক্ত থাকতে বাধ্য নয়। এক্ষেত্রে উপন্যাসের আর একটি ধরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হলো ঐতিহাসিক উপন্যাস। খুব সাদামাঠাভাবে বলতে গেলে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে বুঝি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখিত উপন্যাসকে। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচকবৃন্দ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে – "ইহিাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটি বিশেষ রস সঞ্চার করে; ইতিহাসের রটুকুর প্রতি প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্তজিরে-ধান-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনের স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন। যিনি বাটিয়া ঘাটিয়া একাকার করিয়া থাকেন, তাঁহার সঙ্গেও আমাদের কোন বিবাদ নাই; কারণ স্বাদই এ স্থলে লক্ষ, মসলা উপলক্ষ মাত্র। অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক বসের অবতারনায় সফল হইলেই হইল"।[৯]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "ঐতিহাসিক প্রতিবেশ সৃষ্টি ও চরিত্র-চিত্রণ এবং গার্হস্থ্য জীবনের তথ্যবন্ধন-মুক্ত অথচ ভাবসত্য-নিয়মিত, রসসিক্ত ও মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংযোজক ঘটনাবলীর সুষ্ঠু বিন্যাস ও সমন্বয়েই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা"।[১০] পাশ্চাত্যের সমালোচক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস-বিশ্লেষক Jonathan Nield এর মতে, A novel is rendered historically by the introduction of dates, personages or events, to which identification can be readily given.[১১]

অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসে রোমান্সের অলৌকিক উত্তেজনায় ভরা থাকে বলে এর একটি আলাদা অধ্যায় সংযোজিত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে W. H. Hudso এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য–

'In whatever way the setting may be treated however, the interest of an historical novel will always inhered in part – for this is one sense is the very justification of its

existence – in its vivid reproduction of the lire of a bygone age. Here again tests to be applied are those of descriptive power and substantial accuracy. It is the business of the historical novelist to bring creative imagination to bear upon the dry facts of the annalist and the antiquarian and out of a mass of scattered material gleaned form a variety of sources, to evolve a picture having the fullness and unity of a work of art. It is this power of making real and picturesque some particular period of civilization and of doing this without any suggestion of the dry-as-dust and pedantic, that the ordinary reader values most in the writer of historical fiction.'[১২]

'সহজ ভাষায় বলতে গেলে ইতিহাস পুরাপুরি তথ্যসর্বস্ব এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস অংশত তথ্যনির্ভর এবং অংশত কল্পনানিষ্ঠ। ইতিহাসে কল্পনার স্থান নাই, তবে কাহিনীর প্রয়োজনে ঐতিহাসিক উপন্যাসে কল্পনার আশ্রয় নেবার অধিকার ঔপন্যাসিকের আছে। গল্পরসের স্বাদের উপরই উপন্যাসের ঐতিহাসিকত্ব অনৈতিহাসিকত্ব নির্ভর করে। গল্পরস সুনির্দিষ্ট দেশকালের আধারে পরিবেশিত হলেই উপন্যাসকে বলব ঐতিহাসিক, তা-না হলে নয়।'[১৩]

ইতিহাসের নিজস্ব একটি আকর্ষণীয় রূপ আছে তবে ইতিহাসের যে অংশে শুধুমাত্র রাজা-বাদশাহর উত্থান-পতন, জন্ম-মৃত্যু ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সেই অংশটির আকর্ষণ একজন ঔপন্যাসিকের কাছে নেই। কিন্তু ইতিহাসের যে রোমান্স সেটি লেখকদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে আর এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে ভারতের মুঘলদের ইতিহাস। যার একদিকে রয়েছে ঐশ্বর্য্য, বিলাস ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব অপরদিকে রয়েছে হিন্দু জাগরণের পুরোধা রাজপুত জাতি, প্রতাপসিংহ ও রাজসিংহের তেজ, মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজীর স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবোধ। ঔপন্যাসিকগণ মুঘল ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই হিন্দুদের বহুবল ও বীর্য গাথা রচনা করেছেন অবলীলাক্রমে। মুঘল ইতিহাস লেখকদের আকর্ষণ করার পিছনে আরও কিছু কারণ ছিল, যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা মুঘল শাসনামলের ইতিহাস রচনা করা শুরু করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, টড, স্টুয়ার্ট কন্টার ও মার্শম্যান প্রমুখ। টডের, 'রাজস্থান' গ্রন্থটি মূলত মুঘল-রাজপুত বিরোধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে যেখানে রাজপুতদের প্রতি টডের পক্ষপাতিত্ব ফুটে উঠেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই যা হিন্দু লেখকদের আকৃষ্ট করেছে। পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে অনেকেই মনে করতেন মুঘলরা যেহেতু বহিরাগত ও সাম্রাজ্যবাদী তাই এ দেশের প্রতি তাদের কোন ভালবাসা ছিল না এবং দেশের দুরাবস্থার জন্য মুঘলদের দায়ী করে উপন্যাসে তাদের অপশাসনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মুঘল ইতিহাসের রোমান্স মূলত ঔপন্যাসিকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছেন উপন্যাস

লেখার ক্ষেত্রে। 'সামাজিকতার ক্ষেত্রে পূর্বরাগ-অনুরাগ ঘটিত রোমান্স তখনও বাঙালি জীবনে প্রচলিত হয়নি। সুতরাং ঐতিহাসিক রোমান্স লেখকদের জন্য ইতিহাসের দূর পটভূমিকার শরনাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।[১৪] মুঘল সম্রাটদের ঘটনাবহুল রাজ্যশাসন, বৈচিত্র্যময় জীবন-যাপন বাদশাহদের বিলাসী হারেম-জীবন, আড়ম্বরপূর্ণ 'নওরোজ' ও খোসরোজ উৎসব, নাটকীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ তাছাড়াও চমকপ্রদও মুখরোচক ঘটনাবলীর মধ্যে মুঘলদের সঙ্গে রাজপুত কন্যাদের বিয়ে বহুল আলোচিত জাহাঙ্গীর-নুরজাহানের বিয়ে ইত্যাদি ঐতিহাসিক রোমান্স লেখকদের প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া কন্টার, টড ও স্টুয়ার্ট মুঘলদের নিয়ে যে ইতিহাস রচনা করেছেন তা বহুলাংশেই রোমান্স; ইতিহাস নয়। এক্ষেত্রে কন্টারের রোমান্স অব হিস্টিরি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা ছিল, রোমান্স ইতিহাস নয়। সুতরাং ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার জন্য ইতিহাসের এরূপ চমকপ্রদ উপাদান, না ভারতের ইতিহাসের নিকটবর্তী অতীতে না নাকায় মুঘল ইতিহাস লেখকদের আকৃষ্ট করেছিল। একটু পরিবর্তন করেই সহজেই যে কাহিনী নিয়ে রোমান্স রস পরিবেশন করা যায় মুঘলদের ইতিহাসে সেটি ছিল বলেই পাশ্চাত্যের আদর্শে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক রোমান্স লেখার যুগে ঔপন্যাসিকগণ ভারতের ইতিহাসের সুদীর্ঘকাল শাসন করা এই বিশেষ বংশের শাসনের ইতিহাসের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন।

'ঔপনিবেশিক শক্তি ইংরেজদের সঙ্গে মুঘলদের একটা পার্থক্য হল এই যে, উভয়েই বিদেশাগত হলেও মুঘলদের ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় দেশ ছিল না, ইংরেজদের ছিল ইংল্যান্ড। সুতরাং মুঘল সংস্কৃতির প্রভাব, মুঘল যুগ শেষ হয়ে গেলেও, এদেশের মাটিতে ও আলো-বাতাসে মিশে ছিল। বাংলা উপন্যাসে তার ব্যবহার লক্ষ করি।'[১৫] বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালী সমাজ-মানসে ইতিহাস চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্যও মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য।

ঊনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে স্বদেশ প্রেমের চেতনা সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে যা পূর্বে ছিল অনুপস্থিত। পরাধীন জাতির জীবনে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও তা ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর আত্মাপলব্ধিতে আসে। এর পূর্বে ইংরেজ শাসনের প্রতি আমাদের এক ধরনের আত্ম তৃপ্তি লক্ষণীয়। ইংরেজদের উচ্ছ্বশিত প্রশংসা করেছেন ঐতিহাসিক যুদানাথ সরকার, 'Education, literature, society, religion, man's handiwork and political life at felt the revivifying touch of the new impetus from the west. The dry bones of a stationary oriental society began to stir, at first faintly, under the wand of a heaven-sent magician.'[১৬] দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের অধীনে থাকায় একঘেয়েমি থেকে

মুক্তি লাভের আনন্দ হয়ত নব্য শাসক শ্রেণীর প্রতি ভাল লাগার কারণ হতে পারে, যদিও এক শতাব্দী (১৭৫৭-১৮৫৭) পর সেই মোহভঙ্গ ঘটে।

সিপাহী বিপ্লবোত্তর সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত উপন্যাসেও আমরা স্বদেশপ্রেমের বাণী স্বতোৎসারিত ও উচ্ছ্বসিত বক্তব্য প্রতিফলিত হতে দেখি স্বত:সিদ্ধভাবেই। স্বদেশপ্রেমকে অবলম্বন করে যে যুগজীবন উচ্চকিত হয়ে আমাদের সুপ্ত স্বদেশচেতনাকে জাগিয়েছিল। উপন্যাসে তার নিবিড় প্রভাব লক্ষ করা যায়। কাব্য নাটকে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল ভূমিকা, ভাব ও আদর্শ যেভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব উপন্যাসে তা অধিকলভাবে সম্ভব নয়। তবুও কালের মন্দিরায় দেশভাবনার যে সুর ক্ষনে ক্ষনে বেজে চলছে – উপন্যাসের নিবিড় ঘটনাজাল আর সুক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের মধ্যেও তার ছায়াপাত দৃশ্যমান হয়। দেশ ভাবনার মত একটি আত্মগত চিন্তা ও মননের স্থান অতি আবশ্যক না হলেও এর আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত নয়। এ সম্পর্কে John Oakesmith বলেছেন, æIt is because literature that clear record of national culture and tendency – best exhibits the operation of the process of general national development, that the writer has devoted a considerable space to the story of national literature in our own country."[১৭]

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' কে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সেই সাথে উপন্যাসে তাঁর আবির্ভাবকে রেনেসাঁসের যুগ বলা হয়ে থাকে। তিনিই প্রথম উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ চেতনার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন বললে অমুলক হবে না। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' এ তাঁর স্বদেশপ্রীতির বহি:প্রকাশ ঘটেছে। যদিও তাঁর রচিত প্রবন্ধে স্বাজাত্যাভিমানের নিরহঙ্কার দর্প ও স্বদেশ চিন্তার প্রখর অনুভূতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যা উপন্যাসে ছিল অনুপস্থিত। ভূদেব যে সময় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন সে যুগে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ ভারতের অতীত ইতিহাস চর্চার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেই এটি ঘটেছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যেই প্রথম ইতিহাসের প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ জাতীয়-জাগরনের মুহূর্তে ইতিহাসই পারে জনমানসে নবচেতনার বার্তা পৌঁছে দিতে। সমসাময়িককালে প্রকাশিত রাজস্থানের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস অবলম্বনে রচিত টড্রের 'রাজস্থান কাহিনী' ও তিনখণ্ডে লিখিত কন্টারের 'রোমান্স অফ হিস্টিরি' শিক্ষিত বাঙালির হাতে আসে যা তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছিল। বিদেশী লেখকের রচিত হলেও এ গ্রন্থ দু'টিকে চিন্তাশীল বাঙালি সমাজ বাঙালির আত্মজাগরনের পরোক্ষ উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, সহজাত দেশপ্রেমিক

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখায় অনুপ্রাণিত হবেন সেটিই স্বাভাবিক।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক তথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পার্থক্য হলো এই যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম নামক কোন বিশেষ চেতনা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়নি। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তথা বাংলা উপন্যাসে প্রথম থেকেই স্বদেশপ্রেমের স্পন্দন অনুভূত হয়েছে। যাকে আমরা উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি ও গভীরতম উপলব্ধি বলে মনে করে থাকি। গতানুগতিকতা, দৈব নির্ভরতা, নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের প্রতি অটল অনুগত্য থেকে বের হয়ে। যুক্তিবাদ, আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তি সচেতনতার মনোভাবকে নির্ভর করে সাহিত্য রচনা শুরু করায় বাংলা সাহিত্য 'আধুনিক' সংজ্ঞা লাভ করেছে।[১৮] এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বস্তুত, লেখকগণ যেদিন থেকে আত্মপ্রত্যয়শীল ও পরিবেশসচেতন মন ও গভীর সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সমাজ ও মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন সেদিন থেকেই বাংলা সাহিত্য তথা উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের সুত্রপাত হয়েছে। ইংরেজী শব্দ চধৎঃৎরঃরংস এর বাংলা অনুবাদ হিসেবে স্বদেশপ্রেম শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়েছে। 'যখন ইংরেজী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগাযোগ ঘটেনি ঠিক এই ভাবোদ্দীপক কোন বাংলা শব্দের বহুল প্রচলন ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে জন্মভূমিপ্রীতির অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ঠিক স্বদেশপ্রীতিমূলক কোন লক্ষণীয় অংশের বর্ণনা কিংবা স্বদেশাত্মক শব্দের জনপ্রিয়তা দেখা যায়নি। 'স্বদেশ' শব্দটির চেয়ে অনেক বেশী অর্থবহ শব্দই সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অত্যন্ত গভীর দেশাত্মবোধক পংক্তিটি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" ... কিন্তু বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে সম্ভবত: স্বদেশ প্রেমাত্মক কোন অংশ রচিত হয়নি বলেই কোন সঠিক শব্দও ব্যবহৃত হয়নি।[১৯] পরাধীন জাতির জীবনে স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি থাকাই স্বাভাবিক। যা বাঙালিদের মধ্যেও ছিল, কিন্তু সেটি সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত না হওয়ার কারণ হতে পারে, রাজনীতির সঙ্গে মানবজীবনের ঘনিষ্ট যোগাযোগের অভাব। সে যুগের লেখকরা রাজনীতির প্রতি ছিলেন চরম উদাসীন। সহজে রাজনীতির জটিলতার মধ্যে তাঁরা প্রবেশ করতে চাননি। যার ফলে বাংলা সাহিত্যে তৎকালে স্বদেশপ্রেমের সুস্পষ্টভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেনি। তবে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন সাধন করে। বাঙালি শিক্ষিত সমাজও লেখকদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটে যা পরবর্তীতে তাদের লেখনির মাধ্যমে বহি:প্রকাশ ঘটেছে।

তবে এই চেতনার ঘাটতি শুধু বাংলা সাহিত্যেই ছিল তা নয় পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল, যা আমরা একজন জার্মান লেখকের বক্তব্য থেকে জানতে পারি। æYet during the eighteenth century western enlightenment began to stream into Germany not in small rivulets, but in broad rivers and within a century the intellectual back wardness of the country had been overcome. ..... Under these conditions the expression of nationalism, remained confined to the literature, being party a reminiscence of the patriotic authers of antiquity read in school, partly the influence of English and French writers. The lack of political feelings made itself felt even the literature itself; with subjects for St Satire all around, German literature developed neither a political Satire nor a vigorous patriotic prose."[২০]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বাঙালির মনে দেশপ্রেমের যে সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি হয়েছিল কবি, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক তাকেই সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। বাঙালির সর্বাঙ্গীন জাগরণ ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের মূলে ঔপন্যাসিকদের লেখনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাজশক্তির রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রকাশ্যে ও পরোক্ষভাবে অব্যাহত গতিতে চলেছে স্বদেশপ্রেমিক লেখকদের অপ্রতিহত লেখনি। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার বেগ হয়েছে আরও দ্রুততর। এক্ষেত্রে হিন্দু লেখকদের প্রাধান্য ছিল লক্ষণীয়।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তৎকালীন মুসলিম সমাজে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। পরবর্তীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ১৮২০ সালে লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ, ১৮৩৫ সালের রাজ ভাষার পরিবর্তন এবং সর্বোপরি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব মুসলিম সমাজের অগ্রগতিকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ করে। অপরদিকে ইংরেজ শাসকদের সহায়তায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও সংস্কৃতিক চিন্তায় এগিয়ে যায় হিন্দুমধ্যবিত্ত শ্রেণী। "১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের উচ্চশিক্ষার পথও উন্মুক্ত হয়। নবলব্ধ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার ইতিবাচক আলোড়নের ফলে বাংলার সমাজজীবন থেকে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), রাধাকান্তদের (১৭৮৩-১৮৬৭), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ ব্যক্তিত্বের জন্ম সম্ভব হয়। এভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি-মনিষার যে বিচিত্রমুখী প্রকাশ

সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ও বিজ্ঞানচিন্তার মধ্য দিয়ে ক্রম পরিণতি লাভ করে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্বই চলে যায় বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রনে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্থব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুক্তিদূত হিসেবে গন্য হয়েছিল।[২১] যদিও পরবর্তীতে তাদের এই মোহভঙ্গ হয় এবং তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকবৃন্দ পারে পায়ের শিকল লম্বা করে দিতে মুক্তি দিতে পারে না।[২২]

অপরদিকে বাঙালি মুসলিম সমাজ মুসলিম শাসনের পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় বলে মনে করল। বস্তুত তাদের এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে সময় লেগেছিল পুরা ঊনিশ শতক। বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাঙালি মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি যে অনিহা দেখা দেয় তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি শিল্প-দর্শন ও বিজ্ঞানকে বাঙালি হিন্দু সমাজ জাগতিক ও মানসিক মুক্তির অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে। বাঙালি মুসলমানের পাশ্চাত্য বিমুখতার কারণে তাদের ভাবজগতের দীনতার সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক অগ্রগতি ও চরমভাবে ব্যাহত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ও তার চরম পরিণতি মুসলমানদের নতুন করে ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সিপাহী বিপ্লব এবং ফরাজি ও ওহাবি আন্দোলনের কারণে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বিরূপ মনোভাব দূর করা সেই সাথে ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজের অগ্রগতির পিছনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সৈয়দ আহমেদের আলীগড় আন্দোলন সৈয়দ আমীর আলীর সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা (১৮৭৭) ও নবাব আবদুল লতিফের মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির (১৮৬৬) কার্যক্রম। এর ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে মুসলমানদের সার্বিক অবস্থার অগ্রগতি ঘটে। সেই সাথে তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মসজাগতা, জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের সন্তানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সরকারী চাকুরীতে যোগদানে আগ্রহ প্রকাশ করে। এর ফলে পরবর্তীতে আমরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যুগপদভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করতে দেখি – যেমন ১৯১৬ সালে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রতীক লক্ষ্মৌ প্যাক্ট, যেখানে ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এক সাথে লক্ষ্মৌতে তাদের বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে। অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 'তিনি বলেন, বৃটিশরা তাদের পাশ্চাত্য চরিত্র ও মেজাজ এবং প্রশাসন পদ্ধতি নিয়ে ভারত শাসন করছে। এই প্রথমবারের মত ভারতে সকল শ্রেণীর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়ার শুরু হয়েছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। এই ঐক্য সাধন প্রক্রিয়া

বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতিতে বিভক্ত ভারতবর্ষকে এক নতুন জাতি সত্তায় বিকল্পিত করতে সচেষ্ট হয়েছে; জাগ্রত করেছে এক নতুন আবেদন – নিজেদের শাসন করার জন্মগত অধিকারের পুনরুদ্ধার।"[২৩] এভাবে জিন্নাহর বক্তব্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ সুগম করে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও উভয়ের ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এই ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তারা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন অধিকার মেনে নেন। এই চুক্তি সম্পর্কে স্যার রেজিনাল্ড কুপল্যান্ড বলেন, "দুটি প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনের এই চুক্তিকে বৃটিশ ভারতে এ পর্যন্ত বিকশিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ প্রকাশ বলা যেতে পারে।"[২৪] ১৯২০ সালে মুহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ছিল বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নবজাগরণের উত্থান।

মহাত্মা গান্ধীর দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাও বৃটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। এবং সমগ্র ভারতবর্ষে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান এক বৈপ্লবিক উন্মাদনা নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজনৈতিক জীবনের এই সংঘাতমত পরিস্থিতিতে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এর ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পূর্ববাংলার মুসলমানদের জীবনে সুদূর প্রসারী সুফল বয়ে এনেছিল। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগে এই শিক্ষিত মুসলিম সমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ঊনিশ শতকে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে বাংলার নবজাগরণ এসেছিল শিক্ষিত হিন্দু সমাজকে আশ্রয় করে। শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তা রূপ নেয় হিন্দু পুনর্জাগরণে। তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ চেতনার। শিক্ষিত হিন্দুদের মনের এই জাতীয়তাবাদ চেতনা ও স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। কারণ বৃটিশ সরকারের আনুকূল্যে তথা সক্রিয় সহযোগিতায় বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। সমাজের সকল রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী হিন্দু সমাজের সেই মুহূর্তে বৃটিশ শক্তির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বাভাবিক। তাছাড়া ইংরেজ শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, তাদের স্থায়িত্বের প্রতি আস্থা। সেই সঙ্গে বৃটিশ সরকারের শক্তির প্রতি ভয়ও শিক্ষিত হিন্দু সমাজের অন্তরে বাসা বেঁধেছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছ থেকে ইংরেজরা ক্ষমতা নিয়ে নেয়। সঙ্গত কারণেই ইংরেজ শাসকগণ মুসলমানদের প্রতিপক্ষ শত্রু এবং ইংরেজদের সহযোগী মিত্র ভাবতে শুরু করে। এর ফলে ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি চেতনায় সমৃদ্ধ এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনচেতনায় পুষ্ট এই শ্রেণীর সৃষ্টির পেছনে হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৮৫৮ খিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে এই শ্রেণীর জন্য উচ্চশিক্ষার পথও প্রশস্ত হয়। তাদের হাত ধরেই এসেছে হিন্দু পুণর্জাগরণ তথা স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ চেতনার। এর বহি:প্রকাশ ঘটানোর জন্য তারা জোর দেয় প্রাচীন ভারতের ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি। অতীত চর্চার ফলে তারা উপলব্ধি করে যে, তাদের অতীতের সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য এবং বর্তমানের সার্বিক উন্নতির তুলনায় মধ্যযুগের ইতিহাস ছিল লজ্জাজনক। আর স্বাভাবিকভাবেই তারা মুসলমানদের দায়ী করলেন। মুসলমানরা ভারত উপমহাদেশে বহি:শক্তি হিসেবে প্রবেশ করে এবং কয়েকশত বছর হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হয়। তাই হিন্দু ঔপন্যাসিকগণ মুসলমানদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশের জন্য বেছে নেন মুঘল-মারাঠা বা মুঘল-রাজপুতের সংঘাতের ইতিহাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার যে ধারা শুরু হয় তাতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ভারতের মুঘলদের ইতিহাস। ভূদেব, বঙ্কিম ও রমেশ এই উপমহাদেশ শাসন করা মুঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের তফাৎ ছিল এই যে, মুঘলরা বহিরাগত হলেও ভারতবর্ষই ছিল তাদের একমাত্র দেশ। কিন্তু ইংরেজদের ছিল ভারত ছাড়াও ইংল্যান্ড। সুতরাং মুঘলযুগ শেষ হয়ে গেলেও তাদের সংস্কৃতির প্রভাব এদেশের মাটিতে ও আলো-বাতাসে মিশে ছিল। কারণ মুঘলরা এদেশে পারস্য সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণকারী মুঘলগণ বর্তমান সময়ের ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। বাংলা উপন্যাসে তার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে ঐশ্বর্যশালী এই মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার নি:সন্দেহে বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধশালী। সবাইকেই আমরা মুঘল ইতিহাসের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখেছি।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে পানিপথের প্রথমযুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময় রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান করবাণীকে পরাজিত করে মুঘলরা বাংলা দখল করে। বাংলায় ১৫৭৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর নবাব মুর্শিদকুলী খান থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র পরাজয়, ১৭৬৫ খিস্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে নবাবী আমল বলে। এই সুদীর্ঘ সময় ভারতবর্ষ ও বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সমকালীন বাংলা সাহিত্যে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। এর কারণ হতে পারে মুঘল সম্রাটদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে মনোনিবেশ না করা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের আদর্শে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক

Dhaka University Institutional Repository

রোমান্স রচনার যুগে ঔপন্যাসিকগণ মুঘল ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণ যেমন ছিল রোমান্স তেমনি আবার সুদীর্ঘকাল।

Z_¨wb‡'k

১. মার্কস এঙ্গেলস, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রিঃ) প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১, পৃ. ৪১-৪৩

২. অসীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃ. ১২

৩. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, মাঘ ১৪০২, পৃ. ১৩

৪. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলিকাতা-৭০০০৭৩, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৯২

৬. Richard Chase, The American Novel and its Tradition, New Delhi, 1st Indian edition 1973, উদ্ধৃত, আব্দুর রহিম, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রোমান্স প্রসঙ্গ ঘুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০৮, পৃ. ১৪

৭. Nathanial Hawthorne, the house of the Seven Gables, Oxford University Press, 1998, Preface, P. 1

৮. অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম-মানস, পুস্তক বিপনী, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ. ৫০-৫১

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', সাহিত্য রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ, ১৩৬৮, পৃ. ৮২০

১০. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১১. Jonathan Nield, A Guide to the best Historical Novels and Tales, Pengunine Books, London, 1st Edition, 1904, P. 3

১২. W. H. Hudson, An Introduction to the Study of Literature, Imperial Books, New Delhi, 1st Edition, 1978, Pp. 160-161

১৩. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক উপন্যাস', ইতিহাস, বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ, ১ম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৫৮, পৃ. ১৫

১৪. দিলওয়ার হোসেন 'বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, পূর্বোক্ত, অবতারনিকা, পৃ. ১১

১৫. দিলওয়ার হোসেন, 'বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১৬. Jadunath Sarkar, History of Bengal, vol. 11, Dacca, 1948, P. 497

১৭. Jhon Oakesmith, Race and Nationality – An Enquiry into the Origin and Growth of Patriotism, London, 1919, Preface

১৮. অঞ্জলি কাঞ্জিলাল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. ১৭

১৯. অঞ্জলি কাঞ্জিলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮

২০. Hans Kohn, The Idea of Nationalism, New York, 1951, P. 345

২১. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪

২২. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২৩. ড. এম. এ ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, রয়েল লাইব্রেরী, ৩১/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৭৩

২৪. Report on the Constitutional Problem in India, London, Oxford University Press, 1943, Part-1, P. 47

wØZxq Aa¨vq

f‡‘e g‡Lvcva¨v‡qi BwZnvm‡PZbv

বাঙালির ইতিহাসচেতনার পটভূমিতে এক জটিল দ্বন্দ্বময় কালসীমা উনিশশতক । কারণ, এই শতকের শুরু থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে বাঙালী জীবনে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। কিন্ত এই নবচেতনার যাত্রাপথ সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো না। প্রচলিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে নবজাগরণের সংঘাত,সমাজজীবনের ভাঙা- গড়া, উপনিবেশ-উদ্ভূত বিচিত্র সংকট – প্রভৃতি এই চেতনার পথকে দ্বন্দ্বসংকুল করেছে। কালের এই অস্বাভাবিক গতির মধ্যে যাঁরা স্বাবলম্বী জীবনাদর্শে উন্নীত হতে সমর্থ হন, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী প্রতিভা ভুদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন উনিশ শতকের বাঙালি মনীষার এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠ তাঁর জীবনভাবনায় নতুন তাৎপর্য আরোপ করেছিল : "তাঁর বিশ্বাস ছিল, য়ুরোপের কর্ম এবং ভারতবর্ষে অধ্যাত্মচেতনাকে সমন্বিত করতে পারলে ভারতের যথার্থ মুক্তি হবে।"[১] হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র ভূদেব মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহপাঠী ছিলেন। হিন্দু কলেজে লেখাপড়া করলেও তিনি নিজেকে একজন স্বতন্ত্র মানসিকতার ব্যক্তি হিসবে গড়ে তুলেছিলেন। এ কলেজে অধ্যয়নকালে কিভাবে তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ-প্রেম জেগে ওঠে তার পটভূমির কথা তিনি তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' (২য় ভাগ) গ্রন্থের 'অধিকারীভাব ও স্বদেশানুরাগ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন: 'যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু জাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ, ঐ ভাবার্থ প্রকাশক কোন বাক্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস নিবন্ধন মনে মনে যৎপরনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ হতে দক্ষ কন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে, "আর্য্য বংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ 'ইশ্বরী-দেহ'।"[২] অধ্যয়নকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশানুরাগের এই অনুপ্রেরণা তাঁর পরবর্তী জীবনের সাহিত্যসাধনায় অত্যন্ত সাফল্য বয়ে এনেছিল। তবে এই শিক্ষা তাঁকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্প-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবিমুখ করে তোলেনি। বরং যেখানে "প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শের সঙ্গে নবীন য়ুরোপীয় জীবনবাদের প্রায় অহিনকুলসম্পর্ক। ভূদেব সমস্ত বিপরীত তরঙ্গবিক্ষোভ নিজে ধারণ করে উভয়ের সমন্বয়ের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মজীবন লোকশ্রেয় জ্ঞান, সমাজ ও পারিবারিক আদর্শের একনিষ্ঠ আনুগত্য এবং পাশ্চাত্যের

জ্ঞানবাদ, বিজ্ঞানানুশীলন, সংস্কারমুক্ত আচরণ ভূদেবের ব্যক্তিগত জীবনে দুই আদর্শ একসূত্রে মিলিত হয়েছিল। এদিক থেকে তাঁকে উনবিংশ শতাব্দীর যথার্থ যুগনায়ক বলা যায়। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যথার্থ সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও পরিবারের সম্বন্ধ কিভাবে সুফলপ্রদ হতে পারে, ভূদেব নানা প্রবন্ধ নিবন্ধে তার মীমাংসা করেছেন। শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, ব্যক্তিগত জীবনে তার অনুশীলনও করেছেন তিনি। তিনি জীবন-প্রত্যয়ের দিক থেকে বিচক্ষণ বাস্তববাদী ছিলেন। এ উক্তিতেও তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়– "বাঙালিকে আধুনিক জগতের সঙ্গে পরিচিত করে এবং মূল ভারতীয় বুনিয়াদে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে তিনি জীবন চর্চার যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন তা আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের এবং সমাজের কল্যাণবোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে।"[৩] এ কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সমাজে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি। মুকুন্দ দেব লিখেছেন, "খুব কম ইংরেজই বোধহয় তাঁহার ন্যায় এত অধিক ইংরেজি পুস্তক পড়িয়াছেন সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণবিত্তান্ত দর্শন (প্রাচীন এবং নব্য) ইংরেজিতে ইউরোপীয়দিগের সকল উৎকৃষ্ট পুস্তকের অনুবাদ পাঠে সকল বিষয়ের শুষ্ক রিপোর্টের তথ্য সংকলনেও তাঁহার আনন্দ হইত।"[৪]

ভূদেবের লেখায় প্রচণ্ডভাবে যুগের প্রভাব পড়েছিল এবং এই যুগ-চেতনা ছিল তাঁর মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই তিনি সব রকমের কুপমণ্ডুকতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন যে আগ্রহ ও একাগ্রতার সঙ্গে অনুশীলন করতেন তা তাঁর রোজনামচায় বহুবার উল্লেখ করেছেন:

æBhudeb the staunch supporter of Hinduism was a voracious reader of western philosophy, and studied with discrimination that was usual with him, the doctrine of Herbert Spencer, Schopenhaur, Darwin, even at a very advance age, Bhudeb was a deligent student of Locke, Hume, Mill, kant and Hegel, as we may find out from his biography, which has been based on his diary entries as well as other records. It is curious that even such a book as Hartman's philosophy of the unconscious is discussed in great detail in his journal."[5]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিজে একজন গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি ছিলেন উদার। তিনি মনে করতেন জন্মভূমির সেবার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলকে একজোট হতে হবে, তবেই জন্মভূমি নামক রথটি চলবে। মুসলমানদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর মতে, "হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। উভয়েই এখন একই দেশবাসী। সুতরাং একই মাতৃস্তন্যে উভয়ে পুষ্ট। ফলতঃ উহারা দুধ ভাই

এমন বলা যাইতে পারে। আবার মুসলমানদের ভারত শাসন সম্পর্ক বলেছেন, 'মুসলমানদিগের ভারত রাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্ব প্রদেশ সাধারণ প্রিয় হিন্দী ভাষাপ্রাপ্ত হইয়াছে– হর্ম্ম শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট প্রণালী সংযুক্ত হইয়াছে– সৌজন্য রীতির আদর্শপ্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহা ঋণগ্রস্ত।"[৬]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় আজীবন শিক্ষা বিভাগ এবং শিক্ষা প্রচারের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কিছু পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন যেমন: 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' (১ম ২য় ১৮৫৮-৫৯), 'পুরাবৃত্ত সার' (১৮৫৮), 'ইংল্যান্ডের ইতিহাস' (১৮৬২), 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২), 'রোমের ইতিহাস' (১৮৬৩) এবং 'বাঙালার ইতিহাস' (১৯০৪)। এসব পাঠ্যপুস্তক সে সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এছাড়াও তিনি 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) এবং 'আচার প্রবন্ধ' ১৮৯২ নামে তিনটি গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থ তিনটি সম্পর্কে অসিত কুমার লিখেছেন, 'উনিশ শতকের বন্যা প্রবাহে যখন নব্যশিক্ষিত বাঙালির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল, যখন তার জীবনে আঁকড়ে ধরার মতো কোন কিছু ছিল না, তখন ভূদেব উপযুক্ত সামাজিক প্রয়োজনে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের পারস্পারিক সম্বন্ধ এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য আচার-আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সংযত ভাষায় এই প্রবন্ধ গ্রন্থে বাঙালি সৎগৃহস্থের কর্তব্যপথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন।"[৭] ভূদেব একাধারে একজন মনীষী, প্রাবন্ধিক এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং লিখেছেন 'ক্লাসিক, সংযত ও স্থিতধী ধরনের রচনা।'[৮]

উনিশ শতকে মুঘল, রাজপুত, মারাঠা ও শিখ ইতিহাসকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার ধুম পড়ে যায়। কারণ ইতিহাসের অপূর্ব ধীরত্ব ও ত্যাগের ইতিকথার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির সদ্য পরিচয় ঘটেছে মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের এইসব মানব-মহিমায় পূর্ণ তথ্যাদি এবং রোমান্টিক ঐশ্বর্য তাঁদের উপন্যাস লেখায় উদ্বুদ্ধ করবে এটাই স্বাভাবিক। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখন বয়সে তরুণ এবং তিনিও ইতিহাসের একজন মুগ্ধ ও একনিষ্ঠ পাঠক হিসাবে ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক ট্রাজেডি রচনার সূত্রপাত ভূদেব মুখোপাধ্যয়ের হাতে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্ব প্রথম ইতিহাসের উপাদান অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেন। এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর ইতিহাসপ্রিয়তার কারণে। তিনি ইতিহাসের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। বিশেষ করে মুঘল ইতিহাসের প্রতি ছিল তার গভীর অনুরাগ।

সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয় মুঘলদের ইতিহাস। 'মুঘল ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর কি রকম অনুরাগ ছিল তার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত তাঁর মৌখিক পরীক্ষায়। হুগলীতে অবস্থিত গভর্মেন্ট নর্ম্যান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে চাকুরীর জন্য লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে মৌখিক পরীক্ষায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল কলকতা মির্জাপুরস্থ রেভ: লঙ্ সাহেবের স্কুলে ইতিহাস পড়ানো। সেখানে বিচারক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন পাদ্রি লঙ্ সাহেব, উড্রো সাহেব এবং কালীদাস মৈত্র। সেখানে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালের ইতিহাস বর্ণনা করতে বলা হয়। তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল তাঁর শাসননীতি চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর জ্ঞান গম্ভীর, পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রাঞ্জল বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন।[৯] ইতিহাস সম্পর্কে ভূদেবের কৌতূহল কি রকম ছিল সে সম্পর্কে ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, 'আজীবন তিনি ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন– তাঁর পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ইংল্যান্ডের ইতিহাস (১৮৬২), রোমের ইতিহাস (১৮৬৩), বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৯০৪ ও স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫) সেই ইতিহাস প্রিয়তার যথাযোগ্য বহিঃপ্রকাশ।'[১০]

ইতিহাসের প্রতি অনুরক্ত এই লেখক প্রথম যে উপন্যাসটি লিখেছেন তার নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ যে বছর ভারত উপমহাদেশের সিপাহীরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাস কাঁপানো সিপাহী-বিপ্লব সংঘঠিত করে। একই সময়ে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। এবং এইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের মধ্যে একদিকে যেমন আধুনিক মননশীলতার বিস্তার ঘটে অপরদিকে নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘঠিত সিপাহী বিপ্লবের পরিণামে লেখকমানসেও জাতীয়তাবাদী চেতনার অভ্যুদয় ঘটে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও স্বদেশী ও স্বজাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই "ঐতিহাসিক উপন্যাসটি রচনা করেছেন এবং তাঁর এই উপন্যাসটি রচনার পটভূমিকা হিসাবে যে মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তা হলো উনিশ শতকের নবজাগরণ ও রোমান্স রচনার যুগপ্রবণতা, সেই সংগে পাশ্চাত্য লেখকদের প্রভাব।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর "ঐতিহাসিক উপন্যাস" গ্রন্থে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুইটি ঐতিহাসিক আখ্যানের সংযোজন করেছেন। প্রথমটির নাম 'সফল স্বপ্ন' ও দ্বিতীয়টি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'।

mdj ¯c

'সফল স্বপ্ন' ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক সৃষ্টি নয়। ইংরেজ Hobert Caunter এর The Romance of History – India গ্রন্থের 'The Traveller's Dream অবলম্বনে রচনা করেছেন 'সফল স্বপ্ন। এটি মূলত সাধারণ একটি রচনা যেখানে একজন পথিকের রাতের স্বপ্ন সফল হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এর বিশেষ সাহিত্যমূল্য গৌণ এবং ঐতিহাসিক কাহিনী হিসেবে বৈচিত্র্য না থাকলেও একজন সাধারণ মানুষের মধ্যকার সহজাত জীবপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকভাবে কর্তব্যসাধনের পরিণাম হিসাবে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ যোগ্যতাবলে রাজমন্ত্রিত্ব লাভের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। শুধু তাই নয় ভগবৎ প্রেম, কর্তব্য নীতি-নিষ্ঠার মাধ্যমে একজন ক্রীতদাসের রাজাকে সন্তুষ্ট করে প্রথমে তাঁর কন্যাকে বিয়ে এবং পরবর্তীকালে রাজত্বলাভ করেছেন তার বিশদ বর্ণনা আছে গল্পাংশে। সেই সঙ্গে সামান্য অলৌকিকতার ছাপও আছে গল্পে যা পাঠসমাজকে আনন্দ দিতে সক্ষম। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ভূমিকায় লিখেছেন "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।"[১১]

গজনির শাসক সবুক্তগনের জীবন ও কর্মকে অবলম্বন করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচনা করেন তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সফল স্বপ্ন'। সবুক্তগীন সামান্য ক্রীতদাস থেকে নিজ কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা বলে গজনির শাসনকর্তার পদ দখল করেছিলেন। এই ব্যক্তির কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়েই হয়ত তিনি এ উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা পান। যদিও উপন্যাসে সবুক্তগীনের কার্যাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। ক্ষমতা লাভ করার মধ্য দিয়েই তাঁর উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন। সবুক্তগীনের দাসবৃত্তি থেকে রাজ্য প্রাপ্তির কাহিনীর মধ্যে যে অ্যাডভেন্সার ও রোমান্স বিদ্যমান, তা থেকেও তিনি আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারেন। নাহলে সবুক্তগীনের থেকেও অনেক ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেই সময় যাঁদের নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখেননি। যেমন সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মাহমুদ যিনি ১৭ বার ভারত বিজয় করেছিলেন। ক্রীতদাসরূপে বিক্রি হওয়ার পর কিভাবে রাজ্যের অধিকারী হলেন তা এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য ক্ষমতারোহণের পরের কোন ঘটনার উল্লেখ সেখানে নাই।

'সফল স্বপ্ন' উপন্যাসের কাহিনী নিম্নরূপ:

একদিন এক অশ্বারোহী গান্ধার দেশের নির্জন পথে গহীন বনে ভ্রমণ করছিলেন। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য দাঁড়ান এবং বনের সৌন্দর্য অবলোকন করতে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ একটি সিংহ তার ঘোড়াটিকে আক্রমণ করে। সিংহকে মেরে তিনি ঘোড়াকে মুক্ত করলেও আঘাত গুরুতর হওয়ার দরুন ঘোড়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এমতাবস্থায় তিনি বাহন শূন্য হয়ে ব্যথিত মনে পথ চলতে শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ কাননের কুটিল পথ চলার ফলে তিনি যখন ক্লান্ত

হয়ে পড়েন, তখন সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখতে পান। সেখানে এসে দেখেন এক হরিণী তার শাবকদের নিয়ে তৃণ ভক্ষণ করছে। তিনি তার আহারের জন্য একটি শাবক ধরেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, তিনি কাঠে আগুন জ্বালিয়ে হরিণ ছানাটিকে খাবারের উপযোগী করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় দেখতে পান অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে মা হরিণ। সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পশুর মধ্যেও মানুষের মত বাৎসল্যভাব অবলোকন করে তিনি অভিভূত হন এবং ছানাটি ছেড়ে দেন।

পথিক এইরূপ উদারতার পরিচয় দিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করলেন। রাত্রি উপস্থিত হলো। তিনি সামান্য কিছু আহার সেরে একটি বৃক্ষতলায় শয়ন করলেন। ক্লান্ত পথিক ঘুমন্ত অবস্থায় একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, "মৃগাঙ্কমণ্ডল হইতে জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্তি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হলেন। পরে ক্ষণকাল তাঁহার প্রতি সহাস্যাননে এবং সস্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন– "রে বৎস! তুমি অদ্য অতি সুকৃত করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে সমভাবে সুখদুঃখভাজন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মা তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁর অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গজনন্ নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জিত হইও না, অদ্য পশুজাতির প্রতি যাদৃশ সদয়তা প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নরলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও।"[১২]

এই বলে দেবমূর্তি উধাও হয়ে যায়। পথিকের ঘুম ভেঙে যায় তখনও রাত্রি, তিনি উত্তেজিত মনে ভোর হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন, ভোর হলে তিনি পুনরায় যাত্রা করলেন। অপরিচিত কানন পথে একাকী চলতে চলতে তার পূর্বের রাত্রির স্বপ্নের কথা বার বার স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে লাগল, তিনি ভাবলেন, সত্যিই কি এই স্বপ্ন সত্য হবে, আবার ভাবলেন আমি এদেশের নামধামবিহীন আগন্তক ব্যক্তি, আমি এদেশে একাধিপতি হবো এটি স্বপ্নের বিষয় হতে পারে কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ স্বপ্ন হচ্ছে জাগ্রতাবস্থায় যে সমস্ত ভাব বা কল্পনা মনের মধ্যে ভিড় করে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার আবির্ভাব। সুতরাং স্বপ্ন কখনো বাস্তবরূপ লাভ করে না। এই বলে শুদ্ধাত্মা পথিক সকল চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে পুনরায় পথ চলতে লাগলেন। পথিক এইরূপ চিন্তামগ্ন অবস্থায় বনের পথ অতিক্রম করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেলেন এবং সহযোগিতার আশায় তাদের সম্মুখে গিয়ে পথের সন্ধান জানতে চান। খুব শিঘ্রই তার ভুল ভাঙল কারণ তারা ছিল বনদস্যু। পথিককে পণ্যজীবী বণিক মনে করে তার পথরোধ করলো, পরে যখন জানতে পারলো যে তিনি বণিক নন বরং এক পথহারা পথিক, তখন তাকে তাদের দলে যোগদানের আহ্বান জানালে তিনি তা অস্বীকার করেন। এতে বনদস্যুরা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে

আক্রমণ করলে তিনি তাদের সাহস ও বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করেন। তার সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে বনদস্যুরা মুগ্ধ হয়ে তাকে ধরে নিয়ে যায়। অনেক বুঝিয়েও যখন পথিককে দস্যুবৃত্তিতে রাজি করাতে পারল না, তার নীতির কাছে বনদস্যুরা পরাস্ত হলো তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আহত পথিককে গ্রামে নিয়ে দাসক্রেতার নিকট বিক্রয় করে দেয়। চোরেরা মূল্য নিয়ে চলে যায়। পথিকের মনে আবার সেই স্বপ্নের স্মৃতি ভেসে উঠে এবং ভাবতে লাগলেন, "আমার স্বপ্ন বিলক্ষণই সফল হইল। আমি কি নির্বোধ যে, এমন দুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম! কোথায় রাজ্যেশ্বর হইব, না দাস হইলাম! বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন বলা যায় না; কিন্তু যাহা হউক এমন কোন কর্ম করা হইবে না, যাহাতে শেষে অনুতাপ বা অপযশের ভাজন হইতে হয়।'[১৩] দাসক্রেতা পথিককে নিজ গৃহে নিয়ে তাঁর শরীরের ক্ষত সারিয়ে তোলেন। সুঠাম দেহি এই দাসের অধিক ক্রয় মূল্য চাওয়ায় কেউ ক্রয় করতেও চাইল না। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান প্রদেশাধিপতি (পরে গজনির শাসক) অতি বদান্য এবং ক্ষমতাবান আলেপ্তগীন এই দাসকে ক্রয় করে আপন পরিচর্যায় নিযুক্ত করেন। দাস হিসেবে কিছুকাল অবস্থান করার পর তিনি তার নিজ কর্মদক্ষতা, ধর্মপরায়ণতা ও প্রভুবাৎসল্যের কারণে আলেপ্তগীনের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। একদিন ক্রিতদাসের নিকট তার পরিচয় জানতে চাইলে দাস বলে, "মহারাজ! আমার পূর্ব বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপ! আমি দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু কখন এমত কোন কর্ম্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। যখন মুসলমানেরা কলিফ্ ওথমানের (খলিফা ওসমান) আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করে, তখন পারস্য ভূপাল 'ইসুদগর্দ' তাহাদিগকের পরাক্রম-অসহিষ্ণু হইয়া তুর্কস্থানে পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশজাত।"[১৪] দাস আরও বললেন, তার বাবা ধনী ছিলেন না কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সংসারের ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে তিনি কর্মের সন্ধানে বের হন। তার ইচ্ছা ছিল কোন রাজপরিবারে যোদ্ধা হিসাবে যোগ দিবেন, কিন্তু পথিমধ্যে তিনি বনদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং ক্রীতদাস রূপে বিক্রি হন। এতে তারা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে তিনি এখন আবার সেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে করেন।

আলপ্তগীন তার জীবন বৃত্তান্ত শুনার পর তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন এবং তাকে রাজকার্যে নিয়োগ দেন। তার কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে প্রধানমন্ত্রী এবং সর্ব্বসৈনাদক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করেন। এতবড় উচ্চপদ লাভ করার পর তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার। রাজা আলপ্তগীনের একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল যার নাম জেহীরা। রাজা বহু চেষ্টা করেও তাঁর কন্যাকে বিয়ে দিতে পারেন নাই। অবশেষে কন্যা প্রধানমন্ত্রীর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। আলপ্তগীন কন্যার এই প্রস্তাবে রাজি হন। প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজ কন্যার সাথে তাকে বিয়ে দেন। এতে করে তাঁর দরবারের অমাত্যবর্গ ও প্রজারা অত্যন্ত খুশি হয়।

কিছুকাল পর আলপ্তগীন গজনিতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং এরপরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় জামাতা রাজ্যের অধিপতি হন। এবং তার স্বপ্ন সফল হয়েছে ভেবে পুলকিতবোধ করেন। এতক্ষণ যার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো তিনি আর কেউ নন ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিত্ব সুলতান মাহমুদের পিতা সবুক্তগীন। এইভাবেই সবুক্তগীনের ক্ষমতারোহনের মধ্য দিয়ে ভুদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর "সফল স্বপ্ন" উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন।

ইতিহাসের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সবুক্তগীন শৈশবে ক্রীতদাসরূপে আলপ্তগীনের নিকট বিক্রিত হন। কর্মদক্ষতা ও প্রভুভক্তির কারণে প্রভুর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। এবং ক্রমেই তিনি পদোন্নতি লাভ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে আলপ্তগীন তাঁকে "আমীর উল ওমরাহ" উপাধি দেন এবং তার নিজ কন্যার সাথে বিয়ে দেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি গজনির শাসকরূপে ৯৭৭-৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও উচ্চভিলাষী। সিংহাসন আরোহণ করার অল্পকাল পরেই তিনি আফগানদের নিয়ে একটি দুধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন করেন। এরপর খোরাসান ও সিস্তান অধিকার করে ভারত উপমহাদেশের প্রতি দৃষ্টি দেন। দীর্ঘ ২০ বৎসর তিনি কৃতিত্বের সাথে গজনি শাসন করেন। সবুক্তগীন অত্যন্ত দয়ালু এবং উদার স্বভাবের সুলতান ছিলেন। সেই সাথে ছিলেন দৃঢ়মনা ও সহিষ্ণু। তিনি ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর গজনির সিংহাসনের বসেন তাঁর যোগ্য পুত্র জগৎ বিখ্যাত বীর যোদ্ধা সুলতান মাহমুদ যিনি ১৭ বার ভারত বিজয় করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে তার পুত্রের জন্য রেখে যান একটি সুবিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য। নিঃসন্দেহে তিনি একজন সাহসী ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। ২০ বছর তিনি তাঁর রাজ্য শাসন করেছেন ন্যায় পরায়ণতা, উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে।

এ উপন্যাসে একজন সাধারণ ক্রীতদাসের নিষ্ঠা সততা ও যোগ্যতার বলে অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে লেখক ভগবৎ প্রেম ও জীবপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছেন হিতোপদেশের মাধ্যমে। তবে উপন্যাসে আলোচিত স্থান গজনী ও সেখানে প্রতিষ্ঠিত গজনী বংশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ৯৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য তিনজন ব্যক্তি এই বংশের শাসক ছিলেন:

১) আলপ্তগীন (৯৬২-৯৭৬ খ্রি:)

২) নায়ক – সবুক্তগীন (৯৭৭-৯৯৭ খ্রি:)

৩) সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মাহমুদ (৯৯৭-১০৩০ খ্রি:)

৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের প্রায় আড়াইশত বৎসর পর ভারতবর্ষে মুসলমানদের দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান পরিচালনা করে আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনীর দুর্দমনীয় ও দুর্ধর্ষ তুর্কিগণ। আরবদের দ্বারা সূচিত কাজ তুর্কিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। গজনীর তুর্কিদের দ্বারা বারবার ভারতবর্ষ অভিযানের কাহিনী উপমহাদেশে একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা। গজনীর এই রাজবংশই সর্বপ্রথম নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই উপমহাদেশে সফল সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। বিশেষ করে সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সুলতান মাহমুদ তাঁর ৩২ বৎসরের শাসনামলে ১৭ বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করে প্রত্যেকবার জয়লাভ করে সামরিক প্রতিভার ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। বাঙালির ইতিহাসবোধের উন্মেষলগ্নে বিষয় নির্বাচনকেই সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের তথ্যও ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেছেন উনিশ শতকী নবচেতনাসন্ধানী গ্রন্থ।

A½ixq we‡bgq

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' এর দ্বিতীয় আখ্যান হচ্ছে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। এ উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে মুঘল ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। এটি তিনি James Hobert Caunter-এর The Romance of History – India গ্রন্থের The Mahratta Chief অবলম্বনে রচনা করেছেন। এ সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন "ইংরেজিতে রোমান্স অব্ হিস্টরী নামক একখানী গ্রন্থ আছে। তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'স্বফল স্বপ্ন' উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসের কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।"[১৬]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসই কন্টারের উপন্যাস অবলম্বনে লেখা। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কন্টারের লেখার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর অন্যতম কারণ হতে পারে স্বদেশপ্রেমু যার সন্ধান তিনি 'দি মাহ্রাট্টা চীফ্' এ পরিপূর্ণরূপে পেয়েছিলেন। 'ভূদেব চরিত' গ্রন্থে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে: "ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং পুষ্পাঞ্জলি ভূদেব বাবুর প্রগাঢ় স্বধর্ম-ভক্তি, স্বদেশভক্তি এবং সাধকসুলভ ভবিষ্য-দর্শনপ্রসূত। যখন অঙ্গুরীয় বিনিময় প্রকাশিত হইয়াছিল তখন দেশের কথা অপর কেহই ভাবিতে আরম্ভ করেন নাই।"[১৭] উল্লেখ্য, এদেশে স্বদেশ প্রেমের ক্ষেত্রে যেমন সিপাহী বিপ্লব রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম দিয়েছে, 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'কে সেইরূপ সর্বপ্রথম সাহিত্য প্রয়াস বলে সম্মান দেওয়া যেতে পারে। কেননা, স্বদেশ প্রেমের এরূপ নিদর্শন সমসাময়িক অন্য কোন রচনায় পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেনি।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এর নায়ক মহারাষ্ট্র বীর শিবাজী। মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অগাধ ভালবাসা ছিল। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি তার লিখিত 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে'। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্র শক্তি বিজয়ী হলে ভারতবর্ষের ইতিহাস কি রকম হতো তারই কাল্পনিক একটি বর্ণনা দিয়েছেন এই উপন্যাসে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের দিকে ভারত উপমহাদেশের বিস্তারিত ও সঠিক ইতিহাস জানা সহজসাধ্য ছিল না। ভূদেব যে কন্টারকে অনুসরণ করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন, সেই কন্টারও বিনয়ের সাথে স্বীকার করেছেন ঐতিহাসিক তথ্যাদির অপ্রতুলতার কথা। নিচের উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য:

æIf therefore, in the following tales, the variety should appear less than in those found in the volumes of the same work which have proceded those, the cause and consequently the excuse, must lie in the materials. ... I have, however, endeavoured to vary the materials as much as was consistant with the regime of the history. Though I sometimes found them very intractable."[১৮]

হোবার্ট কন্টারের গ্রন্থের নামকরণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ইতিহাস রচনা করেননি। ইতিহাসের রোমান্স নিয়ে আখ্যান রচনা করেছেন। ভারতের ইতিহাসে যেখানে যতটুকু রোমান্স পেয়েছেন তাতেই আকৃষ্ট হয়ে তিনি তাঁর The Romance of History – India রচনা করেছেন। তবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এ রোমান্সের পাশাপাশি কতটুকু ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন, মুঘল এবং শিবাজী সম্পর্কে তাঁর ধারণাই বা কী? সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি থেকেই উপলব্ধি করা যায় তাঁর ইতিহাসচেতনার প্রকৃতি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় স্বদেশ প্রেম এবং মানবপ্রেম। লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে এটিকে আখ্যায়িত করলেও কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম এবং দুই একটি ঘটনা ছাড়া বাকি সব কাল্পনিক - শিল্পের জন্য যা অস্বাভাবিক নয়। বাদশাহজাদী রওশন আরাকে আওরঙ্গজেবের কন্যা হিসাবে চিহ্নিত করা এবং মারাঠা নেতা শিবাজীর সাথে বিয়ে দেওয়া ছিল আরও চমকপ্রদ। শিবাজী চরিত্রকে তিনি উপন্যাসে যেভাবে রূপদান করেছেন, ঐতিহাসিক পরিচয়ের সাথে তার মিল সামান্যই।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময়ের এর ঘটনাংশ নিম্নরূপ:

দুর্গম পর্বত শ্রেণী অতিক্রম করার সময় দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গজেবের সপ্তদর্শী ও লাবণ্যময়ী কন্যা রোসিনারার বাহন দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তিনি মুঘল সেনা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে মাদুরা নগরীতে পিতার নিকট যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় মারাঠা বীর শিবাজী কর্তৃক তিনি অপহৃত হন। সম্রাটের সাথে ছিল এই মারাঠা বীরের বৈরি সম্পর্ক। তিনি বাদশাহজাদীকে সম্মানে নিজ গুহায় বন্দী করেন।

মুঘলদের ভারত জয়ের অব্যবহিত পরে বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হিন্দু রাজপুত এবং মারাঠাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে এবং তাদের মধ্যে মুঘল বিরোধী মনোভাবে জন্ম নেয়। এমন সময়ে শিবাজীর জন্ম। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। সেই সাথে তাঁর গুপ্তচর বাহিনীও সক্রিয় ছিল। এই গুপ্তচররা তাঁকে রোসিনারার আগমনের সংবাদ দেয় এবং তিনি তাকে বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় শিবাজীর আতিথেয়তা মাধুর্যভাব ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধে রোসিনারা মুগ্ধ হন এবং শিবাজীর প্রতি বশীভূত হয়ে পড়েন। একদিন রোসিনারার রূপে আকৃষ্ট হয়ে মারাঠা সেন্যাধ্যক্ষ তার প্রতি অসদাচারণ করলে শিবাজী সেন্যাধ্যক্ষকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। এ সময় তিনি নিজেও আহত হন। এই ঘটনার পর শিবাজীর প্রতি রোসিনারার প্রণয়াসক্তি আরও বৃদ্ধি পায় এবং শয্যাশায়ী শিবাজীর শয্যাপাশে থেকে তিনি দিনরাত তাঁর সেবা করে সুস্থ করে তোলেন। ফলে দুজনেই দুজনার প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়েন।

রোসিনারার সাথে অসদাচারণের জন্য শিবাজী যে সৈন্যাধ্যক্ষকে শায়েস্তা করেছিলেন তার বিশ্বাসঘাতকতার দরুন মুঘল সৈন্যরা অতর্কিতে শিবাজীর দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ দখল ও রোসিনারাকে উদ্ধার করে, তবে শিবাজী পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। মুঘল সৈন্যরা রোসিনারাকে অতঃপর রাজ মহলে প্রেরণ করেন। আওরঙ্গজেব কন্যা উদ্ধারের সংবাদে আনন্দিত হন এবং কালবিলম্ব না করে কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করেন। কথা প্রসঙ্গে রোসিনারা পিতার নিকট শিবাজীর প্রশংসা করলে তিনি ক্ষুদ্ধ হন। দস্যু হিসাবে যাকে জানেন নিজ কন্যার মুখে তার প্রশংসা শুনে তিনি এতটাই রেগে যান যে কন্যার মুখ দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। এমনকি তাকে বন্দী পিতা শাহাজাহানের সাথে রাখেন।

এদিকে আহত শিবাজী ভগবান রামদাস স্বামীর দুর্গে আশ্রয় নেন এবং একটু সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় নিজ দুর্গ অধিকার করার পর মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নেন। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে তিনি মুঘল সৈন্যদের পরাস্ত করেন। তবে এর দীর্ঘ মেয়াদী কোন সুফল না দেখে জয়পুরের রাজা জয়সিংহকে পক্ষে আনার জন্য শিবাজী

তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং জয়সিংহকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তিনি যে মুঘলদের সহযোগিতা করেছেন তার ফলাফল ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। তিনি আরও বলেন যে, অতএব জয়সিংহয়ের উচিত শিবাজীর সাথে যোগ দেওয়া। জয়সিংহ তাতে সম্মতি দেননি। জয়সিংহের পরামর্শে অবশেষে তিনি আওরঙ্গজেবের সাথে সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আওরঙ্গজেব তাকে অপমান করবে না বলে জয়সিংহ শিবাজীকে আশ্বস্ত করেন। আওরঙ্গজেবের সাথে সম্ভাব বজায় রেখে মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং রোসিনারাকে পাওয়া সহজ হবে মনে করে শিবাজী বিজয়পুর রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে সম্রাটকে সহযোগিতা করতে সম্মত হন। এই শর্তে যে, বিভিন্ন রাজ্যের ভূমিকরের চৌথ (চতুর্থাংশ) তাঁকে প্রদান করতে হবে শিবাজীর সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে। অবশেষে জয়পুরপতি শর্ত স্বীকার করে তার সাথে সন্ধি করেন।

সপ্তম অধ্যায়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্রাট শাহজাহানের প্রশংসা করেছেন এবং দিল্লি ও আগ্রায় তাঁর স্থাপত্য কীর্তির কথাও উল্লেখ করেছেন। বন্দি পিতামহের সাথে রোসিনারার নানা কথোপকথনের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে শিবাজীর সাথে রোসিনারার সম্পর্কের কথা জানতে পেরে শাহজাহান তাতে সম্মতি জানান।

অন্যদিকে জয়সিংহের কথামত শিবাজী রাজদরবারে আওরঙ্গজেবের সাথে দেখা করতে এলে কৌশলে আওরঙ্গজেব তাঁকে বন্দি করেন। শিবাজীও কৌশলে কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। পালাবার পূর্বে রোসিনারার সাথে দেখা করে তিনি তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার আশায় এক দাসী কর্তৃক তাঁর অঙ্গুরীয় রোসিনারার নিকট পাঠিয়ে দেন। এদিকে সম্রাট রোসিনারার নিকট পারস্য রাজপুত্রের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি তা অস্বীকার করেন। ফলে সম্রাটও শিবাজীকে হত্যার হুমকি দেন। তবে তিনি তখনও জানতে পারেননি যে, শিবাজী পালিয়ে গেছেন। রোসিনারা শিবাজীকে ভালবেসেছিলেন এবং পালাবার সবরকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র স্বজাতীর নিকট শিবাজীর বদনাম ও অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনায় এবং ক্রুদ্ধ পিতার রোষানলে পতিত হওয়ার আশংকায় শিবাজীর অঙ্গুরীর সঙ্গে নিজ অঙ্গুরী বিনিময় করে ঐ অঙ্গুরী এবং একটি অশ্রুসিক্ত প্রণয়লিপি শিবাজীর নিকট পাঠিয়ে দেন। রামদাস স্বামী সেই পত্র পাঠ করে শোনান। রামদাস স্বামী পত্র পাঠ করে চমৎকৃত হন।এবং উচ্চস্বরে বললেন– "মহারাজ! ভূমণ্ডলে যে এতোদৃশ উদারচিত্ত কামিনী আছে তাহা আমি জানিতাম না। মহারাজ, যাহারা প্রাণ বিসর্জন দ্বারা পতিব্রত রক্ষা করে তাহারাও ইহার ন্যায় পতিপরায়ণা নন। মহারাজ! আমি অনুমতি করিতেছি আপনি ঐ অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন এবং যদি শাস্ত্র সত্য হয় তবে পরজন্মে এই বাদশা কন্যাই আপনার সহধর্মিনী হইবেন ইহার সন্দেহ নাই।"[১৯] এভাবে অঙ্গুরীয় বিনিময়ের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের কাহিনী।

অঙ্গুরীয় বিনিময়ে ভূদেব যেসব ঐতিহাসিক চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁরা হলেন আওরঙ্গজেব, শাহজাহান, শিবাজী, রোসিনারা, জয়সিংহ ও স্বামী রামদাস। তিনি চরিত্রসমূহকে কিছুটা কাল্পনিক ও কিছুটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনে বিন্যস্ত করে ইতিহাসের অজানা মানসক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও চমকপ্রদ ঘটনার পরিণতি দেখিয়েছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেছিলেন এবং শিবাজীর সাথে মুঘলদের সংঘর্ষ বেঁধেছিল এটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। শিবাজীর যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি, জয়সিংহের সাথে তাঁর যোগাযোগ, সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার এবং রাজদরবার হতে পলায়ন সবকিছু ইতিহাসসমর্থিত। অপরদিকে রোসিনারার গিরিসংকটে অপহরণ, শিবাজী রোসিনারার প্রণয়, দিল্লীতে অবস্থানকালে শিবাজীর রোসিনারাকে বিয়ের প্রস্তাব এবং মহৎ আত্মবিসর্জনের প্রেরণায় তা প্রত্যাখান এই সমস্ত আবেগপ্রবণতা ও গৌরবময় দৃশ্য রচনা লেখকের কল্পনাপ্রসূত। তৎকালীন সময়ে নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস গ্রন্থ না-থাকায় গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক তথ্যের স্বল্পতা আছে বটে তবুও ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে এটি সার্থক। এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

"ভূদেব ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই প্রাণ রহস্যটি নিজ সহজ ঔচিত্যবোধ ও ইতিহাস জ্ঞানের সাহায্যেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-বিন্যাস-পদ্ধতি পার্বত্য যুদ্ধ-পরিচালনা, শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা, আওরঙ্গজেবের কূটনীতি, জয়সিংহের প্রতি তাঁহার বিষপ্রয়োগের নির্দেশ ও তাহার পুত্রের নিকট কপোট পত্র প্রেরণ প্রভৃতির ইতিহাস তথ্য তিনি যথার্থভাবেই অনুধাবন করিয়াছেন। কিন্তু এই ইতিহাস তথ্য পরিবেশনের শিথিল গ্রন্থনের মধ্যে তিনি যে মানব চরিত্র জ্ঞান ও জীবনসত্যের দৃঢ়তর গ্রন্থি সংযোজনা করিয়া আকস্মিক ঘটনাকে মনস্তত্ত্বের নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন করিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব ও মৌলিকতা। শিবাজীর চরিত্র সৈনিকদের মধ্যে তাঁহার পুরস্কার বিতরণের নীতি, জাতির অভ্যুদয়কালে দেশদ্রোহীর মধ্যেও দেশাত্মবোধ ও চরিত্র-মহিমার লুপ্তাবশেষের অস্তিত্ব, স্ত্রীজাতির নৈসর্গিক সেবাপরায়ণতা ও আর্তের প্রতি মমতাবোধ অপরাধী সেনাটিকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তাহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে রত হওয়ার মধ্যে শিবাজীর নিগুঢ় অভিপ্রায় জয়সিংহের প্রতি শিবাজীর উদারনৈতিক আবেদন, শাহজাহানের খেদপূর্ণ আত্মচিন্তন, আরংজেবের অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটক স্বগতোক্তি– এই সবই তাঁহার মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয়।"[২০]

গল্পের নায়ক মারাঠা বীর শিবাজী হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে যে, সে সময় রাজপুত জাতির বল শৌষ বীর্য মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের উন্নত মস্তক মুঘলদের প্রতি নোয়ানো এমনি অবস্থায় নব্যোত্থিত মারাঠারাই মুঘলদের সম্মুখে রুখে দাঁড়াতে এবং তাদের গর্বকে খর্ব করতে সক্ষম বলে মনে করেছেন স্বদেশ প্রেমিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

তাঁর মতে, মারাঠা জাতিই নব্য ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে। হয়তো তাই তিনি মহারাষ্ট্রীয় বীর ছত্রপতি শিবাজীর জীবনেতিহাসকে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক যে চরিত্রগুলো প্রাধান্য পেয়েছে তাঁরা হলেন মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব মারাঠা নেতা শিবাজী রোসনারা এবং জয়পুর রাজা জয়সিংহ। এর মধ্যে তিনি আওরঙ্গজেবের চরিত্রের প্রতি খুব একটা সুবিচার করেননি। ঔপন্যাসিক সম্রাটের সাহস, ক্ষমতা, প্রতাপ কূটনৈতিক কৌশল ইত্যাদি ভাল গুণের কথা যতটুকু বলেছেন, তার থেকে অধিক বলেছেন ধূর্ত কপট ক্রুর গোড়া নীতিবাদী বিদ্বেষী ইত্যাদি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কথা। কোন কোন জায়গায় কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই যেন তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করে সম্রাটের মর্যাদাকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ন করেছেন প্রথম অধ্যায়ে রোসনারা অপহৃত হওয়ার পর সৈন্যরা কিভাবে সম্রাটকে জানাবে সে বিষয়ে কথোপকথোনের এক পর্যায়ে বলা হয়:

"তাহারা বাদশাহের স্বভাব বিলক্ষণ জানিত। তিনি ক্রুর প্রকৃতি ছিলেন। কোন অনুভূত পূর্ব দৈবনিবন্ধন বা দুর্ঘটনা কর্তৃক যদি কোন প্রযুক্তকর্ম্মের ত্রুটি হইতে তথাপি ক্ষমা করিতেন না তাঁহার স্বেচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটিয়া উঠিলেই ভৃত্যবর্গের প্রতি পরুষদণ্ড প্রয়োগ করিতেন। বস্তুত, আওরঙ্গজেব ও অন্যান্য নৃশংস স্বভাব একাধিপতি রাজাদিগের ন্যায় একান্ত স্বার্থ পরায়ণ ছিলেন- ক্ষান্তি, দয়া ও সমবেদনা কাহাকে বলে তাহা কিঞ্চিৎ মাত্রও জানিতেন না।"[২১] এই উক্তির মাধ্যমে আওরঙ্গজেবের চরিত্রে রূঢ়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আসলে কি তিনি এতটাই রূঢ় ও বদরাগী ছিলেন? ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এটা সত্য যে, মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব সম্রাট আওরঙ্গজেব। উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ভাইদের রক্তপাত এবং পিতা সম্রাট শাহজাহানকে কারাগারে বন্দী রাখার জন্য বহু লেখক তার নিষ্ঠুরতা উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনাকে লেখার উপাদান হিসেবে নিয়ে অনেক নাট্যকার আবেগময় নাটক রচনা করে জনমানসে আওরঙ্গজেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, চাতুর্য ও নিষ্ঠুরতার কথা প্রচার করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবের চরিত্রের ত্রুটিগুলোকেই বেশি করে উল্লেখ করে তাঁর অন্যান্য গুণাবলিকে ম্লান করেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, আওরঙ্গজেবের চরিত্রে দোষ গুণের সমাবেশ ছিল। শাসক হিসেবে তাঁর যোগ্যতাও ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি যে একজন নিবেদিত প্রাণ নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ও আদর্শ মুসলিম ছিলেন তা যদুনাথ সরকারের কথায়ও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–

Auranzib had from his boyhood cultivated control of speech and action, and tact in dealing with other's. As a prince, his tact sagacity and humility made the highest

nobles of his father's court his friends; and as Emperor he displayed the same qualities in a degree which would have been remarkable even in a subject. No wonder that his contemporaries called him a darvish clad in the imperial purple.[২২]

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে লেখক বিভিন্ন স্থানে আওরঙ্গজেবকে বহুবার হিন্দু বিদ্বেষী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন: ১ম অধ্যায়ে "বাদসাহ স্বীয় দুহিতা সম্বন্ধীয় দুর্ঘটনা শ্রবণমাত্র যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, সৈন্যগণের অনেক নিগ্রহ করিলেন এবং দূরদৃষ্ট বাহকেরা হিন্দুধর্মাবলম্বী বলিয়াই যে শীঘ্র দণ্ডাপ্রাপ্ত হইল, তাহা বলা বাহুল্য।"[২৩] বাদশা তাঁর কন্যার অপহরণের কথা শুনে রাগান্বিত হতেই পারেন। কিন্তু বাহকেরা হিন্দু বলেই যে দণ্ডপ্রাপ্ত হল এ কথার মাধ্যমে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই যেন তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আওরঙ্গজেব অপরাধী হিন্দু সৈনিককেই শুধু শাস্তি দিয়েছেন মুসলমান সৈনিককে দেননি এমন ঘটনার উল্লেখ তাঁর শাসনামলের কোথাও পাওয়া যায় না। অন্যজায়গায় বলেছেন, "মহারাজ"! পূর্ব্বে মুসলমান বাদশাহেরা হিন্দু রাজাদিগের স্থানে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে করপ্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। ইনি ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজা মাত্রের তেজোহ্রাস করিতেছেন। ইহার মানস সম্পূর্ণ সফল হইলে একটি ও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী রাজা থাকিবে না।"[২৪]

এখানে সম্ভবত ঔপন্যাসিক জিজিয়া কর প্রদানের কথা বলতে চেয়েছেন। জিজিয়া কোন নতুন কর (Tax) ছিল না, পাঠান রাজত্বকালে এবং মোঘল রাজত্বে ও সম্রাট আকবরের পূর্ব সময় পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর কাল উহা এদেশে প্রচলিত ছিল। আকবর নিজেও তাঁর রাজত্বের প্রথম সাত বৎসর এ কর গ্রহণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পূর্বে রোমান সম্রাটগণও মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে বিধর্মীদের নিকট হতে Tributum Copitis বা Capitation Tax নামে গ্রহণ করা হতো কার্যত যা ছিল জিজিয়ার অনুরূপ।[২৫]

জিজিয়া কর হচ্ছে অসুমলমানদের উপর ধার্যকৃত একটি কর যা তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আদায় করা হতো। জিজিয়া প্রবর্তনের পর হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ড. সাদেক আলী বলেছেন, æWhen Auranzib abolished about eighty taxes no one thanked him for his generosity but when he imposed only one tax not heavy at all people began to show their displeasure."[২৬]
সম্রাট আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করার পর ৮০টি কর তুলে দিয়েছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকারের Mughal Administration গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ৬৫টির উল্লেখ করেছেন। শেষের দুটি কর ছিল এইরূপ– প্রায়াগে যে সমস্ত

হিন্দু তীর্থ যাত্রী গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন, তাহাদিগকে ছয় টাকা চারি আনা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইত। হিন্দুর চিতাভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপের জন্যও ট্যাক্স আদায় করা হইত। আওরঙ্গজেব উক্ত উভয় ট্যাক্সই রহিত করেন। ইহা তাঁহার সহৃদয়তা ও হিন্দুপ্রীতিরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই।"[২৭]

এছাড়াও নানাভাবে উপন্যাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই সময়ের হিন্দুদের নির্যাতনের নানা চিত্র তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, আওরঙ্গজেবের সময় হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা নিগৃহীত হতো। এটি কখনও বাদশাহের মুখে আবার কখনও সৈনিকদের মুখে আবার কখনও শিবাজীর মুখে বলেছেন, যেমন সৈনিকদের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে কিছু তথ্য এভাবে:

১) মোগল যোদ্বা প্রথমত ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিল "কেমন রে কাফের! তোদের রাজা এখন কোথায়? বেটা ডাকাইত ছিল, তেমনি একেবারে জাহান্নমে গিয়াছে।"[২৮]

২) ..... "তোরা কাফের, ভূতের পূজা করিস।"[২৯]

৩) মুসলমান সৈন্য দ্বারা আহত মারাঠা সৈনিকের কাছে শিবাজী উপস্থিত হওয়ার পর– "আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না! "আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না! সকলে চমৎকৃত হইয়া শিবাজীর প্রতি দৃষ্টি করিলে তিনি কহিলেন, "অনুমান হয় দুরাত্মা মুসলমান কর্তৃক এই অন্ধকূপ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া জল প্রার্থনা করিলে উহাকে পানার্থ রক্ত প্রদান করিয়াছিল; এখনও প্রকৃত চৈতন্য হয় নাই, অতএব তাহাই পান করিবে না কহিতেছে।" পরে কহিলেন, বোধ হয় পাপিষ্ঠরা ইহাকে গোরক্ত এবং গোমাংস দিয়া থাকিবে বুঝি তাহাই ঐ গৃহ মধ্যে দর্শন করিলাম। হায়! ভারত ভূমি আর কতদিন এই পাপাত্মাদিগের ভারবহন করিবে?[৩০]

৪) অন্য একস্থানে আহত সৈনিক বলছে "এই ভাবিয়া দূরাত্মা মুসলমান সেনাপতির স্থানে বিদায় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি কি জন্য রুষ্ট হইয়াছিল, বলিতে পারি না বিদায় প্রদানে সম্মতি না হইয়া বিশ্বাস হন্তা বলিয়া আমার বিস্তর তিরস্কার করিল, পরে কহিল, তুই মুসলমান হইয়া বাদসাহের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত।"[৩১]

৫) "মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি বিশিষ্ট দ্বেষ ভাব সম্পন্ন ছিল।"[৩২]

সম্ভবত ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্যার যদুনাথ সরকার, ঈশ্বরীপ্রাসাদ, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যাঁরা আওরঙ্গজেব সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যা পুরোপুরি ইতিহাস সম্মত ছিলনা। তবে আধুনিক গবেষকগণ সেইসব অভিযোগকে খণ্ডন করেছেন অর্থাৎ তাঁরা দেখিয়েছেন যত খানি দোষী আওরঙ্গজেবকে

করা হয় তত দোষী তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন প্রজাবৎসল শাসক। শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অসাধারণ দক্ষ আওরঙ্গজেব "মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে রাজ্যের সর্বশ্রেণীর প্রজাগণের সমবায়ে তাহার রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। সৈন্য বিভাগে, রাজস্ব বিভাগে এবং অন্যান্য বিভাগে বহু বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে রাজ্যের সর্বত্রই হিন্দুদিগের আন্তরিক সমর্থন তাঁহার রাজ্যের প্রতি ছিল।..... প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই মুসলমান সেনাপতিগণের সহিত হিন্দু সেনাপতিগণ বিশ্বস্ততার সহিত আওরঙ্গজেবের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। সোমগড়ের ভীষণ সংগ্রামে দারাশিকোর বিরুদ্ধে মুসলমান সেনাপতিগণের পার্শ্বে আমরা চম্পত রাও, ভগবান সিংহ হাজা, ইন্দ্রদুন্ন এই তিনজন হিন্দু সেনাপতি, বাঙ্গালায় সুলতান সুজার বিরুদ্ধে খাজোয়ার সমরক্ষেত্রে সেনাপতি রাজা সুজান সিংহ এবং রাম সিংহ আওরঙ্গজেবের স্বপক্ষে যুদ্ধ করেন। শিবাজীকে দমন করিবার জন্য তিনি জয়সিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব হিন্দু ও মুসলমান সেনাপতিগণকে যৌথ দায়িত্ব দেয়া গুরুত্বপূর্ণ কার্যে প্রেরণ করিতেন।"[৩৩]

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন খাঁটি মুসলমান ও পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মাদর্শের ভিত্তিতে রাজ্য শাসনকল্পে ইসলাম ধর্মানুমোদিত কয়েকটি বিধান জারি করেন। সম্রাট স্বয়ং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের আইন-কানুন পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করতেন। দুর্নীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন, ধর্মহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা হতে তিনি সাম্রাজ্যকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন। একজন নিষ্ঠাবান শাসক ধার্মিক ও আদর্শ মুসলিম হিসাবে তিনি 'জিন্দাপীর' হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে R. C. Majumdar বলেন,

æHis private life was marked by a high standard of morality, and he scrupulously abstained from the common vices of his time. Thus he was regarded by his contemporaries as a 'darvish born in the purple' and the Muslims venerated him as a æZinda Pir or living saint."[৩৪]

সম্রাট আওরঙ্গজেব সামাজিক ও নৈতিক দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ কল্পেও আইন জারি করেন। হিন্দুদের সমাজের প্রচলিত সতীদাহ প্রথাও তিনি রহিত করেন। এছাড়া সিংহাসনে আরোহণের পর পরই প্রজাদের কল্যাণের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব ৮০ প্রকার কর ও শুল্ক রহিত করেন। এর মধ্যে বেশ কিছু কর হিন্দুদের দিতে হত। তাঁর নৈতিক সাহস ছিল দুর্জয়, যার জন্য তিনি উল্লেখিত বিধানসমূহ কার্যকর করতে পেরেছিলেন। এই বিধি বিধানসমূহ প্রবর্তনের কারণে ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে ভারতের সকল মুঘল সম্রাট অপেক্ষা আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে অধিক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

এমনকি তার বিরোধীতাকারী ঐতিহাসিকগণ সম্রাটের নামে কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১. হিন্দু মন্দির ও টোল ধ্বংস, ২. হিন্দু কর্মচারীদের পদচ্যুতি ও ৩. হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুন:প্রবর্তন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে সবার নিকট সমাদৃত ছিলেন। মন্দির ধ্বংসের যে অভিযোগ করা হয় তা থেকে সুলতান মাহমুদও রেহাই পাননি। উভয়েই যদি মন্দির ধ্বংসের মত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত থাকতেন তাহলে অদ্যাবধি কোন মন্দিরই ভারতবর্ষের কীর্তির স্বাক্ষর বহন করত না। দিল্লী, আগ্রা, বেনারস ও গুজরাটসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন হিন্দু মন্দির আজও কালের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে - যা বিস্ময়ের উদ্রেগ করে। তবে সম্রাটের এক ফরমানে দেখা যায় যে, তিনি প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন এবং নতুন মন্দির তৈরি না করতে বলেছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো এমন কিছু মন্দির ধ্বংস করা হয় তা সম্রাট আকবরের সময়ও করা হয়েছিল। নিচের উক্তিতেও এ কথার সমর্থ পাওয়া যায় –

"তাঁহার সময়ে বিনা কারণে– শুধু ধর্মীয় কারণে কোন মন্দির ধ্বংস করা হয় নাই। ধর্ম মন্দিরে রাজদ্রোহ ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলিত বলিয়া অনেক মন্দির ধ্বংস করা রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার জন্য সম্রাট কখনো উদগ্রীব হইয়া উঠেন নাই। আলেকজান্ডার হ্যামিলটন এর মতে আওরঙ্গজেবের আমলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে জীবন যাপন এবং নিজ নিজ ধর্ম পালন করিতে পারিত। কাহারো ধর্ম স্বাধীনতা খর্ব করা হয় নাই।"[৩৫]

অন্যত্র এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"আওরঙ্গজেব ঘোষণা করেন যে, "ইসলামে শরিয়ত অনুযায়ী আমরা আদেশ দিয়েছি যে, হিন্দুগণের মন্দির ও প্রতিমা পূজার অধিকার থাকিবে এবং আমাদের আশ্রয়প্রাপ্ত হইবে..... আমরা আদেশ করিতেছি যে, এই আদেশে বাণী প্রচারের তারিখ হইতে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি কোন পূজা বিষয়ে অত্যাচার করিতে পারিবে না। আমাদের প্রজাগণ সুখ শান্তিতে বাস করুক এবং আমাদের মঙ্গল কামনা করুক।"[৩৬]

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর সফল প্রচেষ্টা হয়েছিল এবং আওরঙ্গজেবের আমলেও সেই মৈত্রী সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয়নি। তিনি আরও বলেছেন-

"মুঘল আমলে অবশ্য বহু হিন্দু ধর্মত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল; কিন্তু যতদূর জানা যায় এই কারণে উভয় পক্ষে কোন শত্রুতার ভাব জেগে উঠেনি। ইসলাম ধর্মে সকল মানুষের সমান অধিকার নীতি হিসাবে স্বীকৃত বলে নিম্নবর্ণের বঞ্চিত হিন্দুদের কাছে তার একটা বিশিষ্ট আবেদনও ছিল।"[৩৭]

হিন্দু কর্মচারীদের বরখাস্ত করার অভিযোগও সত্য নয়। তবে একথা সত্য যে, কেবল কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ হিন্দু কেরানি দেওয়ান রাজস্ব আদায়কারীকে শাসন বিভাগের নিরাপত্তার জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল। তাঁর শাসনামলে সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগে বহু হিন্দু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। এ সময় উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা সম্রাট আকবরের সময়ের সংখ্যার তুলনায় বেশি ছিল। সম্রাট আকবর হিন্দুদের নিকট সর্বাধিক প্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেই সম্রাট আকবরের সময় সরকারি কার্যে শতকরা ১৩ জন অমুসলমান নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে তাদের সংখ্যানুপাত ছিল শতকরা ২০ ভাগ। ৫৩৯ জন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ১০৪ জনই ছিলেন হিন্দু। রাজসিংহ, ভীমসিংহ, জয়সিংহ, ইন্দ্রসিংহ, যশোবন্ত সিংহ প্রমুখ হিন্দু রাজকর্মচারীগণ এ সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এছাড়া অনেক রাজপুত রাজা হিন্দুদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের পক্ষে সৈনিক ও সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন। কাজেই সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দু কর্মচারীদের বিনা অপরাধে পদচ্যুত করেছিলেন এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। মুসলমান শাসনাধীনে অমুসলিম প্রজার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য জিজিয়া কর ধার্য করা হয়। সম্রাট আকবর এ কর উঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক শ্রেণীকে সামরিক কাজে নিয়োগ করেছিলেন। অমুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামরিক কাজে নিযুক্ত করার বিষয়টি সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে আইনসংগত মনে হয়নি এবং এজন্য তিনি জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, শিশু, উন্মাদ ও বৃদ্ধদেরকে এই কর দিতে হতো না। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমালোচকরা জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তনের মধ্যে সম্রাটের ধর্মান্ধতা লক্ষ করেছেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সিংহাসন আরোহণের ২১ বছর পর (১৬৭৯ খ্রি.) তিনি জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। কারণ বিদ্রোহ ও যুদ্ধের ফলে এবং প্রায় ৮০ প্রকারের বাড়তি কর উঠিয়ে দেওয়ার রাজকোষে অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়। যদি তিনি ধর্মান্ধতাবশত এ কাজ করতেন তাহলে দীর্ঘ একুশ বছর অপেক্ষা করার কোন কারণ ছিল না। কাজেই একথা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব কোন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে নয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করেছিলেন।[৩৮]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও মাঝে মাঝে আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন– "আওরঙ্গজেব কখনই কৌতুক প্রিয় ছিলেন না, 'অতএব' তাঁহার জন্মতিথির উপলক্ষে অন্তপুরে সেরূপ বাজার হইত তিনি তাহাতে গমন করিয়াও অধিককাল আমোদ প্রমোদ করিতেন না।[৩৯]

আবার প্রশংসামূলক কথাও বলেছেন-

"আওরঙ্গজেব বাস্তবিক কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রার্থীমাত্রের আবেদন সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন এবং দৈনিক কার্য সমুদয় সমাধান না হইলে, যত বেলা হউক না কেন, সভাভঙ্গ করিয়া যাইতেন না। তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয় পরায়ণ নৃপালগণের ন্যায় মন্ত্রিবর্গের প্রতি সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিতেন না। আপনি মসুদায় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেন এবং উজীর ওম্রা প্রভৃতি সকলে তাঁহার কার্যাসচিব মাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার আহার বিহারাদিতে ও অতি অল্পকাল ব্যয় হইত। প্রত্যয় প্রাতঃকালে আমখাসে এবং সন্ধ্যার সময়ে গোসল-খানায় গমন করিয়া উজীর অমাত্য প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন কোন দিন আদালতখানায় গিয়া কিরূপে ব্যবহার সকল নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিতেন, কোন কোন দিন অশ্বশালায় এবং হস্তিশালায় যাইয়া ভৃত্যেরা স্ব স্ব নিয়োজিত কার্যে মনোযোগী আছে কিনা দর্শন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজভবনের সম্মুখবর্ত্তী যমুনাতীরস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে সৈন্যগণের কুচকাওয়াজ দেখিয়া কাহারও বা বেতন বৃদ্ধি কাহারও বা কর্ত্তন করিয়া গুণবানের পুরস্কার এবং গুণহীনের তিরস্কার করিতেন। এইরূপ তাঁহার সমুদয় দিবসাবসান হইত। রাত্রিতেও তাঁহার অধিক নিদ্রা ছিল না। একটি নিভৃত গৃহে বসিয়া অতি প্রধান প্রধান পত্রাদির স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। অনেক বিষয় সেই স্থান হইতেই নির্বাহিত হইত। অমাত্যেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতেন না।[৪০]

এভাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের একটি কর্মব্যস্ত দিনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে তিনি সম্রাট শাহজাহানের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। মুঘল স্থাপত্য শিল্পের প্রশংসা করতে গিয়ে ভূদেব বার বার শাহজাহানের দিল্লি-আগ্রার কীর্তির কথা উল্লেখ করেছেন এবং সাধারণভাবে বাদশাহের গুণগান করেছেন। ভূদেবের ভাষায় "যে সকল পর্য্যটক তৈমুরলঙ্গবংশীয় বাদশাদিগের সময়ে দিল্লীনগরের এবং তত্রত্য রাজসভার শোভা নয়নগোচর করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, তখন পৃথিবীতে আর কোথাও তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শন করেন নাই। প্রাচীন রাজধানী শোভাবিহীন হইয়াছিল বলিয়া আরঙ্গেবের পিতা শাহজাহান সমুদয় নগরটি নতুন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সাহজাহানবাদ অর্থাৎ নবদিল্লীর রাজবর্ত্ম সকল কেমন প্রশস্ত হইয়াছিল!– তন্মধ্যে এবং উভয়দিকে কেমন পরিপাটিরূপ বিন্যস্ত পাদপগণ নগরটিকে শোভাময় এবং সুখ-প্রদ করিয়াছিল। এক্ষণে দিল্লীর সেই শোভা নাই। তথাপি ইংলণ্ডীয় সম্রাটদিগের রাজধানী কলিকাতা নগরী তাহার নিকট অনেক বিষয়ে লজ্জা পায়েন। নগরের প্রাসাদগুলিও কি সুন্দর। বিশেষতঃ শ্বেত মারবেলে নির্ম্মিত মসীদ্‌টির শোভার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন। রাজবাটী দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার বেষ্টিত – এবং বহুমূল্য মারবেল প্রস্তরে অতি পরিপাটিরূপে নির্ম্মিত। মুসলমানেরা যে হস্তশিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হইয়াছিল তাহার এই প্রমাণ যে, তাহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকা সকলের খোদকতা কার্যের আধিক্য, তথাপি দ্রষ্টৃবর্গের মনে অদ্ভুতরসের বই অন্য রসের উদয় হয় না। কোন সুবিজ্ঞ পর্য্যটক কহিয়াছেন

যে, মুসলমানদিগের নির্ম্মাণ সকলে জহুরির ন্যায় সূক্ষ্মকারুতা এবং অসুরের ন্যায় অতিমনুষত্ব প্রতীয়মান করে। বিশেষতঃ ঐ সাজাহান ভূপাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আগ্রা নগরীস্থিত জগদ্বিখ্যাত তাজমহল অট্টালিকা ঐরূপ নির্ম্মাণ কীর্ত্তির অসাধারণ দৃষ্টান্তস্থল। যেমন নিশাকালীন আকাশমণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাস্তবকখচিত হইয়া মানবগণের অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দের আবির্ভাব করে, তাজ্‌মহলও সেইরূপ অপব্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য দ্বারা দর্শকমাত্রের মনে অদ্ভুত রসের উদয় করে। আর ঐ সাজাহান নির্ম্মিত 'ময়ুরতক্ত' নামক সিংহাসনের শোভাই বা কি বলিব? সেই রাজাসন দুইটি দিব্য-গঠন ধাতুনির্মিত ময়ূরের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত। ঐ ময়ূরদ্বয়ের পুচ্ছদ্বয় সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকিত। নৃত্যকারী ময়ূরের পক্ষ ও পুচ্ছে যে সকল বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, ঐ পুচ্ছেও নানাবিধ মণিমাণিক্যাদি দ্বারা সেই সমুদয় বর্ণই সুপ্রকাশিত ছিল।" এই জগদ্বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসনের অন্য আর এক স্থানে খুব সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই মুহূর্তে আওরঙ্গজেব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এবং শিবাজী সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের জন্য দরবারে প্রবেশ করেন। "তিনি দেখিলেন, একটি অত্যুচ্চ বেদীর উপরিভাগে আরঙ্গেব ময়ূরতক্তে উপবিষ্ট হইয়াছেন। বাদসাহের পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ সাটিন বস্ত্রে প্রস্তুত, উষ্ণীষ সুবর্ণময়, তন্নিম্নে, অতি মহামূল্য হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে এবং তাহার ঠিক মধ্যভাগে একটি মাণিক্য অর্কতুল্য রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে।"[৪১]

এইভাবে শাহজাহানের কৃতিত্বকে তুলে ধরেছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে। এটি সম্রাট শাহজাহানের প্রতি তাঁর দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। রাজনৈতিক কারণে আওরঙ্গজেব পিতা সম্রাট শাহজাহানের কারাবন্দী করাকে তিনি ভাল চোখে দেখেননি। এ বিষয়টি তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। নিচের ভাষ্যে সেই সত্যটিই উপলব্ধ হয়েছে মর্মে মর্মে-

"যে শাজাহান এই মনোহর নবদিল্লী, এবং ইহার দিব্যগঠন প্রাসাদসকল ও মহামূল্য পরম শোভাময় রাজাসান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায়? .... তাঁহার দুরবস্থার উপমাস্থল নাই। তিনি স্বীয় আত্মজ আরঙ্গেব কর্ত্তৃকই জীবন্মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা! সাজাহানের দুরবস্থা স্মরণ করিলে কাহার মনে পুত্র হউক বলিয়া আর স্পৃহা হয়? অথবা কোন দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া স্বয়ং ঐশ্বর্য্যশালী নহেন বলিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান না করেন? অহো! বিভব কি ভয়ানক বস্তু! প্রভূত্বশক্তি লোকের এতাদৃশ প্রার্থণীয় যে, তজন্য মনুষ্যদিগের মন হইতে আশৈশব প্রতিপালনকারী পিতার প্রতিও শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অপনীত হইয়া যায়। বৃদ্ধ বাদসাহ সাজাহান, দুষ্ট পুত্র আরঙ্গেব কর্ত্তৃক অপহৃত-সর্ব্বস্থ হইয়া কারাবাসীর ন্যায় অবরোধ-নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন।"[৪২]

সম্রাট শাহজাহানের গৌরবময় রাজত্বকালের শেষ দিকে পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। তবে এই ঘটনার জন্য শুধু এককভাবে আওরঙ্গজেব দায়ী ছিলেন না। এ সম্পর্কে R. C. Majumder বলেছেন-

æIn this, he was simply following the example that had become almost traditional in the Timurid Family in India. It would be unjust to throw on him the entire responsibility for the war of succession; it would have come at any rate, as none of the brothers was willing to make any compromise. It should not be forgotten that while Shah Jahan removed all his possible rivals Aurangazeb did not put to death all his nephews. It is indeed hard to defend Aurangazeb's harsh treatment of his old father, but in justice to him it should be noted that at least he was not a parricide of which we find numerous instances in the history of India and of ther countries."[৪৩]

সর্বোপরি এই ঘটনা ঘটেছিল মধ্যযুগে (১৬৫৭ খ্রি.)। সে যুগে ক্ষমতা দখলের জন্য ভ্রাতৃহত্যা কেন, পিতৃহত্যাও ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। আর ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসটি লিখেছেন আধুনিক যুগে। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে সম্রাট আওরঙ্গজেব সিংহাসন দখলের পশ্চাতের ঘটনাগুলি অত্যন্ত নির্মম এবং অস্বাভাবিকও বটে। কিন্তু আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে স্থান ও সময়ের ব্যবধানে ন্যায় ও অন্যায়ের সংজ্ঞা বদলে যায়, যা আজকের দৃষ্টিতে অন্যায় সেদিন তা ছিল ন্যায়সঙ্গত। তবে এই নিষ্ঠুরতার জন্য একমাত্র আওরঙ্গজেব দায়ী ছিলেন, একথা বললে তাঁর প্রতি সত্যিই অবিচার করা হবে। এক্ষেত্রে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে।

"শাহজাহানের মৃত্যুর পূর্বেই সিংহাসনলোলুপ পুত্রদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে আওরঙ্গজেবের ভূমিকাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মুঘল পরিবারে যে পরম্পরা চলে এসেছিল, তদানীন্তনকালে সিংহাসনের লোভে যে পরস্পর দ্বেষ ও হিংসা অপ্রত্যাশিত ছিল না, তা ভুলে গেলে চলবে না। সবচেয়ে নতুন এবং সবচেয়ে কর্মক্ষম বলেই আওরঙ্গজেব তখন জয়ী হয়েছিলেন; ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতিরও কোন আশা ছিল না, উদারচেতা এবং অধ্যয়ন প্রিয় হয়েও দারা শুকো পর্যন্ত যুদ্ধ না করে পারেননি, আর যুদ্ধ একবার বাধলে ন্যায় অন্যায়বোধ অন্তত সাময়িকভাবে যেন স্থগিত থাকে। শাহজাহান, প্রতিদ্বন্দ্বী হবার যারা সম্ভাবনা রাখত তাদের সকলকে হত্যা করেছিলেন, সে তুলনায় আওরঙ্গজেবের পক্ষে দাবি করা চলে যে প্রত্যেকটি ভ্রাতৃষ্পুত্রের প্রাণহরণ তিনি করেননি। পিতাকে বন্দী

করে যন্ত্রণা দেওয়ার অপরাধে অবশ্যই আওরঙ্গজেবকে অভিযুক্ত করা যায়, কিন্তু সর্বদেশে রাজপরিবারে পিতৃহন্তাদের যে উদাহরণ মেলে, আওরঙ্গজেবকে অন্তত তাদের মধ্যে ফেলা যায় না।"[৪৪]

'অঙ্গুরীর বিনিময়ে' সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরের ঐতিহাসিক চরিত্রটি মারাঠা নেতা শিবাজীর। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে যাকে স্বদেশপ্রেমিক ও বীরযোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত করেছেন যিনি স্বাধীন 'মহারাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিশালী মুঘলদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন বহুবার। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আওরঙ্গজেবের কন্যা রওশনারাকে অপহরণ করেন, তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। পরবর্তী সময়ে শিবাজী রওশন আরা-র প্রেমে পড়েন যদিও তার সফল পরিণতি ঘটেনি উপন্যাসে এমনটি বর্ণিত আছে। উপন্যাসের নায়ক শিবাজী ও নায়িকা আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারা। মুঘল ইতিহাসের আধারে এক কাল্পনিক বিষয়ের উপস্থাপনা। কারণ রওশন আরা নামে আওরঙ্গজেবের কোন কন্যা ছিল না বরং বোন ছিল। আর কোন মুঘল কন্যার সাথে শিবাজীর প্রেম ছিল এমনটি কখনও শুনা যায়নি। শিবাজী চরিত্রে তার অন্তরের সত্যিকার প্রেম ও বাইরে স্বদেশ প্রেম পাশাপাশি সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়েছে। একাধারে তাকে একজন বীর যোদ্ধা, প্রেমিক ও স্বদেশ প্রেমিক অর্থাৎ সব রকম মানবিক গুণে গুনান্বিত করে উপন্যাস চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। অপরদিকে মুসলমান সৈন্যদের নির্যাতিত ও ধ্বংসকারী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। বস্তুত, শিবাজী ততটা নিষ্কলুস ছিলেন না যতটা তাকে উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, তিনি একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বিচ্ছিন্ন মারাঠাদের একটি জাতিতে পরিণত করেছিলেন। সর্বোপরি মুসলিম রাজ্যের একজন সামান্য জায়গিরদারের পুত্র হয়ে নিজ শ্রম, অধ্যবসায়, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও দক্ষতা বলে তিনি একজন শক্তিশালী রাজার মর্যাদায় উন্নীত হন এবং মুঘলদের বিরোধীতার মধ্যেও একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শিবাজী দুঃসাহসিকতার জন্য খ্যাত ছিলেন, তবে সামরিক জীবনের সূচনা হয় লুটতরাজের মধ্য দিয়ে। ১৬৬৫ সালে তিনি সুরাট দুর্গ লুণ্ঠন করেন, এমনকি তীর্থ যাত্রীদের জাহাজও তিনি লুণ্ঠন করেন।

মহারাষ্ট্রের অধিবাসী মারাঠা নেতা ছিলেন শিবাজী। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে (হীরেন্দ্রনাথের মতে ১৬২৯/১৬৩০) শিবনার দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। শিবাজীর মাতার নাম জিজাবাই ও পিতার নাম শাহজী ভোঁসলে – যিনি কর্ণাটকের জায়গীর ছিলেন। শিবাজীর পিতা তুকাবাঙ্গা নামে একজন মহিলাকে বিয়ে করার ফলে পুত্র শিবাজী ও পত্নী জিজাবাঈয়ের প্রতি সদয় ছিলেন না। মা ও ছেলে উভয়েই দাদাজী খণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। জিজাবাঈ ছিলেন গুণবতী, বুদ্ধিমতী ও ধর্মপরায়না মহিলা। শিবাজী তার মা ও ধর্মগুরুর রামদাসের মাধ্যমে গোঁড়া হিন্দু ধর্মের সাথে

পরিচিতি লাভ করেন। তিনি লেখা পড়ার তেমন সুযোগ পাননি, তবে মায়ের কাছে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত হিন্দু বীরদের গল্প শুনে অল্প বয়স হতেই বীর হবার বাসনা জাগ্রত হয়। গুরু রামদাস তাঁকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন। এর উল্লেখ ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাস 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এ আছে। রামদাস গুরুর কাছে তিনি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিবাজী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিলেন মুঘলদের বিরুদ্ধে এবং পর্যুদস্ত করে তুলেছিলেন মুঘল শাসনকে। শিবাজীকে দমন করার জন্য আওরঙ্গজেব একে একে পাঠিয়েছিলেন শায়েস্তা খান ও রাজা জয়সিংহকে। জয়সিংহের মাধ্যমে তিনি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন কিছু দিনের জন্য। যদিও পরে তিনি আবার সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং মহারাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন সামরিক দক্ষতার বলে এটি যেমন সত্য, আবার কোন কোন সময় জয়লাভ করেছেন কপটতার আশ্রয় নিয়ে এটিও তেমন সত্য। তবে শিবাজী মোটামুটি সফল হয়েছিলেন বলা যায়, কেননা তিনি বিচ্ছিন্ন মারাঠাদের একটি গৌরবময় জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুসলমানরা ভারতবর্ষে ছিল বহিরাগত। তাই হিন্দুস্থানের বিভিন্ন সম্প্রদায় সবসময় চেয়েছে তাদের বিতাড়িত করতে। তারই ধারাবাহিকতায় শিবাজীর উত্থান এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মারাঠা জাতিকে নিয়ে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। বস্তুত, মারাঠাদের সংগ্রাম ছিল স্বদেশরক্ষা আর মুঘলদের লক্ষ ছিল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ।

এরপর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন জয়পুরের প্রদেশাধিপতি রাজপুত রাজা জয়সিংহ। যে কয়জন রাজপুত রাজা মুঘলদের বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করেছেন তার মধ্যে একজন হলেন রাজা জয়সিংহ। আওরঙ্গজেব শিবাজীর বিদ্রোহ দমনে জয়সিংহকে নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি তাতে খানিকটা সফলও হয়েছিলেন। তিনি শিবাজীকে বুঝিয়ে রাজদরবারে এনে সন্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা উপন্যাসে উল্লেখ আছে। তবে তাঁকে হত্যা করার যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার সত্যতা পাওয়া যায় না। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে বুরহানপুরে জয়সিংহ মৃত্যুবরণ করেন।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে নায়িকা চরিত্র রোসিনারা - যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা প্রেমানুভূতির প্রকাশ পেয়েছে। "ভূদেবের কল্পনার রোসিনারা মানবিক প্রেমের প্রদীপ হাতে বর্তমানের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত। প্রেমের ঐশ্বর্য ও অনির্বাণ দ্বীপ-শিখার কাছে জাতি-ধর্ম-নীতিজ্ঞান তুচ্ছ। রোসিনারা মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যাই হোক; কিংবা রাজপুত জাতির প্রতাপ সিংহের দুহিতাই হোক তা আমাদের কাছে বড় কথা নয়। রোসিনারার বড় পরিচয় সে

মানব কন্যা, ভূদেবের মানস-কন্যা। রোসিনারার এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমবোধ ইতিহাসের একটি শক্তিশালী চরিত্রের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে লেখকের শ্রম ব্যয় হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ফলে শিল্প সৌকর্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এতে সন্দেহ নাই। উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রের মানবিক দ্বন্দ্ব উৎকণ্ঠা, দ্বিধা, সংঘাত সবই রোসিনারার মধ্যে বিদ্যমান। প্রথমত, তার চরিত্রে দুটি দিক ফুটে উঠেছে, একটি আভিজাত্যের অহংকার, অন্যটি নারীত্বের পরিচয়। একটি বিসর্জন দিয়ে অন্যটির প্রতিষ্ঠা ঘটালে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা রক্ষা পায় না। ভূদেব এ বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলেছেন।[৪৫] এভাবেই উপন্যাসে রোসিনারার চরিত্রাঙ্কন করেছেন, যেখানে তিনি একজন আত্মত্যাগী নারী। ত্যাগেও যে প্রেম মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠে তাঁর জীবনাদর্শ দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। বলা যায়, রোসিনারা চরিত্রটি ভূদেবের একটি অসাধারণ সৃষ্টি। তবে রোসিনারাকে আওরঙ্গজেবের কন্যারূপে কল্পনা করে উপন্যাসে যে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা হয়েছে বাস্তব ঘটনা তা নয়। ইতিহাসে যে রওশন আরার পরিচয় পাওয়া যায় তিনি সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় কন্যা ও আওরঙ্গজেবের ভগ্নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আওরঙ্গজেবের সন্তানদের মধ্যে রোসিনারা নামে কোন কন্যা ছিল না। নিম্নে বর্ণিত আওরঙ্গজেব স্ত্রী-পুত্র-কন্যার তালিকা থেকে তা প্রমাণিত হবে :

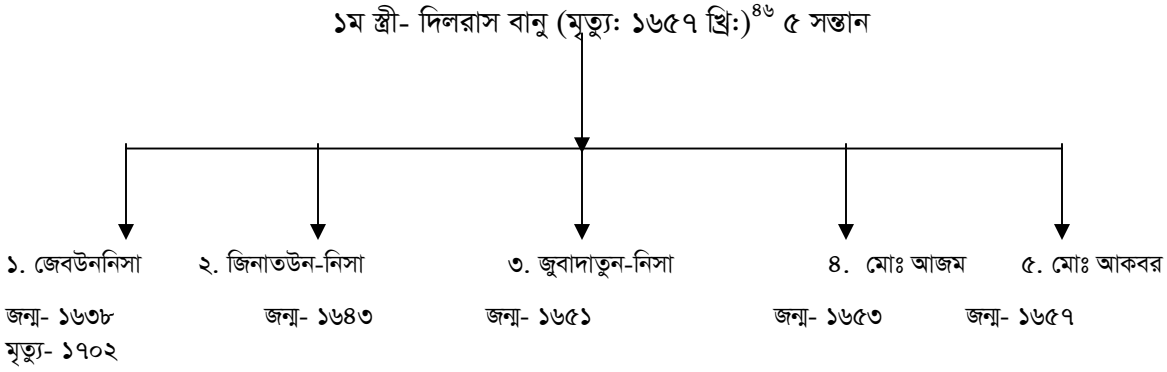

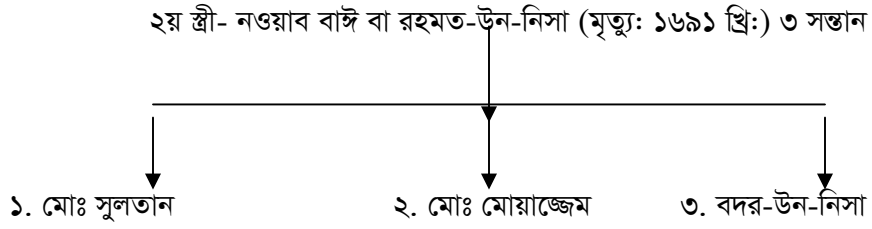

জন্ম- ১৬৩৯
মৃত্যু- ১৬৭৬

(শাহ আলম বা
বাহাদুর শাহ)
জন্ম- ১৬৪৩
মৃত্যু- ১৭১২

জন্ম- ১৬৪৭
মৃত্যু- ১৬৭০

৩য় স্ত্রী- ঔরঙ্গবাদী মহল (মৃত্যুঃ ১৬৮৮ খ্রিঃ) ১ কন্যা

↓

১. মেহের-উন-নিসা
জন্ম- ১৬৬১
মৃত্যু- ১৭০৬

৪র্থ স্ত্রী- উদীপুর মহল- ১ পুত্র

↓

১. মোঃ কাম বক্স
জন্ম- ১৬৬৭
মৃত্যু- ১৭০৯

৫ম স্ত্রী- জয়নাবদি (হিরা বাঈ) এবং
৬ষ্ঠ স্ত্রী- দিরারাম কোন সন্তান ছিল না।

সম্রাট আওরঙ্গজেব পুত্রকন্যার তালিকার পাশাপাশি সম্রাট শাহজাহানের পুত্রকন্যার নামের তালিকা লক্ষ করলে রওশন আরার অবস্থান বোঝা যাবে। মানুচীর মতে, শাহজাহানের ৪ পুত্র ও তিন কন্যা ছিল।

শাজাহান[৪৭] ৩ কন্যা

↓

১. জাহানারা বেগম | ২. রওশন আরা | ৩. গওহর আরা

৪ পুত্র

↓

১. দারাসিকো | ২. সুজা | ৩. আওরঙ্গজেব | ৪. মুরাদ

William Irvine নিকোলা মানুচীর (Niccolao Manucci [1639–1717]) *Storia do Mogor* সম্পাদনাকালে পাদটিকায় শাহজাহানের চার কন্যার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বেগম সাহিবকে জাহানারা হিসাবে মনে করেছেন।

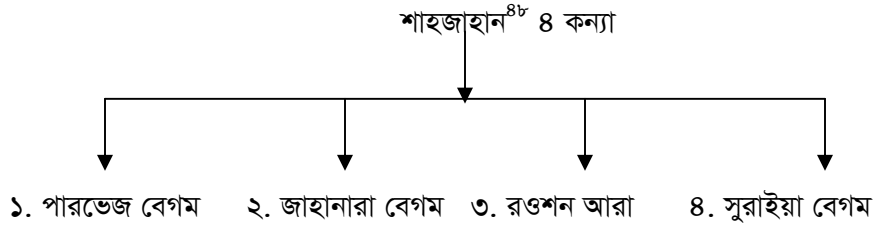

Stanhy Lane Poole তাঁর Aurangzib গ্রন্থে Sir William Wilson Hunter এর Rulers of India-এর উপর নির্ভর করে শাজাহানের পুত্র-কন্যার তালিকা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন:

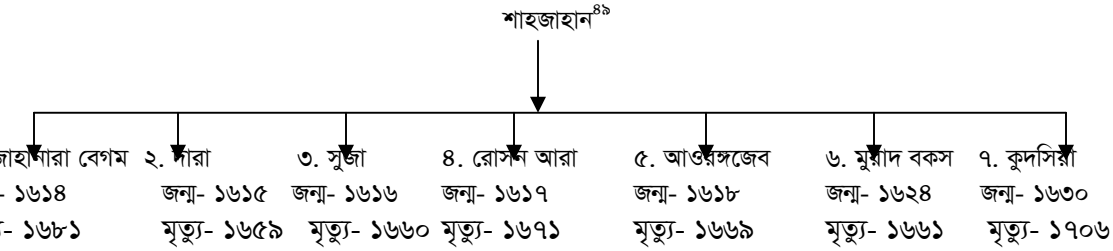

আওরঙ্গজেব ও শাহজাহানের পুত্র কন্যাদের তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রওশন আরা আওরঙ্গজেবের কন্যা নয়, ভগ্নী এবং শাহজাহানের কন্যা। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কন্টারের লেখা বই The Romance of History – India'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' লিখেছেন বলে স্বীকার করেছেন। কন্টারের বইয়ে রওশন আরাকে আওরঙ্গজেবের কন্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ভগ্নী হিসাবে রওশন আরা আওরঙ্গজেবের খুব প্রিয় ছিলেন। সম্রাট শাহজাহান যখন আওরঙ্গজেবকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন, রওশন আরার মাধ্যমে রাজদরবারে যত গোপন খবর তখন আওরঙ্গজেব জেনে নিতেন। রওশন আরাও ভাই আওরঙ্গজেবের অতি ভক্ত ছিলেন।

ভ্রাতৃ-ভগ্নীর এই স্নেহ-শ্রদ্ধা সম্পর্ক ও পক্ষপাতিত্ববোধ দেখে কন্টার রওশন আরাকে আওরঙ্গজেবের কন্যা বলে ভুল করেছেন কিনা? নাকি নিছক রোমান্স সৃষ্টির জন্য তা করেছেন তা বলা দুষ্কর। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কন্টারকে অনুসরণ

করেছেন হয়ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের অপ্রতুলতার কারণে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' যতখানি ঐতিহাসিক উপাদান নির্ভর, তার চেয়ে বেশি শিবাজীর স্বদেশপ্রেম ও রোসিনারার প্রেম কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। অঙ্গুরীয় বিনিময়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ঔপন্যাসিক উদীয়মান মারাঠা জাতির বীর পুরুষ শিবাজীকে গল্পের নায়ক করেছেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে, একমাত্র মারাঠারাই নবভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ভূদেবকে মারাঠা বীর আকৃষ্ঠ করার আরো কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, সেকালে হিন্দু ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ মারাঠাদের মধ্যে প্রবল ছিল এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিবাজীর মধ্যে সেই স্বাধীনতার স্পৃহা ছিল লক্ষণীয়। কাহিনী আবর্তিত হয়েছে শিবাজীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আদর্শ রণকৌশল ও নীতির বর্ণনাকে কেন্দ্র করে। মোট কথা, শিবাজীকে তিনি আদর্শবানদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেছেন। উনিশ শতকের যে স্বাধীনতার স্পৃহা জেগেছিল ভূদেবের মধ্যে, তা তিনি শিবাজীর জীবনীতে ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে জয়সিংহ ও শিবাজীর কথোপকথন এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"মহারাজ! আমাদিগের একত্রে মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয়; দেশের মুখ উজ্জ্বল হয় এবং অন্য সর্ব্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম্ম কি কর্ত্তব্য নহে? দেখুন দেখি দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমা-কর্ত্তৃক হ্রস্বতেজা হয়েন, উভয়ই আরঙ্গেবের মঙ্গলাবহ।"[৫০]

দেশের মুখ উজ্জ্বল করা এবং জাতীয় ধর্ম রক্ষা করার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অঙ্গুরীয় বিনিময়ের অপর এক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন বিজিত কুমার দত্ত:

"আগে যে সমস্ত ঐতিহাসিক গাল-গল্প পেয়েছি সেখানে রোমান্স, কিংবা যুদ্ধ বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইতিহাসের ক্ষীণ পদধ্বনি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কাহিনীটি ইতিবৃত্তমূলক। ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে রোমান্স অংশ ততটা প্রাধান্য পায়নি সত্য, কিন্তু সমস্ত কাহিনী জুড়ে একটি ঐতিহাসিক আবহ রয়েছে। শিবাজীর পার্বত্য দুর্গের বর্ণনায় মারাঠাদের সাহসিকতায় যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনায় রাজ-অন্তপুরের চকিত উদ্‌ঘাটনে শাহজাহানের করুণ জীবনী প্রকাশে, বাদশাহজাদীর ট্রাজিক অবস্থায় আওরঙ্গজেবের শঠতা ক্রুরতার বর্ণনাতে ভূদেব ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলটি অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। অথচ তথ্য কোথাও আত্যন্তিক হয়ে দেখা দেয়নি। সর্বত্রই এই কাহিনীর গতি সাবলীল - যা ঘটেনি অথচ সম্ভব ছিল সেই সত্য উদ্‌ঘাটনে ভূদেব যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ইতিহাস কাহিনীটির কেন্দ্রবিন্দুতে আর রোমান্স ইতিহাসের চারদিকে একটা সরু পাড় বুনে দিয়ে নবতর বৈচিত্র্যের সূচনা করেছে।"[৫১]

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ঔপন্যাসিক অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন সময়ের একটি আধুনিক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন সেটি হচ্ছে-

"প্রেম এবং বিধর্মিতা একাধারে রাজনৈতিক ও ধর্মগত বিজাতীয়তার দ্বন্দ্ব উপন্যাস কাহিনীর অন্তর-বাইরে যুগপৎ প্রকট হয়েছে। বহিরঙ্গে এই দ্বন্দ্বের উৎস শিবাজী ঔরঙ্গজীবের রাষ্ট্র-বৈরি। অন্তরঙ্গে আছে পিতৃশত্রু – হিন্দু-রাজার প্রতি রোসিনারার ক্রম অনুরাগ সঞ্চারের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গ্রন্থি-মোচন। নারীর স্বয়ং-স্বতন্ত্র প্রণয়াধিকার ও সমাজ-পটভূমির বিরোধিতা ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনীতে উনিশ শতকের জাগ্রত জীবন দ্বন্দ্বে গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে। গল্পের যেমন উপন্যাসোচিত পরিণতি বোধ ও সমস্যা সচেতনতা রয়েছে তেমনি তার পরিণতি নির্দেশে আছে দুর্বল হলেও অখণ্ড জীবনবোধের নিশ্চিত প্রেরণা।"[৫২]

Hobert Caunter রচিত The Romance of History – India গ্রন্থের 'The Mahratta Chief' এর ঘটনাংশ অনুকরণে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসটির কাহিনীর বিন্যাস ঘটালেও কন্টারের অনেক অংশই বাদ দিয়েছেন। কন্টার যদিও রোমান্সকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রূপদান করেছেন, সেখানে ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটেছে খুব সামান্যই। তবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই রোমান্সের সাথে ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের সংমিশ্রণে নতুনত্ব আনার প্রয়াস পেয়েছেন। কন্টার শিবাজী-রোসিনারার বিয়ে দিয়েছেন কিন্তু ভূদেবের গ্রন্থে শিবাজী রোসিনারার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এটা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল মূলত, শিবাজীর স্বদেশ প্রেমকে তুলে ধরা। সেই সাথে নব্য অভ্যুত্থানকৃত ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মারাঠা জাতির ইতিহাস বর্ণনা করা। ভূদেব শিবাজীর স্বদেশ প্রেমের প্রেরণাদাতা রামদাস স্বামীকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। আবার মুঘল কারাগারের রোসিনারার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের পিতা সম্রাট শাহজাহানের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। তবে কন্টারে এসব বিষয়ের উল্লেখ নেই। দুটি কারণে ভূদেব শাহজাহানের আবির্ভাব ঘটিয়ে থাকতে পারেন। "প্রথমত এতবড় মুঘল বাদশা বৃদ্ধ পিতার প্রতি পুত্রের অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণ প্রদর্শনের ও প্রচারের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত শিবাজীর প্রতি রোসিনারার গভীর মানবিক প্রণয় বোধের প্রশ্নে শাহজাহান বাদশার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানানো।"[৫৩] 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের স্বল্পতা থাকলেও তিনি যা করতে চেয়েছেন তা হলো ইংরেজ শাসিত পরাধীন দেশে মুঘলকে ইংরেজের প্রতীক করে মহারাষ্ট্রীয় শক্তির ঐক্যের ভিতর দিয়ে এদেশে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

দেলওয়ার হোসেনের মতে, "বাংলা সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ঐতিহাসিক ঔপন্যাস কিনা তার বিচার অবশ্যই আবশ্যক। কিন্তু একথাও সত্য যে, শিবাজীর স্বদেশ প্রেম এবং রোসিনারার মানবিক প্রেম সে যুগের বড় ইতিহাস। কাজেই কন্টারকে অনুসরণ করা ভূদেবের পক্ষে একটি উপলক্ষ্য মাত্র। প্রয়োজনমত মুঘল

ইতিহাসকে ব্যবহার করাটাও একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঐ 'ভবানীর বরপুত্র' শিবাজীকে অঙ্কন করা নিজের মানস-কন্যা রোসিনারাকে সৃষ্টি করা।"[৫৪] অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার সুবিধা অসুবিধা এবং ত্রুটি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "আমাদের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কুহেলিকাময় সত্য কল্পনাজড়িত আকাশ-বাতাসের মধ্যে এই নিগূঢ় ঐক্যের সন্ধান একেবারেই মিলে না। ইহাদের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অবাস্তব রকমের; ইতিহাস কেবল বাস্তবের কঠিন সত্য হইতে মুক্তিলাভের একটা উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে – কেবল অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা বাহুল্যের অবসর দিয়াছে মাত্র। ইহারা প্রকৃত ইতিহাসও নয় প্রকৃত উপন্যাসও নয়। আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস রচনা কোন কালে ছিল না, অতীত যুগের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন। অতীত যুগের মানুষের চিন্তা-ধারার বৈশিষ্ট্য, আমাদের সঙ্গে তাহাদের আচার-ব্যবহার আমোদ-প্রমোদের প্রভেদ ইত্যাদি বিষয়ের কোন প্রকার সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের ঐতিহাসিকদের নাই, ঔপন্যাসিকদের তো কথাই নাই। অতীতের মানুষ যে আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের জীব, আমাদের মত তাহাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত বাস্তব জীবন ছিল। তাহারা যে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া স্বপ্নময় জীবন অতিবাহিত করিত না আমাদেরই মত তাহাদের জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধী ভাবের আলোড়ন ছিল, তাহা আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সুতরাং অতীতের দিকে যাত্রা আমাদের পক্ষে একটি নিতান্ত স্বপ্ন প্রয়াণ বা অন্ধকারের মধ্যে লম্ফ প্রদানের মতই হইয়াছে। ইতিহাসের সহিত বাস্তব জীবনের একটা অন্তরঙ্গ মিলনের সংঘটন করাও ঔপন্যাসিকদের কলাকুশলতার অতীত ছিল। সুতরাং সব দিক দিয়াই ভূদেবের রচনা ব্যতীত এই প্রথম যুগের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে নিতান্ত-ই ব্যর্থ প্রয়াসের নিদর্শন বলিয়া ধরিতে হইবে"।[৫৫]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি প্রথমে রমেশচন্দ্র দত্ত ও পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। রমেশচন্ত্র দত্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন বিশেষ করে শিবাজীর পার্বত্য-যুদ্ধ বর্ণনা ও জয়সিংহের নিকট তাঁর উচ্ছ্বসিত স্বদেশের প্রেমের আবেদনের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও এর কিঞ্চিৎ প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন ভূদেবের রামদাস স্বামীর অনুসরণে দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী, আবার রোসিনারার সঙ্গে আয়েষারও কিছু মিল রয়েছে। এই দুটি বিষয়ই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের প্রধান উপাদান।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় উনিশ শতকীয় ইতিহাসচেতনার মূল ধারার সূত্রপাত করেন বাংলা উপন্যাসে। ধর্মাবেগের সঙ্গে দেশপ্রেমের মিশ্রণে জাতীয়তাবাদের যে বোধ সৃষ্টি হল, সেখানে আত্মসন্ধান ও আত্ম-আবিষ্কারের একটা আধ্যাত্মিক

সূত্রও পেয়ে গেল উনিশ শতকের বাঙালি পাঠক। উপনিবেশিক সমাজ-বাস্তবতায় রেনেসাঁসের বোধসমূহ এই জটিল ও দ্বন্দ্বসঙ্কুল পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছিল। ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ নামকরণের মধ্যেও রয়ে গেছে উনিশ শতকী ইতিহাসচেতনার দ্ব্যর্থতাবোধক চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য।

Z_¨b‡‘k

১ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৯৯৭, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, পৃ. ৩১৯

২ প্রণব রঞ্জন ঘোষ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মনন ও সাহিত্য, ১৩৭৫, লেখাপড়া ১৮ বি শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, পৃ. ২২১

৩ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

৪ মুকুন্দ মুখোপাধ্যায়, "ভূদেব চরিত" (প্রথম ভাগ) ইন্ডিয়া প্রেস,চুঁচুড়া, পৃ. ১৬৯-১৭০

৫ P. R. Sen, Western Influence in Bengali Literature, 3rd Ed., ১৯৬৬, Academic Publishers, 11, Panchan Ghose Lane, Calcutta-9, Quoted- P. ১০৯, Bhudeb – Charit, P. ২২৯

৬ 'ভূদেব জীবনী', কাশীনাথ ভট্টাচার্য, ১৩১৮, চুঁচুড়া পৃ. ১৩-১৬

৭ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০

৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১

৯ দিলওয়ার হোসেন, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, ১৯৮৪,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯৩

১০ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০-৩২১

১১ ভূদেব-রচনাসম্ভার, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪, অগ্রহায়ণ, প্রকাশক : শ্রী প্রদোষ কুমার পাল, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কে. পি. রায় রোড, ২৪, পরগনা, পৃ. ২৫৮

১২ ভূদেব-রচনাসম্ভার, 'স্বফল স্বপ্ন', পৃ. ২৬১-২৬২

১৩ 'স্বফল স্বপ্ন', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬

১৪ 'স্বফল স্বপ্ন', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭

১৫ V. D. Mahajan, The Sultanate of Delhi, 1963, New Delhi, India

১৬ 'স্বফল স্বপ্ন', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮

১৭ 'স্বফল স্বপ্ন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

১৮ The Romance of History, India, Vol. 3, ১৮৩৬, Preface, P. vii

১৯ ভূদেব-রচনাসম্ভার, 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩১

২০ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,১৯৮৯, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৩

২১ 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

২২ Short History of Aurangzib, Sir Jadunath Sarkar (3rd ed.), Orient longman Ltd. India P. ৪৩৮

২৩ 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

২৪ 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

২৫ শেখ হবিবর রহমান, আলমগীর, ১৯৮৮, প্রকাশনা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ২৫২

২৬ Dr. Sadiq Ali, A Vindication of Aurangzib, Kapurtliala,Punjab, p.130

২৭ ভূদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

২৮ ভূদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১

২৯ ভূদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১

৩০ ভূদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২

৩১ ভূদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

৩২ ভূদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

৩৩ শেখ হবিবর রহমান, 'আলমগীর', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫

৩৪ R. C. Majumdar, H. C. Roy Choudhuri and Kalik Datta, An Advanced History, India, Fourth Edition With or Appendix on Bangladesh, P. ৪৮৯

৩৫ এ. কে. এম. আবদুল আলীম, ভারতে মুসলিম রাজত্বে ইতিহাস, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ২৭৬

৩৬ Islamic Review (April – May 1925, P. 125)

৩৭ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ. ২

৩৮ ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৭

৩৯ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', ভূদেব রচনা সম্ভার, পৃ. ৩১৪

৪০ 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', পূর্বোক্ত, ৩১৪

৪১ 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', পূর্বোক্ত, ৩০৭

৪২ 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', পূর্বোক্ত, ৩০৭।

৪৩ R. C. Majumdar, H. C. Roy Chaudhuri and Kaliken Datta, An Advanced History at India, P. 501

৪৪ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ. ১২

৪৫ বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫

৪৬ Raksa Misra, Women in Mughal India (1526-17. A. D) 1st Edn., 1967 (Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy) 1963, Munskiram Monohar, 10 B, Netaji Subhash Marg, Delhi- 6, P. 37-39

৪৭ Niccolao Manucci (Venetion), Storia Do Mogor or Mogul India (1553-1708). William Irvine, Vol. 1, London, John Murray Albemarle Street Pub. for the Gat. as India, 1906, P. 179

৪৮ Ibid, P. 227

৪৯ Stanly Lane Poole, Aurangzib (And the Decay of the Mughal Empire) 2nd Edn., Reph Quoted from Rulers of India, edt. by Sir Wilson Hunter, P. 21

৫০ 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', পূর্বোক্ত, ৩০২

৫১ বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩৬৯, কলিকাতা, পৃ. ৪৭

৫২ শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা,কলিকাতা, পৃ. ৩২

৫৩ দিলওয়ার হোসেন, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, পৃ.

৫৪ বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

৫৫ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭, ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq Aa¨vq

i‡gkP› ‘ ‘‡Ëi BwZnvm‡PZbv

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ্বে ইতিহাস-আশ্রয়ী রোমান্সমূলক রচনাধারায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সক্রিয় আরেক প্রতিভা রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৮৪৮ সালের ১৩ আগস্ট বিখ্যাত রামবাগান দত্ত

পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম। ঈশানচন্দ্র দত্ত রমেশচন্দ্রের পিতা। পারিবারিক জীবনে রমেশচন্দ্র সৌভাগ্যবান ছিলেন। পিতা ডেপুটি কালেক্টর, পিতৃব্য সরকারী চাকুরী করতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবেশের দ্বার এই পরিবারে সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। এই পরিবারের সবাই যেমন সাহিত্যচর্চার প্রতি অনুরাগী ছিলেন তেমনি ইতিহাসচর্চার প্রতিও ছিল প্রবল আগ্রহ। এই পরিবারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন– রাজনারায়ণ দত্ত, শশিচন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র দত্ত এবং উমেশচন্দ্র দত্ত। ১৮৬৪ সালে রমেশচন্দ্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন। তারপর রাজস্ব-সচিব পদে নিযুক্ত হন। সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকেও তিনি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়াও ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাচীন হিন্দুধর্মের ইতিহাস, ধর্ম ও সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' যথাক্রমে ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই চারটি উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে অভিহিত করা হয়।

'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের কাহিনীকাল ১৫৮০ সাল। অর্থাৎ আকবরের শাসনামল এবং ঐতিহাসিক অংশের নায়ক রাজ টোডরমল। ঘটনার স্থান বাংলাদেশ। আবার মাধবীকঙ্কণের সময়কাল ১৬৫৪ সাল সম্রাট শাহজাহানের সময়। নায়ক-নায়িকা বাঙালি হলেও ঘটনার ক্ষেত্র দিল্লি ও আগ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। একইভাবে 'জীবন-সন্ধ্যা'র ঘটনাকাল ১৫৭৬। প্রধান ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্রাট আকবর ও রানা প্রতাপ সিং। 'জীবন-প্রভাতে'র ঘটনাকাল ১৬৬৩ সাল। আওরঙ্গজেব ও শিবাজী প্রধান ব্যক্তিত্ব। 'জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাসের সময়কাল ১৫৭৬ সালকে শুরু ধরলে ১৬৩৩ সাল পর্যন্ত এই একশত বৎসরের মুঘল ইতিহাসের নানা বৈচিত্রপূর্ণ অধ্যায় তিনি তাঁর উল্লিখিত চারটি গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এই জন্য তিনি এই চারটি উপন্যাসকে শতবর্ষ নাম দিয়ে ১৮৭৯ সালে প্রকাশ করেছিলেন।[১] এই উপন্যাসসমূহ লেখার প্রয়োজনে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পর্যটন করেছেন এবং তাঁর প্রিয় লেখকদের গ্রন্থও পাঠ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লেখেছেন–

Sir Walter Scott was my favourite author forty year ago. I spent days and night over his novels; I almost level in those historic seenes and in those mediaeval times which the great enchanter had conjured up ..... I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste for history made me an adminer of Scott; but no subject, not even poetry, had such a told upon me as history."[২]

Sir Walter Scott পাঠ করেই যে তিনি ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন, উল্লিখিত স্বীকারোক্তি তার প্রমাণ। এছাড়া Charles Stewart এর History of Bengal ও Gibbon এর Romance Empire পাঠ করেও তিনি অনুপ্রাণিত হন। Scott এর উপন্যাসে একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্যের সমন্বয় ঘটেছিল। যা পাঠ করে তাঁর মধ্যে ইতিহাসপ্রিয়তার জন্ম নেয়। তবে তিনি কখনও ভাবেন নি যে তিনি Scott এর আদর্শে বাংলায় উপন্যাস রচনা করবেন। এই অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেন বঙ্গিমচন্দ্রের কাছ থেকে। তাঁর ভাষায় "একদিন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমার কথা হইল আমি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলির প্রসংশা করিলাম তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিম বাবু জিজ্ঞাস করিলেন, যদি বাংলা পুস্তকে তোমার এতো ভক্তি ও ভালোবাসা, তবে তুমি বাংলা লিখনা কেন? আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম- আমি যে বাংলা লিখা কিছুই জানিনা। ইংরেজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি। ভালো করিয়া বাংলা শিখি নাই; কখনও বাংলা রচনা পদ্ধতি জানিনা। গম্ভীরভাবে বঙ্কিম বাবু উত্তর করিলেন, রচনা পদ্ধতি আবার কি, তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।" এই মহৎ কথা আমার মনে জাগরিত রহিল। তাহার ৩ বৎসর পর আমার বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশ করিলাম।[৩] স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, তিনি বঙ্কিম চন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে 'দুর্গেশ-নন্দিনী' ও 'মৃণালিনী'র প্রভাব বেশী ছিল। এ সম্পর্কে শ্রী প্রমথনাথ বিশী 'রমেশ-রচনাসম্ভারে'র সম্পাদকীয় ভূমিকায় লিখেছেন: 'তিনি এই সময়ে দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীতে ওতপ্রোত হইয়া ছিলেন। এ দু'খানি রচিত না হইলে 'বঙ্গবিজেতা' রচিত হইতে পারিত না।'[৪]

রমেশচন্দ্র ছয়টি উপন্যাস লিখেছেন তার মধ্যে 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ',' জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' এই চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ' পুরোপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস না হলেও 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাস দু'টি ছিল প্রকৃতপক্ষে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত রূপ কোনটি যে সম্পর্কে একটি অসাধারণ ধারণা দিয়েছেন প্রমথনাথ বিশী তাঁর সম্পাদকীয় ভূমিকায়– "ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে কোন্ শ্রেণীর রচনা বোঝায় তাহার সংজ্ঞা নির্ণয় সহজ নহে। তবে দু'টি মুল বিষয় মনে রাখিলেই কাজ চলিতে পারে। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ পর্বের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নায়ক করিয়া গল্প রচনা করা যাইতে পারে, আবার ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে অন্তরালে বা গৌণ রাখিয়া কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াও গল্প রচনা করা চলে, তবে দেখিতে হইবে যে, গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট পর্বের

সত্য ইতিহাসের সীমানাকে অতিক্রম করিয়া না যায়। ...... ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র চিত্রণে লেখক অনেকটা হাত-পা-বাঁধা, কিন্তু সাধারণ লোকের চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অনেকটা স্বাধীন। কিন্তু তাঁহাকে সর্বদা মনে রাখিতে হয়, সেই পর্বের সত্যকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না।"[৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক রোমান্সমূলক রচনাধারা প্রবর্তিত হয়, যা পরোক্ষভাবে হিন্দু পুনর্জাগরণের চেতনাবাহী হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারার উপন্যাস রচনা করেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে; যেমন হিন্দুদের শক্তি, শৌর্য-বীর্য ও বাহুবল প্রদর্শন এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরণ। রমেশচন্দ্র দত্তও একইভাবে এই কাজটি করেছেন কখনও হিন্দু রাজার সাহস দক্ষতা, রণকৌশল এবং নৈপুণ্য প্রদর্শন দ্বারা আবার কখনও মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজপুত জাতির বীর-বিক্রমপূর্ণ মরণপণ সংগ্রাম রচনার মাধ্যমে।

æGrant Duff এর মারাঠা জাতির ইতিহাস এবং Colonel Tod এর রাজস্থানের ইতিহাস পাঠে অনুপ্রাণিত হয়েই রমেশচন্দ্র জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক কাহিনীরূপ মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত এবং রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা রচনা করেন।"[৬] 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ' রচনায় অনুপ্রাণিত হন Charles Stewart-এর History of Bengal পাঠ করে। স্বদেশের ইতিহাস চর্চা করে তার মনে নতুন আগ্রহ ও আবেগ জাগ্রত হয়। তিনি লিখেছেন– "দক্ষিণ শাহবাজপুরের জলপ্লাবনান্তে যখন আমি তথায় গিয়া প্রান্তরে পট্টবাস স্থাপন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম, সে সময়ে আমি প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে একাকী গ্রান্ট ডফকৃত সঞ্জীবনী সুধাপূর্বক মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস পাঠ করিতাম এবং অনেক সময় এইরূপও ঘটিত যে, শিবাজীর কোন চরিত্র কাহিনী চিন্তা করিতে করিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। আমি যখন ত্রিপুরা অঞ্চলে ভ্রমণ করি, তখন টড্ প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসখানা সততই আমার কাছে থাকিত। এই সময়ে আমি প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলাম।"[৭]

e½e‡RZv

'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটি সম্রাট আকবরের শাসনামলের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে সম্রাট আকবর বাংলা জয় করেন। বাংলার বার ভূঁইয়া ও আফগান সরদারদের প্রতিরোধের মুখে বাংলায় আধিপত্য বিস্তার সম্ভব ছিল না। ঠিক এই সময়ে সম্রাট আকবর মুনিম

খান ও পরে রাজা টোডরমলকে বঙ্গদেশে পাঠান তাদের দমনের উদ্দেশ্যে। বঙ্গবিজেতার কাহিনীর বিন্যাস ঘটানো হয়েছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের কাহিনীকাল ১৫৮০ সাল। ঐতিহাসিক অংশের নায়ক টোডরমল ও স্থান বঙ্গদেশ। লেখক উপন্যাসের শুরুতেই তাঁর উপন্যাসটি কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা তা উল্লেখ করেছেন। "১৫৮০ সালে আকবর কর্তৃক টোডরমল সেনাপতি ও শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন। কি প্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীরপুরষ তৃতীয়বার বঙ্গদেশ জয় ও দুই বৎসরকাল বঙ্গবিহার, উড়িষ্যাদেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে। এই আখ্যায়িকায় ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের কথা লিখিত হইবে, সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, জমিদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগলদের মধ্যে কি প্রকারে সম্বন্ধ ছিল সংক্ষেপে বিবৃত হইল।"[৮]

১৫৭৪-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলার বিদ্রোহী শাসক দাউদ খানকে দমনের জন্য আকবরের প্রেরিত সেনাপতি মুনিম খাঁ ও টোডরমল কিভাবে তাকে প্রথম ও দ্বিতীয়বার দমন করে বঙ্গদেশ মুঘলদের অধীনে এনেছিলেন তারও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন প্রথম পরিচ্ছেদে। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজীর হাতে বঙ্গদেশের হিন্দুদের পরাজয় পরবর্তী সময়ে ১৩৮৫ সালে কংসরাজার বাংলার অধিপতি হয়ে সাত বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করা ও তাঁর ছেলে যদু পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে বঙ্গ শাসন করেছেন তারও উল্লেখ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে আছে। উল্লেখ্য কংসরাজা ইতিহাসে রাজা গনেশ নামে অধিক পরিচিত এবং তাঁর সময়কাল ছিল ১৪১৪-১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ ।

বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে একাধিক কাহিনী উপকাহিনীর সমাবেশ যেমন ঘটেছে তেমনি ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক নানা ধরনের চরিত্রেরও অর্বিভাব ঘটেছে। তবে বঙ্গবিজেতার ঐতিহাসিক ভিত্তি একেবারে দুর্বল নয়। বঙ্গদেশ মুঘল কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার প্রথম সাত বছরের ঐতিহাসিক পটভূমি এতে বর্ণিত হয়েছে – যার নায়ক রাজা টোডরমল।

কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু এইরূপ : বাংলার জমিদার ছিলেন সমরসিং। তাঁর দেওয়ান সতীশচন্দ্র ছিলেন স্বার্থান্বেষী। সতীশচন্দ্র গোপনে ষড়যন্ত্র করে বঙ্গের জমিদার সমরসিংহকে মুঘল বিদ্রোহী বলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মুঘলদের শত্রুতে পরিণত করেন এবং মুঘল সুবেদার মুনিম খাঁ তাঁর শিরচ্ছেদ করে। যদিও মুঘলদের বাংলা বিজয়ের সময় জমিদার সমরসিংহ মুঘলদের পক্ষে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। সতীশচন্দ্রের এই অন্যায় কর্ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন রাজা সমরসিংহের স্ত্রী মহাশ্বেতা দেবী। তিনি এই প্রাণঘাতী অন্যায় কর্মের উচিত শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্রতাবলম্বিনী হলেন; সংগে ছিল অনাথিনী কন্যা সরলা। ইচ্ছাপুরের জমিদার রাজা নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পুত্র

সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করে সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন। মহাশ্বেতা ও সরলার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন সেই সাথে শকুনির সকল প্রকার আক্রমণ হতে তাদের রক্ষা করলেন। শকুনি ছিলেন রাজা সতীশ চন্দ্রের পোষ্যপুত্র যার কুমন্ত্রণায় তিনি রাজা সমরসিংহের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী ও সরলার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে ইন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে এসে উপস্থিত হলেন। উদ্দেশ্য রাজা টোডরমলের বাহিনীতে যোগদান করে টোডরমলের মাধ্যমে সতীশ চন্দ্রকে শাস্তি প্রদান করা। ইন্দ্রনাথ এখানে সম্রাট আকবরের প্রতি অসাধারণ আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। বঙ্গদেশে পাঠানদের দমন করার পর, বাংলার জায়গীরদার ও মুঘল কর্মচারীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। বিদ্রাহীদের মধ্যে ছিল মাসুমী, অর্খান এবং হুমায়ূন। তিনি তাদের দমনে সহায়তা করেছেন মুঘলবাহিনীকে। তিনি বিদ্রোহীদের উদ্দেশে বলেছেন "বন্দি অবস্থায় 'বঙ্গদেশের অধীশ্বর সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর আকবরের জন্য আমি বিদ্রোহী জায়গীরদারদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি'। ইন্দ্রনাথ আরও বলেছেন আপনারা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছেন অস্বীকার করি না। কিন্তু সম্রাট আকবরের প্রতাপে আপনারা যে জয়লাভ করিয়াছেন, সেই সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহাচারণ করিতেছেন।' মাসুমী বলল সাহসী মুঘলরা জীবন থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইবে না। ইন্দ্রনাথ উত্তরে বলেছিলেন- পাঠানগণও এই কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে পাঠান রাজ্য কোথায়? দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে আপনারা বৃথা যুদ্ধ করিতেছেন"।[৯] ইন্দ্রনাথের এই উক্তির মাধ্যমে রমেশচন্দ্র মুঘল সম্রাট আকবরের শক্তি, প্রতাপ ও জনপ্রিয়তার সুনিপুন চিত্র অঙ্কন করেছেন।

কাহিনীর এক পর্যায়ে দেওয়ান সতীশচন্দ্রের কন্যা বিমলার আর্বিভাব ঘটে। বিমলা বুদ্ধিমতি শুভবুদ্ধির প্রতীক, পিতার পাপকার্যের জন্য তিনি দুঃখিত এবং এই কাজ তিনি শকুনির কুমন্ত্রণায় করেছেন। তাই শকুনির প্রতি তার ক্রোধের সীমা নাই। বিমলা এক সময় আবিষ্কার করে যে সে ইন্দ্রনাথকে ভালবাসে কিন্তু ইন্দ্রনাথ ভালবাসে সরলাকে। এই বিমলার কৌশলেই ইন্দ্রনাথ কারাগার হতে পলায়ন করতে সক্ষম হন। এপর্যায়ে কাহিনীর গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। সতীশচন্দ্র তাঁর পোষ্য পুত্র শকুনির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যে অন্যায় করেছেন তা প্রকাশ পায়। আর এই শকুনির হাতেই ছুরিবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান। টোডরমল ইন্দ্রনাথের অনুরোধে ইচ্ছাপুরে এলেন শকুনিকে শাস্তি দিতে। কিন্তু শকুনি নিজেই আত্মহত্যা করে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। ইন্দ্রনাথ তার ছদ্মনাম পরিত্যাগ করে সুরেন্দ্র হলে সরলার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বিমলা সুরেন্দ্রনাথকে না পাওয়ার বেদনায় মৃত্যুবরণ করে। বিমলাকে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সৎ স্বভাবের বাঙালি নারী চরিত্রের মহিমা দান করেছেন। আর অন্যান্য নারী চরিত্র অমলা কমলাও ঠিক তাই। এই কাহিনীর সংগে যুক্ত চরিত্রগুলি যেমন, বীর ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথসহ সব চরিত্রই কাল্পনিক। একমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্রটি হল রাজা টোডরমল, যার উপস্থিতি উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হতে।

'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে আকবরের মতো করে রাজা টোডরমলকেও অত্যন্ত গৌরবান্বিত করে চিত্রিত করা হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক তিনি। একজন আদর্শ পুরুষ। লেখক উপন্যাসে রাজা টোডরমলের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে-

"ক্ষত্রিয়কুলাবতংশ টোডরমল্লের মত সযমযঅগুণবিভূষিত বীর পুরুষ কখনও ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রত্নপ্রসবিনী ভারত ভূমিতে অনেক পূণ্যাত্মা ধর্ম্মপরায়ণব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে "অনেক বীর প্রসূত ক্ষত্রিয়কুলে অনেক সময়ে অনেক বীরপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এই তিনগুণেই বিভূষিত ছিলেন।"[১০] এইভাবেই তিনি রাজা টোডরমলের গুণকীর্তন করেছেন 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে। তবে ইতিহাসে রাজা টোডরমল একজন অভিজ্ঞ ও সফল রাজস্ব সংস্কারক হিসাবে খ্যাতিমান। 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে টোডরমলকে সেনাপতি ও বিজেতা হিসাবেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে ততটা প্রাণবন্ত করে চরিত্রটি উপস্থাপিত হয়নি যতখান তিনি ছিলেন। এক্ষেত্রে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "এমন কি কোন ঐতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষের পরিচিত মূর্তি হইতে একটা ক্ষীণ জীবনস্পন্দনের অনুরণন ও এই গ্রন্থবর্ণিত যুগের উপর সংক্রামিত হয় নাই। অবশ্য রাজা টোডরমল্লকে এই যুগের কেন্দ্রস্থ পুরুষ বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে; কিন্তু তিনিও বিশেষ জীবন্তভাবে চিত্রিত হন নাই এবং তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস ধারার উপর কোন বিশেষত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করতে পারেন নাই।"[১১]

তবে একটি বিষয় প্রশংসার দাবি রাখে যে, ঔপন্যাসিক 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে হিন্দুবীর সেনাপতি টোডরমলের মহত্ত্ব ও বীরত্ব প্রচারের ক্ষেত্রে কখনও মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করেননি বরং বিভিন্নভাবে তিনি সম্রাট আকবরের প্রশংসা করেছেন, যেমন- "আকবরশাহ হিন্দুদিগের পরম বন্ধু; হিন্দুদিগের উপর অন্যায়কর সমূহ উঠাইয়া দিয়াছেন; হিন্দুদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন; হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়াছেন; হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার কোন কোন অংশে অবলম্বন করিয়াছেন ও বঙ্গদেশে জাতিবিদ্বেষ রহিত করিবার জন্য হিন্দু সেনাপতি ও শাসনকর্তা প্রেরণ করিয়াছেন।"[১২] সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্ব সংস্কারের ভার সম্রাট আকবর রাজা টোডরমলের উপর ন্যস্ত করে তাঁকে দেওয়ান-ই-আশরাফ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সম্রাটের প্রতি টোডরমলের ভক্তি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল অত্যন্ত গভীর।

চালর্স স্টুয়ার্টের History of Bengal গ্রন্থের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। স্টুয়াটের মত করেই তিনি 'বঙ্গবিজেতা'-য় টোডরমলের ঐতিহাসিক চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন। স্টুয়ার্ট লিখেছেন, "আকবর মুঘল অফিসারদের মধ্যে টোডরমল ব্যতীত আর কারো উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। বঙ্গের বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তাঁকেই যোগ্য ব্যক্তি মনে করে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। বিচক্ষণ বাদশা আকবর যথার্থই বুঝেছিলেন, হিন্দুদের উপর রাজা টোডরমলের অসাধারণ দখল। সুতরাং তাদের দমনে তিনি যোগ্য ব্যক্তি।" স্টুয়ার্টের ভাষায়, "The political conduct of Akbar in employing the Hindo chiefs was attended with the most salutary effects. They were always accompanied by a large body either of their own clan, or of Rajpoots (the military trible), who not only served to support the Moghul, Aroops, now unadequate to retain in subjection so extended an empire. But was alsos useful as cheeck upon the latter, when refractory or dissatisfied."[১৩] যে পরিস্থিতিতে সম্রাট আকবর টোডরমলকে বঙ্গে প্রেরণ করেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে আকবর বাংলা জয় করেন। কিন্তু আফগান পাঠান ও বারভূইয়াদের ব্যাপক বাধার সম্মুখে তিনি বাংলায় পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার ঘটাতে পারেননি। তাদের দমনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসককে নিয়োজিত করেছেন। তারা কখনও সফল হয়েছেন কখনও বা ব্যর্থ হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ১৫৮০ সালের ১৯শে জানুয়ারি একদল মুঘল সৈন্য তানডা ত্যাগ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিহারেও বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তারা বঙ্গের বিদ্রোহীদের সাথে মিলিত হয়। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য বাংলার সুবাদার মুজাফ্ফর খান এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু বিদ্রোহী বাহিনী রাজধানী তানডা অবরোধ করে এবং তাদের হাতে সুবাদার মুজাফ্ফর খান নিহত হন। বঙ্গ ও বিহার বিদ্রোহীদের দখলে আসে এবং তার বাবা কাকশালকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করেন।

মাসুম খান কাবুলি বাবা কাকশালের অভিভাবক নিযুক্ত হলেন। সম্রাট আকবরের ভাই ও কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিমকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়। বিদ্রোহীদের এই সাফল্যে বঙ্গ ও বিহার মুঘল সাম্রাজ্য হতে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে বিদ্রোহীরা বেশিদিন তাদের সাফল্য ভোগ করতে পারেনি। শীঘ্রই মুঘল বাহিনী রাজা টোডরমল ও তরসুন খানের নেতৃত্বে বিহার পুনরাধিকার করেন এবং বাংলা মুঘল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৮০-১৫৮২ সাল পর্যন্ত রাজা টোডরমল বাংলার সুবাদার ছিলেন।[১৪]

সম্রাট আকবরের সময় নিম্নলিখিত সুবাদারগণ বাংলা শাসন করেন।[১৫] (সূত্র -আবদুল করিম – বাংলার ইতিহাস মুঘল আমল)

১। মুনিম খান ১৫৭৪ – ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ

২। খান-ই-জাহান হুসাইন কুলি ১৫৭৫-৭৮ খ্রিস্টাব্দ

৩। মুজাফ্ফর খান তুরবর্তী ১৫৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দ

৪। খান-আযম ১৫৮২ এপ্রিল হতে ১৫৮৩ মে পর্যন্ত

৫। শাহবাজ খান ১৫৮৩-১৫৮৬ খিস্টাব্দ

৬। উজির খান ১৫৮৬ – ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

৭। সাইদ খান ১৫৮৭ – ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ

৮। রাজা মানসিংহ ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা টোডরমলের বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করার সাথে সাথে তৎকালীন বাংলার জমিদারদের অন্তর্কলহ, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতির চিত্রও অঙ্কন করেছেন।[১৬] এই সময়ে বাংলায় বারভূইয়াদের অধিপত্য বিদ্যমান ছিল। এই বারভূইয়ারা ছিলেন বাংলার সামন্তরাজা বা ভূম্যধিকারী, ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী, এবং যুদ্ধ করে মুঘল পাঠানদের বাংলায় আধিপত্য বিস্তারে বাধা প্রদান করেছিলেন। উল্লেখ্য এই বারভূঁইয়াদের বাধার কারণেই সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুঘলরা বাংলায় আধিপত্য বিস্তার ঘটাতে পারেনি। সেই সময় বাংলা বারভূইয়ার মুলুক নামে বিখ্যাত ছিল। বারভূইয়া নাম ও সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে : 'প্রকৃতপক্ষে তাহারা যে সংখ্যায় এক সময়ে ঠিক বারজন ছিলেন, এমন বোধ হয় না। প্রধান একটা কারণ এই যে, বহুজনে বারভূইয়ার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু কেহই ঠিকভাবে বারজনের নাম দিতে পারেন নাই, প্রত্যেকেই কোন মতে ১২ সংখ্যা পূর্ণ করে দিয়াছেন কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। ধরে নেওয়া হয় বহু সংখ্যা বুঝাতেই বার সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে।'[১৭]

'আকবর নামা'য় আকবরের সময়কালের বাংলার বারভূইয়াদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। তবে তাঁদের জমিদারির উল্লেখ নেই। তাঁরা হলেন:

১। ইব্রাহীম নারাল

২। করিম দাস মুসাজাই

৩। ইশা খান মসনদ-ই-আলী

৪। মজলিশ দিলাওয়ার

৫। মজলিশ প্রতাপ

৬। টিলা গাজী

৭। কেদার রায়

৮। শর খান

৯। বাহাদুর গাজী

১০। চাঁদ গাজী

১১। সুলতান গাজী

১২। সেলিম গাজী

১৩। কাসিম গাজী

"ইহাদের কেহ কেহ মুঘল বশ্যতা স্বীকার করিলেও ইহাদের অধিকাংশই ঘোরতর মুঘল বিদ্বেষী ছিলেন।[১৮] অপেক্ষাকৃত দুর্বল জমিদারগণ আত্মরক্ষার জন্য কখনও পাঠান আবার কখনও মুঘলদের পক্ষে যোগ দিতেন। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসের সমরসিংহ মুঘলদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। সমর সিংহ সতীশচন্দ্রের ঘটনার ঐতিহাসিক সততা আছে বলে তথ্য প্রকাশ করেছেন লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র তার, 'যশোর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে। তাঁর বর্ণনা মতে সমর সিংহের প্রকৃত নাম ছিল কাশীনাথ রায়। বর্তমানে নদীয়া যশোর ২৪ পরগনার সংযোগস্থলে। তৎকালে কুশদ্বীপ বা কুশদহ পরগনায় তাঁর অধিকার ছিল। যশ-খ্যাতি গৌরবে এই কুশদ্বীপ এককালে নবদ্বীপের সংগে প্রতিদ্বন্দিতা করত। কথিত আছে দাউদ খাঁর সংগে মুঘলদের সংঘর্ষের সময় কাশিনাথ মুঘলদের পক্ষে যোগদান করে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করলে তাঁকে রাজা সমরসিংহ উপাধি দেন। কাশীনাথ রায় রাজা সমরসিংহ উপাধি ধারণ করে জলেশ্বরে চতুর্বেষ্টিত দুর্গ বা চৌবেরিয়া দুর্গ নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। ১৫৭৭-৭৮ খ্রিষ্টাব্দে হোসেন কুলির সময়ে রাজা সমরসিংহ তাঁর দেওয়ান সতীশচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।[১৯] তাহলে দেখা যায় যে, 'বঙ্গবিজেতার সমরসিংহ সতীশচন্দ্রের ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য। তবুও 'বঙ্গবিজেতা' সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেনি। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে, "জীবনের বেগবান স্পন্দন ইহার মধ্যে নাই; মানবের সাধারণ জীবন ও মানব-মনের গূঢ় রসধারার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই।"[২০]

'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের শিল্পমূল্য ও ঐতিহাসিক ভিত্তি যাই হোক না কেন তিনি নিজে একজন ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের প্রতি তার নিষ্ঠা ও প্রবল একাগ্রতার কোন ঘাটতি যে ছিল না তা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

প্রশ্ন হতে পারে কেন তিনি এই সময়কালকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন। মুঘলদের মধ্যে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় ছিল সম্রাট আকবরের শাসনকালে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় এই শাসক শক্তি ও দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। যাদের সহায়তায় এটি সম্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম সেনাপতিদের অসামান্য অবদান ছিল তেমনি একজন হিন্দু সেনাপতি ছিলেন রাজা টোডর মল – যিনি একাধারে সেনাপতি ও ভূমিরাজস্ব সংস্কারক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সর্বগুণে গুণান্বিত ও ক্ষত্রিয়কুলাবতংশকে উপন্যাসের নায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন হিন্দুদের জয়গান করা ও তাদের হিন্দু জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

gvaex K¼Y

রমেশচন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ'। এই উপন্যাসটিও মুঘল ইতিহাস- সংবলিত প্রথম উপন্যাসের মত। তবে এটির মূল ঐতিহাসিক পটভূমি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষ দিকে চারপুত্রের মধ্যে দিল্লির সিংহাসনকে কেন্দ্র করে যে উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্ব শুরু হয় সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী। এই ঐতিহাসিক কাহিনীর পাশাপাশি উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে হেমলতা ও নরেন্দ্রনাথের প্রেমকাহিনী ও মুঘলদের শৌর্যবীর্য ও স্থাপত্যকলার মনোরম বর্ণনা।

উপন্যাসের নায়ক নরেন্দ্রনাথ যিনি বিচার প্রার্থনায় উপস্থিত হয়েছেন শাহ সুজার রাজমহলে, যেন তিনি তার পৈত্রিক জমিদারী ফিরে পান, যা তার বাবার বন্ধু নবকুমার কর্তৃক অধিকৃত হয়ে আছে। জমিদারী পুনরুদ্ধার এবং নবকুমারের কন্যা হেমলতাকে ফিরে পাবার বাসনা নিয়ে তিনি গৃহত্যাগী হন এবং রাজনৈতিক জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। সুবিচার পাবার আশায় তিনি তৎকালীন বাংলার সুবেদার সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজার দরবারে উপস্থিত হলে সুবিচারের পরিবর্তে তাকে সুজার দলভূক্ত সৈনিক হতে হলো এবং পরবর্তীতে নরেন্দ্র ভ্রাতৃবিরোধের মর্মান্তিক ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং পরিণতিতে ছিন্নমূল অবস্থায় দিল্লি-আগ্রা-রাজস্থান ঘুরে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করার পর সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করে কালাতিপাত করতে থাকে। উপন্যাসটিতে পারিবারিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার পাশাপাশি মুঘলদের শিল্পকলা ও স্থাপত্যশৈলীর মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। যেমন- সুজার

রাজসিংহাসনের বর্ণনায় বলেছেন "সুন্দর রৌপ্য ও স্বর্ণখচিত সিহাসনে সুবাদার বসিয়াছে, রাজবেশ সে সুন্দর অবয়বে বড় সুন্দর শোভা পাইয়াছে। চারিদিকে অমাত্য ও বড় বড় আফগান ও মঘল যোদ্ধাগণ শির নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও বহুবিধ লোকে সেই বিস্তীর্ণ বিচারপ্রাসাদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রস্তরনির্ম্মিত সারি সারি স্তম্ভের উপর চারু খচিত ছাদ শোভা পাইতেছে, ও সিংহাসনের দুইদিকে পরিচারক চামর দুলাইতেছে।"[২১]

রমেশচন্দ্র দত্তের "মাধবীকঙ্কনে"র ঐতিহাসিক উপজীব্য সম্রাট শাহজাহানের চারপুত্র- দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদের উত্তরাধিকার যুদ্ধ, যা ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন উত্তরাধিকারযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের আলোকে। তবে রোমান্স ও রহস্য সৃষ্টির জন্য কিছু কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যেমন, জোলেখা, সৈনিক গজপতি সিংহ প্রভৃতি। তবে কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রয়েছে।

১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হলে এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। সম্রাট সুস্থ হওয়ার পরও নিজ ক্ষমতা না নিয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে রাজ্য শাসন করতে দিলে এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব আরও তীব্র আকার ধারণ করে। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত 'মাধবী কঙ্কণ' উপন্যাসের নবম অধ্যায়ে এই ঘটনাটির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে-
"১৬৫৭ খৃ: অব্দে আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে এক দিন ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রা নগরে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আগ্রার রাজদ্বার লোকে সমাকীর্ণ; সমস্ত নগরবাসী ভীত ও শশব্যস্ত; বাজার দোকান সমস্ত বন্ধ, ওমরাহ, মনসবদার, রাজপুত্র, মোগল, পাঠান সকলেই অস্থিরচিত্ত ও চিন্তাবিহবল। কার্য্যকর্ম্ম বন্ধ হইল, সকেলই ভীত ও উৎসুক। সম্রাট্ শাজিহান কয়েকদিন অবধি পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন; আজি সংবাদ রটনা হইল যে, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

মিথ্যা সংবাদ শ্রীগ্রই সমুদয় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইল। বঙ্গদেশ হইতে সুজা, দক্ষিণ হইতে আরংজীব, গুজরাট হইতে মোরাদ, রণ সজ্জায় বহিস্কৃত হইলেন। পিতৃবিয়োগে সকলেই সিংহাসনারোহণে লোলুপ হইলেন। পরে যখন প্রকৃত সংবাদ জানা গেল যে, শাজিহান জীবিত আছেন, তখনও রাজপুত্রগণ রণোদ্যম হইতে নিরস্ত হইলেন না। তাহার প্রধান এক কারণ এই যে, ইতিপূর্ব্বে কয়েক মাস হইতে সম্রাট পীড়াবশত: রাজকার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা এই অবসরে সমস্ত রাজকার্য্য আপনিই করিতে লাগিলেন, কোন বিষয়ে পিতার মত লইতেন না, জন্মের মত পিতাকে রুদ্ধ রাখিয়া আপনি রাজকার্য্য করিবেন এইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শঙ্কা

করিয়াছিল যে, বিষ প্রয়োগ দ্বারা যুবরাজ আপন সিংহাসনের পথ নিষ্কন্টক করিবেন। দারার ভ্রাতৃগণ পিতার শাসনে সম্মত ছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতার শাসনে সম্মত হইলেন না, এই জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে যুদ্ধানল প্রজ্জলিত হইল।"[২২]

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস যাঁর রাজত্বকালকে (সম্রাট শাহজাহান) ঐতিহাসিকগণ মুঘল-যুগের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন তাঁরই রাজত্বকালের শেষের দিকে উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্ব মুঘল তথা সমগ্র মুসলিম ভারতের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় ইতিহাস সংযোজন করেছে। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট শাহজাহান গুরুতর পীড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর মৃত্যু আশংকায় চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদ ও সংঘর্ষ এক করুণ কাহিনীর জন্ম দেয়। এই যুদ্ধে আওরঙ্গজেব ছাড়া সবাই নিহত হয়।[২৩]

যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় লেখক যুদ্ধের সেই ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন- "১৬৫৭ খৃ: অব্দের শেষে বারানসীর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধক্ষেত্র শীতকালের সায়াংকালের আলোকে ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছিল। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও মনুষ্যের শবরাশিতে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও মৃতদেহ সমুদয় পড়িয়া যেন আকাশের নক্ষত্রের দিকে তীব্র দুষ্টি করিতেছে; কোথাও মুমূর্ষু অবস্থায় অঙ্গহীন সিপাহী ক্ষীণস্বরে 'জল জল' করিয়া চিৎকার করিতেছে; কোথাও দুই একজন সেনা নিজ নিজ ভ্রাতা বা বন্ধুর অনুসন্ধান করিতেছে; হায়! তাহাদের এ জগতে আর ফিরিয়া পাইবে না।"[২৪] চার ভাইয়ের সংঘর্ষের নানাবিধ কারণ ছিল। কারণগুলি নিচে উল্লেখ ও পর্যালোচনা করা হল:

সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর সঙ্গে সম্রাটের অন্য পুত্রদের বৈসম্পর্কের কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: (১) মুঘল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতি ছিল না। (২) ভাইদের প্রতি দারার রূঢ় আচরণ ও পুত্রদের প্রতি পিতা সম্রাট শাহজাহানের স্নেহের তারতম্য ও পুত্রদের চরিত্রগত পার্থক্য ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ ছিল।

দারাশিকো- জ্যেষ্ঠপুত্র দারা ছিলেন পিতার প্রিয়পাত্র। তাই তিনি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা হয়েও পিতার সাথে আগ্রাতে বেশি থাকতেন। তিনি সুশিক্ষিত ও মার্জিত রুচিজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। দাম্ভিক ও রুক্ষ মেজাজের জন্য দরবারের অনেকেই তাকে পছন্দ করতেন না। ধর্মীয় ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ছিলেন। অতিরিক্ত হিন্দুপ্রীতির কারণে তিনি সাম্রাজ্যের গোড়া মুসলমানদের বিরাগভাজন হন। সর্বদা পিতৃস্নেহের সুশীতল ছায়ায় থেকেও রাজনৈতিক দুরদর্শিতা, শাসনদক্ষতা, ও সামরিক পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেননি।

শাহসুজা – শাহসুজা ছিলেন সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র। বাংলার সুবাদার ছিলেন। তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিলাসপ্রবণতা ও কর্তব্য কর্মে শৈথিল্য তাঁর চরিত্রে লক্ষিত হয়েছিল- স্নেহ, মমতা প্রভৃতি মানবিক গুণও তাঁর ছিল। তবে অত্যাদিক মাদকাসক্তির কারণে অলস ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়েছিলেন।

আওরঙ্গজেব – তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্তা। পুত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ব্যক্তিত্ববান ও প্রতিভাসম্পন্ন। তাঁর সামরিক দক্ষতা, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল অসাধারণ। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল নির্মল ও নিস্কলুষ। ধর্মীয় মতবাদের দিক দিয়ে তিনি গোঁড়া সুন্নী ছিলেন এবং ইসলামের বিধি বিধানকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলতেন। এজন্য তিনি গোঁড়া মুসলমানদের কাছে যেমন প্রিয় ছিলেন হিন্দুদের কাছে ছিলেন তেমনি অপ্রিয়। যোগ্যতার দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে আওরঙ্গজেবই সিংহাসনের ন্যায্য দাবিদার ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ ছিল না।

মুরাদ – সম্রাট শাহজাহানের পুত্র মুরাদ বখ্শ ছিলেন গুজরাটের শাসনকর্তা। তিনি সাহসী বীর ও উদার হৃদয়ের লোক ছিলেন। অত্যধিক মদ্যপান ও ভোগ বিলাসের প্রতি আসক্ত থাকায় তিনি কর্মঠ ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারেননি। দুই মেয়ে জাহানারা ও রওশন আরা ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে বড় মেয়ে জাহানারা ছিলেন দারার পক্ষে ও রওশনারা ছিলেন আওরঙ্গজেবের পক্ষে।

১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টা করেন বাংলার সুবাদার শাহ সুজা। তিনি মনে করেন পিতার মৃত্যুর সংবাদ গোপন রেখে দারা রাজ্য শাসন করছে। তাই তিনি নিজকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কন করেন। আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হলে তিনি দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলায়মান শিকোহ কর্তৃক বারানসীর নিকট বাধাপ্রাপ্ত হন এবং বাহাদুর গড়ে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন ১৬৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

এদিকে গুজরাটের সুবাদার মুরাদ আহমেদাবাদে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলে, আওরঙ্গজেব কৌশলে মুরাদকে নিজদলভুক্ত করে নেন এবং উভয়ের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্য ভাগ করে নেওয়ার এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর উভয়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন। দুই ভাইয়ের সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী ধর্মাট নামক স্থানে উপস্থিত

হলে ১৬৫৮ সালে সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে যশোবন্ত সিংহ ও কাসিম খান তাঁদের বাধা প্রদান করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের যুদ্ধকৌশলের বিরুদ্ধে তারা সুবিধা করতে পারলেন না; যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের জয় হয়।

'মাধবী কঙ্কনে'র সপ্তদশ পরিচ্ছেদে উজ্জয়িনীর যুদ্ধ শিরোনামে এর উল্লেখ আছে। এখানে যশোবন্ত সিংহের পরাজয়ের কারণ হিসাবে লেখক কাসেম খানের ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলেছেন। তবে ইতিহাস বলে এই যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ ছিল যশোবন্ত সিংহের নিকৃষ্ট রণকৌশল ও যুদ্ধ পরিচালনায় অদক্ষতা। ধর্মাটের যুদ্ধে দারার বাহিনীকে পরাস্ত করে আওরঙ্গজব আগ্রার অনতিদূরে সামুগড়ের প্রান্তরে শিবির গড়লেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে দারা ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে সামুগড়ে আওরঙ্গজব ও মুরাদের মোকাবেলা করেন। উভয় পক্ষ তুমুল যুদ্ধ হয় ও যুদ্ধে রাজপুত্র নেতা রামসিংহ দারার পক্ষে যোগদান করেছিলেন। রাজপুত নেতা রামসিংহ, দারা, শিপির, শিকোহ, খলিলুল্লাহ খান ও রূস্তম খান প্রাণপনে লড়াই করেও যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে নাই।[২৫]

সামুগড়ের যুদ্ধে আওরঙ্গজেব জয়লাভ করলেন যা তার সামরিক কৃতিত্বের পরিচায়ক এবং তার সিংহাসন লাভের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

এই উপন্যাসের ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে শ্যামনগরের যুদ্ধ শিরোনামে উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে: "উজ্জয়িনীতে যশোবন্ত সিংহ পরাস্ত হইয়াছে শুনিয়া শাজিহানের জ্যৈষ্ঠপুত্র দারা যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক লক্ষের অধিক সেনা লইয়া স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিলেন.... আগ্রা হতে ৭/৮ ক্রোশ দূরে যমুনা তীরে শ্যামনগর নামক গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। ....শ্যামনগরের যুদ্ধের ফল ভারতবর্ষের সিংহাসন। উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন; .... দারার বামপার্শ্বে রাজপুত রাজা রামসিংহ ও ছত্তরশাল পুরষোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হইলেন; দারার দক্ষিণ দিকে কালীউল্লাহ নামক মুসলিম সেনাপতি বিদ্রোহী আওরঙ্গজেবের অর্থভুক, যুদ্ধে লিপ্ত হইল না। অবশেষে আওরঙ্গজেবের জয় হইল।[২৬]

পূর্বে উল্লেখিত খলিলুল্লাহ খানকে তিনি সম্ভবত কালীউল্লাহ নামে অভিহিত করেছেন যিনি দারার পক্ষেই যুদ্ধ করেছিলেন। সামুগড়ের যুদ্ধকে শ্যামনগরের যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক সামুগড়ের যুদ্ধে জয়লাভের পর পিতা শাহজাহানকে হেরেমে বন্দী করেন এবং ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন তিনি। আগ্রায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর মুরাদের সাথে তাঁর বিরোধ বাধলে প্রথমে মুরাদকে বন্দি করেন এবং পরে গুজরাটের দেওয়ান আলী নকীকে হত্যার দায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। অপরদিকে সুজা বশ্যতা স্বীকার না করায় আওরঙ্গজেব তাকে দমনের জন্য মীর জুমলাকে পাঠান। সুজা মীরজুমলার নিকট পরাজিত হয়ে আরাকানের দিকে পলায়ণ করেন। ধারণা করা হয়, তিনি আরাকানি মগদের হাতে নিহত হন।

বাংলার সুবাদার সুজার প্রতি লেখক খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি লিখেছেন "যিনি বিংশতি বৎসর বঙ্গদেশে সুশাসন করিয়াছিলেন, যিনি যুদ্ধে সাহস, শাসনে দয়া ও হিন্দুদিগের প্রতি বদান্যতার জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন, যাঁহার রাজমহলের প্রাসাদ মর্ত্ত্যে ইন্দ্রপুরী ছিল ও দিবারাত্র আনন্দ লহরীতে ভাসিত, তিনি মৃত্যুকালে মস্তক রাখিবার স্থান পাইলেন না, বিদেশে শত্রুহস্তে সবংশে বিনষ্ট হইলেন।"[২৭]

সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হবার পর দারা পলায়নকালে আওরঙ্গজেব কর্তৃক ধৃত হন এবং ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করার অপরাধে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট তাকে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে দারাকে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। দারার পরাজয়ের পর তার পুত্র সোলায়মান শিকোহ গাড়োয়াল পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলে সেখানে তাকে বন্দি করা হয় এবং পরবর্তীতে তাকে সোয়ালিয়রে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে 'পোস্ত' নামক বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। এভাবে সমস্ত শত্রু মুক্ত হয়ে এবং পিতাকে বন্দী করে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে জুলাই আলমগীর বাদশাহ গাজী উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।[২৮]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের এভাবে সিংহাসনে অধিবেশন অনেক ঐতিহাসিক সমালোচনা করেছেন। তবে আমরা যে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করছি অর্থাৎ মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তখন ক্ষমতা গ্রহণের রীতিই ছিল – জোর যার মুল্লুক তার নীতিতে। কারণ তখন সিংহাসন লাভের কোন সুষ্ঠু নীতি ছিল না। সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার পরের ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ছিল অনিবার্য। তার কারণ কোন ভাই আপোষের জন্য ছিল না।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর মাধবীকঙ্কণ উপন্যাসে চার ভাইয়ের যে চারিত্রিক বর্ণনা দিয়েছেন তা ইতিহাস সম্মত। যেমন- সূজা: "রাজা কহিলেন, অদ্যকার যুদ্ধের কথা বলিতেছেন? যুদ্ধ কোথায়? বঙ্গদেশের সেনার সহিত যুদ্ধই কি যুদ্ধ?

সুলতান সুজাও বঙ্গদেশে থাকিয়া বিলাসপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ"! কিন্তু অদ্য যুদ্ধের সময় সুলতান কি সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করেন নাই?

রাজা: "তাহা স্বীকার করে যুদ্ধের সময় তিনি সাহসের পরিচয় দেন, কার্যে কার্যের সময় বিলাস বিস্মৃত হয়েন। কিন্তু কেবল সাহসে কি হয়, রণকৌশল জানেন না"।

সুজা সম্পর্কে আরো উল্লেখ আছে-

"তিনি যুদ্ধে যেরূপ বিক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন অন্যসময়ে সেইরূপ ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার দয়া ন্যায়পরায়ণ দেখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে কি জমিদার কি জাগীরদার সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত; ও কথিত আছে তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহার জন্য খেদ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার উদার স্বভাব দুই একটি দোষে কলঙ্কিত ছিল, যুদ্ধের সময় তিনি যেরূপ সাহসী ছিলেন, অন্য সময়ে তিনি সেইরূপ ছিলেন বিলাসী।"[২৯]

আওরঙ্গজেব:- "দেবের সম্রাট পুত্রদিগের মধ্যে কাহার অধিক রণকৌশল আছে? আপনি আরঙ্গজীবকে কি মনে করেন?"

"রাজা। উ: তাঁহার নাম করিবেন না, সেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আমি দেখি নাই, যেরূপ বীরত্ব সেইরূপ কৌশল। শুনিয়াছি তাহার গতিরোধ করিবার জন্য রাজা যশোবন্তসিংহ নর্ম্মদাতীরে যাইতেছেন। যশোবন্ত সিংহ রানার জামাতা ও সেইরূপ যোদ্ধা ও বিক্রমশালী কিন্তু আরংজীবের সহিত যুদ্ধে কি হয় জানি না। যশোবন্তের সাহস আছে, কৌশল নাই। আমার বোধ হয় এই ভ্রাতৃবিরোধে অবশেষে আরঙ্গজীবেরই জয় হইবে।"[৩০]

মুরাদ: "মোরাদের প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, বীর আকৃতি, অকপট হৃদয়।"[৩১]

আবার মুরাদ যে খাদ্যপান ও ভোগ বিলাস পছন্দ করতো তাও নিম্নোক্ত উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।" ভোজন সাঙ্গ হইল, ভৃত্যেরা ফল ও মদিরা লাইয়া আসিল। গায়কীগণ পুনরায় সপ্তস্বরে গান আরম্ভ করিল, শিবির আমোদতি হইল। কেশের হীরকের সহিত কটাক্ষ দৃষ্টির জ্যোতি মিশিয়া যাইতে লাগিল, সুললিত গানের সহিত সুমিষ্ঠ হাস্যধ্বনি মিশিয়া যাইতে লাগিল, মোরাদ একেবারে বিমোহিত হইলেন।"[৩২]

দারা: দারার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সেইভাবে তুলে ধরা হয়নি। তবে ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত তিনি করেছিলেন তার কিছুটা বর্ণনা এই উপন্যাসে বর্ণিত আছে। "কয়েক মাস হইতে সম্রাট পীড়াবশতঃ রাজকার্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা এই অবসরে সমস্ত রাজকার্য আপনিই করিতে লাগিলেন, কোন বিষযে পিতার মত লাইতেন না, জন্মের মত পিতাকে রুদ্ধ রাখিয়া আপনি রাজ কার্য্য করিবেন এইরূপ আচরণ করতে লাগিলেন। কেহ কেহ শঙ্কা করিয়াছিল যে, বিষপ্রয়োগ দ্বারা যুবরাজ আপন সিংহাসনের পথ নিস্কন্টক করিবেন। দারা ভ্রাতৃগণ পিতার শাসনে সম্মত ছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনে সম্মত হইলেন না, এই জন্য সমগ্র ভারত বর্ষে যুদ্ধানল প্রজ্জলিত হইল।"[৩৩]

সম্রাট শাহজাহনের পুত্রদের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে রাজপুত্র রাজা জয়সিংহের কোন অংশগ্রহণ ছিল না। তবে ঔপন্যাসিক ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণে রাজপুত জাতির অবদান বর্ণনা করার জন্য যশোবন্ত সিংহের সাথে জয় সিংহের আগমন ঘটিয়েছেন। একটি প্রকাণ্ড শিবিরের অভ্যন্তরে দুইজন মহাবীর বসিয়া কথোপকথোন করিতে ছিলেন। একজন রাজপুত্র রাজা জয়সিংহ অপরজন তাহার পরম সুহাত দেবের খাঁ জাতিতে পাঠান।

রাজার বয়ঃক্রম অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখন মুখমণ্ডল যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ শরীর যৌবনের বলে বলিষ্ঠ। সে সময়ে মোগল সম্রাটদিগের প্রধান সেনাপতি অধিকাংশই রাজপুত ছিলেন। রাজপুতদিগের বাহুবীর্য্যেই মোগলগণ সিন্দু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সমুদয় ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। যেখানে ঘোর বিপ্লব বা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত, সেই স্থানে প্রায়ই বিজয় লাভ করিয়া আসিতেন। আখ্যায়িকা বিবৃতিকালে রাজপুতানার রাজাদিগের মধ্যে দুইজন বিশেষ ক্ষমতাশীল ও প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, রাজা জয়সিংহ ও রাজা যশোবন্ত সিংহ। সম্রাট শাজিাহান উভয়কেই বিশ্বাস করিতেন ও বিপত্তির সময় ইহাদিগকেই রণে প্রেরণ করিতেন। সে সময়ে কি পাঠান, কি মোগল কোন সেনাপতিরই জমসিংহের ন্যায় প্রতাপ ক্ষমতা বা রণকৌশল ছিল না। তৎকালীন একজন বিচক্ষণ ও প্রসিদ্ধ ফরাসী ভারত বর্ষে অনকে দিন ছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াগিয়াছেন যে, জয়সিংহের মত কার্য্যদক্ষ লোক সে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে বোধ হয় আর কেহই ছিলেন না।"[৩৪]

মুঘলপক্ষপুষ্ট রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু সেনাপতিগণ দিল্লির সম্রাটদের প্রতি অসাধারণ অনুগত্য প্রদর্শনের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কন' উপন্যাসে। উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের জয় হলে,

জয়সিংহকে দারাকে পরিত্যাগ করবেন? দেরের খার এই প্রশ্নের উত্তরে জয়সিংহ বলেছেন "ইচ্ছামত কখোনই নহে, কিন্তু যুদ্ধে যদি অবশেষে আরংজীবের জয় হয় তাহা হইলে তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা দিল্লীর সম্রাটের অধীন, যিনি যখন সম্রাট হইবেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ রাজবিদ্রোহিতা।"[৩৫]

ঔপন্যাসিক বিভিন্নভাবে রাজপুত্রদের অসীম সাহস ও বীরত্বের বর্ণনা করেছেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে উজ্জয়িনীর যুদ্ধে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট যশোবন্ত সিংহ পরাজয় বরণ করলেও লেখক তাঁর অসীম সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। নানাভাবে তিনি রাজপুত্র জাতির অতীত বল-বীর্যের উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনের বর্ণনা করেছেন। যেমন- "রাজপুতনার পথে অগ্রসর হতে হতে নরেন্দ্রনাথ দেখলেন রাজপুত্র জাতি যুগে যুগে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেসব স্মৃতিচিহ্ন। চিতোর দুর্গের প্রতিরোধ ও সুরক্ষিত ব্যবস্থা, কুম্ভবাকার স্তম্ভ, পদ্মিনী রাজ্ঞীর প্রসাদ ও সরোবর ইত্যাদি।[৩৫.১] তিনি রাজপুত্র নারীর মানসিক বল ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। যশোবন্তসিংহের পরাজয়ের সংবাদ শুনে রাগে ক্ষোভে ও অভিমানে তার স্ত্রী বলেন- "সহচর, চিতা প্রস্তুত কর, আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইয়াছেন, তিনি স্বর্গধামে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আমি তথায় নাই; যশোবন্তের নামে যে আসিয়াছে সে প্রবঞ্চক।"[৩৬]

ঔপন্যাসিক সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে মুঘল স্থাপত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। "যমুনার অনন্ত সৌন্দর্য্য ও আগ্রা নগরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া কে না বিমোহিত হয়েছেন? সুদূরে শ্বেতপ্রাপ্তির বিনির্ম্মিত, অপূর্ব্ব চারু শিল্পখচিত সূর্য্যরশ্মি প্রতিঘাতী জগতে অতুল্য তাজমহল নীল গগণে প্রতিকৃতির ন্যায় বোধ হয়। তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর পথ, সুন্দর কুজন, সুন্দর ফোয়ারা পার্শ্বে শ্যামা যমুনা। আগ্রার প্রকাণ্ড দুর্গ; তম্মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত সুন্দর মতি মসজীদ, দেওয়ান খাস, দেওয়ান আম রংমহল, শিশমহল। আগ্রার সৌন্দর্য্য কত বর্ণনা করিব! পাঠিকাগণ! যদি এই অপূর্ব্ব নগরী না দেখিয়া থাক, অদ্যই যাইবার উদ্যোগ কর। ----- প্রসিদ্ধ দ্বিময়ূর সিহাসনে অদ্য সম্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়াছেন। প্রাসাদের শ্বেত স্তম্ভসারি রক্তবর্ণ সার্টিনে মণ্ডিত রহিয়াছে। রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ হইতে পুস্পমাল্যের সহিত মনিমাণিক্য ঝুলিতেছে ও বালসূর্য্য করস্পর্শে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; চারিদিকে মহারাজা, রাজা, ওমবাহ, মনসবদার প্রভৃতি ভারতের অগ্রগণ্য বীর ও ধনী ও মান্য লোকে নিজ, নিজ ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিয়া অদ্য রাজপ্রাসাদকে ইন্দ্রপুরী করিয়াছে।"[৩৭]

রমেশচন্দ্র মোগলদের বেগম মহলেরও বর্ণনা করেছেন- "ঐশ্বর্য্য, শিল্পকার্য ও বিলাসপ্রিয়তার সহায়তায় মানুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা নরেন্দ্র অদ্য দেখিলেন। শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত কত ঘর, কত প্রাঙ্গণ, কত সুন্দর স্তম্ভসার, কত উন্নত ছাদ দেখিলেন তা গণনা করা যায় না। সেই প্রস্তরে কি অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য! দেয়ালে স্তম্ভে, প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর শ্বেতপ্রস্তরে সন্নিবেশিত হইয়া লতা, পত্র বৃক্ষ, পুষ্পের রূপ ধারণ করিয়াছে, যেন সুন্দর শ্বেত দেয়ালের পার্শ্বে যথার্থই পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। ছাদ হইতে যেন সেইরূপ পুষ্প লম্বিত রহিয়াছে অথবা সুন্দর সুবর্ণে মণ্ডিত ও চিত্রিত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ করিতেছে। শ্বেত প্রস্তর- বিনির্ম্মিত সুন্দর গবাক্ষ, সুন্দর ফোয়ারা সুন্দর পুষ্পাধার; তাহার উপর কি মনোহর সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া প্রাসাদকে আমোদিত করিয়াছে। শ্বেত, পীত, নীল বর্ণের আলোক সেই রঞ্জিত ঘরের ভিতর ও বাহিরে দেখা যাইতেছে। জগতে অতুল্য রূপবতী বেগমগণ কেহ বা সেই ঘরে বা প্রকোষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা পুষ্প চয়ন করিয়া কেশে ধারণ করিতেছেন, কেহ বা আনন্দে গান করিতেছেন। আজি আনন্দের দিন, রাজপ্রাসাদ আনন্দে ও নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ।"[৩৮]

লেখক মোগলদের অন্দর মহলের নারীদের দ্বারা পরিচালিত মিনাবাজারের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই নারী। বাহিরের পুরুষের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। তবে সম্রাটের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। নিচের উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য:

"ঝোপে, বৃক্ষের অন্তরালে, সম্মুখে, পার্শ্বে, উচ্চে, নীচে নানা বর্ণের সুগন্ধ দীপাবলী জলিতেছে, যেন আজি ইন্দ্রের অমরাপুরী ও সন্তানককে লজ্জিত করিয়া এই বেগম মহল অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছে। সেই প্রাঙ্গণে একটা বাজার বসিয়াছে, ক্রেতা বিক্রেতা দলে দলে বিচরণ করিতেছে, অন্যান্য বাজার হইতে এই ভেদ যে সকলেরই রমণী,– বিক্রেতা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজা মহারাজা ও ওমরাহের মহিলাগণ; ক্রেতা সম্রাটের বেগম। যে সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য ক্রীত ও বিক্রীত হইতেছে, যে সমমোগলদের অন্দর মহলের নারীদের দ্বারা পরিচালিত অর্নির্ব্বচনীয় বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে ক্রেতা ও বিক্রেতা দিগের শরীর আবৃত ও শোভিত এবং যে সমস্ত অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী লাবণ্যময়ী যুবতীগণ সেই বস্ত্র ও সেই অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। তিনি অনেক রাজ প্রাসাদে অনেক অপরূপ শোভা দেখিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ স্বর্গোদ্যানে এরূপ অপ্সরামণ্ডলী কখনও দেখেন নাই।"[৩৯]

প্রতি বছর অনুষ্ঠিত মোগলদের নওরোজ উৎসবের প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছে উপন্যাসে। সবশেষে বলা যায় যে, ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির একটা বাস্তব তথ্যপরিপূর্ণ জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে তিনি শুধু ঐতিহাসিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, নরেন্দ্র ও হেমলতার অন্তরঙ্গ প্রণয়ের চিত্রও তুলে

ধরেছেন। এক্ষেত্রে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে: "তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাসের দিক দিয়া রমেশচন্দ্র 'মাধবীকঙ্কণ' এ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উন্নতি কেবল ঐতিহাসিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ নহে। নরেন্দ্র হেমলতার অন্তগূঢ় প্রতিরূদ্ধ প্রণয়ের যে করুণ চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা উপন্যাস সাহিত্যে বিরল।"[৪০]

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধিতে যে কয়জন হিন্দু সেনাপতি ও রাজপুতরা অসামান্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ অন্যতম। সে জন্যই হয়তো-বা উপন্যাসিক অপ্রাসঙ্গিকভাবেই সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের উত্তরাধিকারী দ্বন্দ্বে – জয়সিংহের আগমন ঘটিয়েছেন। কেননা ইতিহাসে যশোবন্ত সিংহের কথা উল্লেখ আছে জয়সিংহ নয়। তবে লেখক রাজপুত জাতির অসীম সাহস ও বীরত্বের পাশাপাশি মুঘল সম্রাটদের প্রতি তাদের অসাধারণ আনুগত্যের চিত্র ফুটে তুলেছেন। 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসে।

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' রমেশচন্দ্র দত্তের তৃতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। যথারীতি অপর দুটি উপন্যাসের ন্যায় এটিও মুঘলদের ইতিহাসকেন্দ্রিক। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও শিবাজীর সংঘর্ষ ছিল এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসে সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন আলোচিত ব্যক্তিত্ব। উত্তরাধিকার যুদ্ধে ভাইদের হত্যা ও পিতাকে কারাগারে বন্দী করার জন্য বহু লেখক ও ঔপন্যাসিক তাকে নিষ্ঠুর শাসক বলে উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনাকে উল্লেখ করে বহু নাটক উপন্যাস রচনা করে জনমানসে আওরঙ্গজেবকে একজন উচ্চাকাঙ্খী চতুর কপট ও নিষ্ঠুর শাসক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক একপেশেভাবে তাঁর ত্রুটিগুলোকেই উল্লেখ করে তাঁর অন্যান্য গুণাবলি ম্লান করেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার কররেল আওরঙ্গজেবের চরিত্রে দোষ-গুণের সমাবেশ ছিল। শাসক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। ইউরোপীয় পর্যটক ও ঐতিহাসিকরাও শাসক হিসাবে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বার্নিয়ে তাঁকে প্রতিভাবান ও শ্রেষ্ঠশাসক বলে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে নিঃসন্দেহে শিবাজী ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে একজন সাহসী বীরযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। তবে তিনি ইতিহাসে বিতর্কের উর্ধ্বে ছিলেন না। তাঁর রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে জোরপূর্বক চৌথ আদায় ও চাতুরীপনার অভিযোগ তার নামেও আছে। তথাপি শিবাজী নাটক ও উপন্যাসে জাতীয় বীর হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' উপন্যাসটিতে আওরঙ্গজেবের শাসনামলের সম্পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠে নাই। শুধুমাত্র আওরঙ্গজেব ও শিবাজীর সংঘর্ষের দিকট ফুটে তুলেছেন। এক্ষেত্রে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : 'রমেশচন্দ্র আরঙ্গজেবের

সম্পূর্ণ চিত্র দেন নাই শিবাজীর আখ্যায়িকার সহিত তাঁহার যতটুকু সংস্রব ছিল, তাহাতেই আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।"[৪১]

এই উপন্যাসেও আওরঙ্গজেব চিত্রিত হয়েছেন চতুর ও কপটাচারী হিসাবে এবং শিবাজী যথারীতি জাতীয় বীর। উল্লিখিত উপন্যাসে লেখক শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির জাগরণের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মুঘলদের রাজ্য সীমার বিস্তার ঘটেছিল, কাবুল, হতে চট্টগ্রাম ও কাশ্মীর হতে কাবেরী পর্যন্ত। এই বিশাল সাম্রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় জাঠ শিখ ও মারাঠাদের মধ্যে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মারাঠা জাতি। শিবাজীর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতির জাগরণ ঘটে এবং তারা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শিবাজী সফলকাম হন এবং তিনি মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে 'ছত্রপতি' উপাধী গ্রহণ করেন।[৪২]

শিবাজী ও আওরঙ্গজেবের এই নানা সময়ের ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিন্যাস ঘটেছে এই কাহিনীর। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে সরযু ও রঘুনাথের প্রণয়োপাখ্যান এবং তাঁদের আকুলতা ও মিলন।

'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' রচনার জন্য রমেশচন্দ্র দত্ত ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন প্রধানত James Grant Duff রচিত 'A History of the Maharattas' গ্রন্থ থেকে। তিন খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থে মারাঠা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে শিবাজীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।[৪৩] এখান থেকেই লেখক শিবাজীর আদ্যন্ত পরিচয় প্রকাশ করেছেন। শিবাজীর পূর্ব জীবন মুঘলদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়, যুদ্ধ, জয়সিংহের সাথে সমঝোতা যশোবন্ত সিংহের সহায়তা এমনকি জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের কাহিনী ও লেখক Grant Duff থেকে গ্রহণ করেছেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন 'মুসলমান' শাসনকালে আহমদনগর সুলতানদের অধীনে 'যাদবরাও' ও 'ভস্‌লা' নামক দুইটি পরাক্রান্ত বংশ ছিল। শিবাজীর মাতা জিজাবঈ যাদবরাও বংশের এবং পিতা শাহজী ভঁসলে 'ভঁসলা বংশের।"[৪৪]

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও শিবাজীর সংঘর্ষ ছিল মহারাষ্ট জীবন-প্রভাত উপন্যাসের মূল কাহিনী। আওরঙ্গজেবের সময়কাল ছিল ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী: পর্যন্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের ঘটনা এটি। তবে ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মূল ঘটনায় যাওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ কাহিনীর শুরু করেছেন একাদশ শতাব্দীর শুরুতে গজনীর অধিপতি সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের মাধ্যমে। বিভিন্ন সময়ে কিভাবে হিন্দু রাজ্য সমূহ

মুসলমানদের অধীনে আসে তার বর্ণনা দিয়েছেন সেই সাথে মুসলমানদের অধীনে হিন্দুদের কার্যগ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। লেখক উল্লেখযোগ্য যে কয়জন শাসকের নাম উল্লেখ করেছেন তারা হলেন, সতের বার ভারত বিজয়ী দিগ্বিজয়ী বীর সুলতান মাহমুদ মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রবর্তক আলাউদ্দীন খিলজী ও পাঁচটি ভিন্নধর্মী পরিকল্পনার প্রবর্তক ও ভারতের ইতিহাসে বহুল আলোচিত শাসক মহাম্মদ বি তুঘলক।

লেখক যেভাবে বর্ণনা করেছেন 'খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই গজনীর অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও সেই সময় হইতে দুইশত বৎসরের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশই মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা এক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিলেন বিন্ধ্যাচল ও নর্ম্মদাসরূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইবার সহসা কোন উদ্যম করেন নাই। অবশেষে এয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর যুবরাজ আলাউদ্দিন খিলজী অষ্ট সহস্য অশ্বারোহী সেনা সহিত নর্ম্মদা নদী পার হইলেন ও খন্দেশ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সহসা হিন্দু রাজধানী দেবগডের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজা সন্ধির প্রস্তাব করিতেছিলে, এমত সময়ে রাজপুত্র বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রামে হিন্দু সেনা পরাস্ত হইল ও হিন্দু রাজা বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদশে দান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইলে তাঁহার সেনাপতি মালীক কাফুর তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ ও নর্ম্মদাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করেন। তথাপি আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কেবল দেবগড় ভিন্ন আর সমুদয় প্রদেশ পুনরায় হিন্দু দিগের হস্তগত হইল।"[৪৫]

লেখক মূলত দক্ষিণ ভারতের বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এর পরের ইতিহাস তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন চতুর্দ্দশ খ্রী: শতাব্দীতে যখন টোগলক (তুঘলক) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন, তাঁহার পুত্র যুনাস (জুনা খাঁ ইতিহাসে যিনি মুহাম্মদ বিন তুঘলগ নামে খ্যাত) পুনরায় দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া সমুদয় তৈলঙ্গ প্রদেশ অধিকার করেন ১৩২৩ খ্রী:, পরে মুহম্মদ টোগলক নাম ধারন করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস পান।

দেবগড়ের নাম পরিবর্তিত করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন ও সমস্ত দিল্লীবাসিদিগকে তথায় যাইবার আদেশ দিলেন। এই প্রয়াস নিস্ফল হলেও সম্রাট দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলেন না। সুতরাং দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচারণ করিতে লাগিল। তৈলাঙ্গ প্রদেশ জয়ের পর সেই স্থানের কতকগুলি হিন্দুনিবাসী বিজয়নগরে নতুন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন ১৩৩৫ খ্রী: ও জফীর

খাঁ নামক একজন মুসলমান তৈলঙ্গের রাজার সহায়তায় দিল্লীর সেনাপতি উম্মাদ উলমূলককে তুমুল সংগ্রামে পরাভূত করিয়া দৌলতাবাদে একটি স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিলেন ১৩৪৭ খ্রী:। কালক্রমে বিজয় নগর দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটি প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল।"[৪৬]

এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন কালক্রমে কিভাবে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু স্বাধীনতা বিলুপ হল। দৌলতাবাদ রাজ্য বিভক্ত হয়ে আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুন্ডা নামে তিনটি শক্তিশালী মুসলমান রাজ্য কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো লেখক তা উল্লেখ করেছেন। মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়া এবং কিছু স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তেমনি একটি রাজ্য হচ্ছে বাহমনি রাজ্য।

রমেশচন্দ্র দত্ত বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাহলো "সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয় জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিল। কথিত আছে দৌলতাবাদের প্রথম রাজা জাফীর খা পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মনের ক্রীতদাস ছিলেন, ব্রাহ্মন বালকের বুদ্ধিবল দেখিয়া তাকে স্বাধীন করিয়া দেন। পরে যখন জাফীর খাঁ রাজা হইলেন তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে আপন কোষাধ্যক্ষ করেন ও সেই কারণে জাফীরের বংশ বাহমিনী (ব্রাহ্মণীয়) বংশ বলে খ্যাত।"[৪৭]

ইতিহাসে বাহমনী বংশ প্রতিষ্ঠার বর্ণনা অন্যভাবে আছে যেমন- দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রাধান্য অস্বীকার করে দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহী অভিজাতগণ দৌলতাবাদ দুর্গটি দখল করেন এবং ইসমাঈল শুখ নামে তাঁদের নেতাকে নাসিরউদ্দিন শাহ উপাধিতে ভূষিত করে সেখানকার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষনা করে। কিন্তু রাজ্য শাসনে স্বীয় বার্ধক্যজনিত অপারগতার জন্য তিনি প্রভাবশালী নেতা জাফর খান হাসানের অনুকূলে দৌলতাবাদের সিংহাসন ত্যাগ করেন। ১৩৪৭ খিস্টাব্দে জাফর খান হাসান 'আবুল মুজাফ্ফর আলাউদ্দীন বাহমন শাহ' উপাধি গ্রহণ করে নব প্রতিষ্ঠিত দৌলতাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। দিল্লী সুলতানী হতে উদ্ভদ স্বাধীন মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে দক্ষিনাত্যের এই বাহমনী রাজ ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তবে উপন্যাসিক বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘটনা যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা ঐতিহাসিক ফিরিশ্তা তাঁর তারিখ-ই-ফিরিশতা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারেন। "ফিরিশতার বর্ণনা অনুযায়ী হাসান প্রথম জীবনে গাঙ্গু নামে দিল্লীর জনৈক ব্রাহ্মন জ্যোতিষীর ভৃত্য ছিলেন। কিন্তু ফিরিশতার বর্ণনার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কারণ তাঁর সমসাময়িক কোন ইতিহাসবিদের রচনায় বা পরবর্তী মুসলিম লেখকদের গ্রন্থে তাঁর এই বর্ণনার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। তৎকালীন

মুদ্রা ও খোদাই কাজ হতেও এই কাহিনীর কোন সতব্যায় প্রমাণ মেলেনি। তাই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন না। তবে হাসান পারস্যের বিখ্যাত বীর বাহমন-বিন-ইসফানদিয়ার এর বংশধর বলে দাবি করেন। সুতরাং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ ইতিহাসে বাহমনী বংশ নামে পরিচিত।"[৪৮]

লেখক আরও উল্লেখ করেছেন যে ১৫৯০ সালে কিভাবে সম্রাট আকবর পুনরায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য অধীনে আনার চেষ্টা করেন এবং মৃত্যু পূর্বে তিনি সমগ্র খন্দেশ ও আহমদনগর দিল্লীর অধীনে আনেন। এরপর ১৬৩৬ খ্রী: সম্রাট শাহজাহান সমগ্র আহমদনগর মুখর সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। লেখক বলেছেন "আখ্যায়িকা বিবৃতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটি পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল।"[৪৯]

এই সময় হিন্দুরা মুসলমানদের অধীনে কাজ করতো এবং মুসলমানদের অধীনে হিন্দুদের অবস্থাও যে ভাল ছিল তা লেখকের কথায় ফুটে উঠেছে। যেমন: "এই সমস্ত রাজ বিপ্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অথ্যাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদিগের জানা আবশ্যক। মুসলমান রাজ্যের অধীনে অথ্যাৎ প্রথমে দৌলতাবাদের পর আহম্মদনগর বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনে হিন্দুদের অবস্থা নিতান্তই মন্দ ছিল না। বস্তুত মুসলমানদিগের দেশ শাসসন কার্য্য অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধি বলেই পরিচালিত হইত।"[৫০] শাসন ব্যবস্থার ধরনও উল্লেখ করেছেন," প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগুনায় বিভক্ত ছিল ও সেই সমস্ত সরকার ও পরগুনায় কখন কখন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কার্য্যকরীগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন।"[৫১] মুসলমানদের অধীনে মারাঠারা শাসন বিভাগের বিভিন্ন স্তরে কাজ করত সেটিও লেখক ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন- রাজস্ব আদায় থেকে শুরু করে দূর্গ রক্ষার কাজ বিজয়পুরের সুলতানের দ্বাদশ সহস্য পাদাতিক বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যের মারাঠারা মুসলিম শাসনের অধীনে তাদের সামরিক ও বেসমারিক শাসন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতি ঐক্যও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শিবাজীর আর্বিভাবের পূর্বে। তাই লেখকের মতে, "এইরূপে মহারাষ্ট্রীয় জীবন ঊষার প্রথম রক্তিমাচ্ছটা শিবাজীর আর্বিভাবের অনেক পূর্বেই ভারত আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।"[৫২]

মূলগল্পে যাবার পূর্বে লেখক এভাবেই ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায় 'উপন্যাসের প্রারম্ভে দেশের ইতিহাস ও লোকের আপন অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। তাহাতে মনে হয় পাঠকমহাশয় বিরক্ত হইবেন না।[৫৩] এরপর লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রগুনাথজী হাবিলদারকে দিয়ে উপন্যাস শুরু করেছেন এবং রাজপুত্র ব্রাহ্মন কণ্যা সরজুবালার বর্ণনা

দিয়েছে যিনি রঘুনাথজী হাবিলদারের প্রেমিক ছিলেন। লেখক তাঁর এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটিতে মূলত গল্পের চেয়ে ইতিহাস অধিক আলোচনা করেছেন। রমেশচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি অধিকতর যত্নশীল ও নিষ্ঠাবান হওয়ার জন্য উপন্যাস জমিয়ে তুলতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। বস্তুত ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে তা স্বীকার করতে হবে। শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা বলে যাওয়া বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে হুবহু ইতিহাসের ধাঁচেই লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ নয়। ইতিহাসের পাঠে ইতিহাসের রস সৃষ্টি করা ইতিহাসের চরিত্রের মধ্যে চিরকাল মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করা এবং ইতিহাসের অজ্ঞাত রহস্যময় কোনে সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বড় লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োজনস্থলে ইতিহাসকে কিছু বদলে নিলেও কোথাও ইতিহাসের আত্মার অবমাননা করেননি। আসলে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিল্পি এবং প্রথম শ্রেণীর শিল্পি প্রতিভাবাপন্ন। রমেশচন্দ্র সুক্ষ্মাগ্রবুদ্ধি ও ঐতিহাসিকের মতে ইতিহাসের ঘটনাও চরিত্রের সারি দিয়ে সাজিয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস লিখতে পারেননি। কল্পনার যে ঐশ্বর্য্য ও শিল্পীর সে শক্তি তাঁর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র যার ছিলেন রাজাধিরাজ।" বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে এটাই বড় পার্থক্য।[৫৪]

রমেশচন্দ্র শিবাজী ও আওরঙ্গজেবের দ্বদ্বের আলোচনায় শায়েস্তা খান, যশোবন্ত সিংহ ও রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে যা ছিল যথার্থই ইতিহাস সম্মত। আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন মূলত তখন থেকেই শিবাজীর সাথে তিনি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন।

আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন (১৬৫২-৫৭ খ্রী:) তখন বিজাপুর রাজ্যেই তার দুর্গ আক্রমণ ও দখল সীমাবদ্ধ ছিল। শিবাজীর কর্মতৎপরতায় বিরক্ত ও শঙ্কিত হয়ে বিজাপুরের কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁর পিতা শাহজীকে আটক করলে শিবাজী এযাবৎ যে অভিযান চালিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিতাকে সসম্মানে মুক্তি করে আনেন। কিন্তু একেবারে স্থীর হয়ে বসে থাকার ব্যক্তি শিবাজী ছিলেন না' ছলে বলে কৌশলে নিজের শক্তিবৃদ্ধি ছিল তার অবিচল লক্ষ্য।[৫৫]

তবে এই সময়ের শিবাজীকে আওরঙ্গজেব তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, কিন্তু তিনি যখন সম্রাট হলেন এবং বিশেষ করে যখন সেনাপতি আফজাল হত্যার সংবাদ পেলেন তখন তিনি উপলব্দি করলেন যে, এই দুঃসাহসী মারাঠ দাক্ষিণাত্যে মুঘল রাজশক্তিকে বিপন্ন করতে পারে। তিনি ১৬৫৯ সালে তার মাতুল শায়েস্তা খানকে শিবাজীকে দমন করতে পাঠান।

এথমেই শায়েস্তা খান সাফল্য লাভ করেন। চাকান দখল করেন এবং পুনাও মুগলদের দখলে আসে ফলে কল্যাণ থেকে মারাঠারা বিতাড়িত হয়। পুনাকে তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে মুঘলদের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে পরিণত করেন। এসময় রাজপুত্র নেতা যশোবন্ত সিংহ দশ হাজার রাজপুত্র সৈন্য নিয়ে শায়েস্তা খার সাথে যোগ দিলে শিবাজীর অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠে। দুর্ধর্ষ মুঘল বাহিনীর সংগে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব মনে করে চতুর শিবাজী ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের এক রাত্রিতে মাত্র কয়েকজন অনুচরসহ অতর্কিতে শায়েস্তা খার বাস ভবনে (যেখঝানে শিবাজীর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে) প্রবেশ করেন এবং তাঁর পুত্র ও চল্লিশজন রক্ষীকে নিহত করেন। শায়েস্তা খাঁ অক্ষত থাকলেও তাঁর হাতের একটি আঙ্গুল ছিন্ন হয়। এই নৈশ অভিযান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে শিবাজী সিংহগড় দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে শিবাজী সুরাট দুর্গ লুণ্ঠন করেন। এমনকি তীর্থযাত্রীদের জাহাজও তিনি লুণ্ঠন করেন। শিবাজীর স্পর্ধায় রুষ্ট হয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৬৫ সালে অম্বরবাজ জয়সিংহ এবং সেনাপতি দিলির খানকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয় সেনাপতিই ছিলেন যুদ্ধের ব্যাপারে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ; জয়সিংহের সাহস, দুরদৃষ্টি ও কুটনীীত নৈপূণ্য সুবিদিতি ছিল।[৫৬] শিবাজী কিছুকটা ভীত হয়ে পড়েন; এবং জয়সিংহের কাছে হিন্দু বলে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে যখন বুঝলেন যে মুঘলদের বিরুদ্ধে তিনি যেতে প্রস্তুত নন তখন বাধ্য হয়ে শিবাজী ১৬৬৫ খ্রী: ১১ই জুন জয়সিংহের সাথে পুরন্দরের সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী কাফি খানের মতে" অবশেষে স্থির হলো যে শিবাজীর ৩৫টি দুর্গের মধ্যে ২৩টির চাবিকাঠি মুগলদের হাতে দেওয়া হবে; ঐ দুর্গগুলির এলাকায় চল্লিশ লক্ষ টাকার রাজস্ব সংগৃহীত হত। বারোটি ছোট কেল্লা শিবাজীর দখলে; তাদের আয় খুব বেশী ছিল না। শিবাজীর আট বৎসরের ছেলে শম্ভুকে নামে পাঁহাজারী মন্সংদার বানিয়ে রাজা জয়সিংহের জিম্মায় যথাযোগ্য অনুচর নিয়ে বাদশাহের রাজসভায় পাঠানো হল।[৫৭]

জয়সিংহ শিবাজীকে আগ্রায় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সম্রাট কর্তৃক বহু সুবিধা ও সম্মান পাবেন এই আশ্বাস দেন। জয়সিংহের কথায় নির্ভর করে শিবাজী ১৬৬৬ খ্রীঃ পুত্র সম্ভুজীসহ আগ্রায় গমন করেন। আগ্রার দরবারে তাঁকে মাত্র 'পাঁচ হাজারী মনসবদার' পদে নিযুক্ত করায় তিনি অপমানিত বোধ করেন এবং দরবারেই এর প্রতিবাদ করলে সম্রাট আওরঙ্গজেব এতে অসন্তুষ্ট হয়ে শিবাজীকে জয়পুর ভবনেই বন্দী করে রাখার আদেশ দেন। কিন্তু সুকৌশলে শিবাজী এক সময় পুত্রসহ পালিয়ে নিজরাজ্যে চলে আসেন। উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা আছে পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও চতুর্দশ পরিচ্ছদে মনে হবে যেন এটি উপন্যাস নয়, ইতিহাসের গ্রন্থ ধারা বর্ণনা।

লেখক জয়সিংহের চরিত্রে রাজপুত্র জাতির বৈশিষ্ট্য ফুটে তুলেছেন। রাজপুত্রদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সত্যবাদিতা এবং ন্যায়পরায়নতা, জয়সিংহ ছিলেন আওরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি তিনি এই বৈশিষ্ট্য থেকে কখনও বিচ্যুত হন নাই। সারা জীবন মুঘলদের পক্ষে আনুগত্য প্রদর্শন করে গেছেন। শিবাজী তাঁকে স্বপক্ষে আনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে গেছেন কিন্তু জয়সিংহ কোন কপটতা বা শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করতে রাজী হননি। তাইতো উপন্যাসেও আমরা জয়সিংহের মুখে শিবাজীকে বলতে শুনি। "আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুত্রকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুত্রদের ইতিহাস পাঠ করুন সহস্র বৎসর মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও সত্য লঙ্ঘন করেন নাই। কখন জয়লাভ করিয়াছেন, অনেক সময় পরাস্ত হইয়াছেন, কিন্তু জয়ে পরাজয়ে সম্পদে আপদে, সর্ব্বদা সত্যপালন করিয়াছে। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সত্য পালনের গৌরব আছে। দেশে বিদেশে মিত্রমধ্যে, শত্রুমধ্যে রাজপুত্রের নাম গৌরবান্বিত। ক্ষত্রিয় রাজ টোডরমল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয় পতাকা লইয়াছিলেন কেহ কখনও ন্যস্ত বিশ্বাপসের বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই। মুসলমান সম্রাটের নিকট ও যাহা সত্য করিয়াছিলেন তাহা পালন করিয়াছিনে। মহারাষ্ট্ররাজ! রাজপুত্রের কথাই সন্ধিপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্গন হইয়াছে, রাজপুত্রের কথা লঙ্ঘন হয় নাই।"[৫৮]

জয়সিংহের মাহাত্ম্য তুলে ধরার জন্য লেখক এখানে ফরাসী পর্যটক বাণিয়ের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। "তৎকালীন ফরাসী ভ্রমনকারী বর্ণীয়র লিখিয়াগিয়াছেন যে, বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের ন্যায় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান দূরদশী লোক আর একজনও ছিলেন না।"[৫৯] রাজপুত্রের আদর্শ ও হিন্দুজাতির মাহাত্ম প্রকাশের জন্য জয়সিংহ রমেশচন্দ্র দত্তের অপরূপ আদর্শ সৃষ্টি।

যশোবন্ত সিংহ ছিলেন মারওয়াড় রাজ্যের রাজা। তিনি বহু বার মুঘলদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন ও বিরোধীতা করেছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে বিশ্বাস করে উচ্চপদ দান করেছিলেন এবং দাক্ষিনাত্যে শিবাজীকে দমনের জন্য তাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। তিনি পুনা ও চাকাস দূর্গ অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬০] সেই ঘটনার উল্লেখ করেছেন লেখক সপ্তম পরিচ্ছেদে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি হিসাবে রাজপুত্র যশোবন্ত সিংহ মুঘলদের পক্ষে ও মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করছেন বলে শিবাজী তাকে তিরস্কার করেন।

"উদয়পুরের প্রতাপ রানার বংশে যিনি বিবাহ করেছেন, মাড়ওয়ারের রাজছত্র যাঁহার মস্তকের উপর ধৃত হইয়াছে, রাজস্থান যাঁহার সুখ্যাতিতে পুরিপূর্ণ রহিয়াছে সিপ্রাতীরে যাহার বাহুবিক্রম দেখিয়ে আরংজীব ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারত বর্ষ যাঁহাকে সনাতন হিন্দুধর্মের স্তম্ভস্বরুপ জ্ঞান করে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মন্দিরে মন্দিরে যাঁহার জয়ের জন্য হিন্দু মাত্রেই, ব্রাহ্মন মাত্রেই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থন করে অদ্য তাঁহাকে মুসলমানদের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্দ হইয়াছেন।[৬১] যশোবন্ত সিংহ এর নিরবতা ভাঙ্গার জন্য মহাদেওজী আবার বলিতে শুরু করলেন "আপনি রাজপুত্র মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত-পুত্র; পিতাপুত্র যুদ্ধ সম্ভবে না; স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধে নিষেধ করিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করুন আমরা পালন করিব। রাজপুত্রের গৌরবই অনাথ ভারত বর্ষের একমাত্র গৌরব। রাজপুত্রের যশোগীত আমাদের রমণীগণ গাইয়া থাকে, রাজপুত্রদিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত হয়, সে রাজপুত্রের সহিত যুদ্ধ! ক্ষত্রকুলিতিলক। রাজপুত-শোনিতে আমাদিগের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম বিলুপ্ত হয়; রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা যেন বর্শা ও খড়্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ধারন করতে শিখি।"[৬২] যশোবন্ত সিংহ এর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না দেখে এবং তিনি শিবাজীর পিক্ষে মুঘলদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এখনও অটল আছেন দেখে মহাদেওজী স্বধর্ম ও স্বজাতীয় ভাবের ভাবের উৎসমূলে নাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন; "এবং শত শত স্বধর্ম্মীকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন করিবে, ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনের বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোনিতস্রোতে ক্ষত্রিয় শোনিত স্রোত মিশাইবে, শেষে মেচ্ছ সম্রাটের সম্পূর্ণ জয় হইবে।"[৬৩] হিন্দুর ধর্ম মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা হিন্দুর ঐক্য, মুঘল বা,শার অত্যাচার ইত্যাদির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে মহাদেওজী যশোবন্দ সিংহরে মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হলেন। এ পরিবর্তন যে, হিন্দু জাতির ঐক্যের প্রতিষ্ঠা ও গৌরভ সাধনের মূলমন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। যশোবন্ত সিংহ একজন উনিশ শতকের জাতীযতাবাদী বাঙ্গালীর উদ্দপ্ত চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।[৬৪]

শিবাজী সত্যবাদী, স্বদেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকামী, স্বধর্মভক্ত, জাতীয়তাবাদী, সাহসীযোদ্ধা এবং সুবিচারক প্রভৃতি নানাবিধ গুণে গুণান্বিত করেছেন ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত উপন্যাসের নায়ক শিবাজীর চরিত্রকে। অষ্টম পরিচ্ছেদে শিবাজী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শিবাজীর জন্ম, বেড়ে উঠা মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া কখোনও জয় কখোনও পরাজয় অথবা সন্ধির কথা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এক পর্যায়ে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে যে, ১৬৬২ খ্রীঃ এই সন্ধি স্থাপিত হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবাজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, ও তাঁহার সপ্ত সহস্র

অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ সহস্রব্র পদাতিক সেনা হইয়াছিল।[৬৫] শিবাজী, তাঁর পিতা ও পিতার প্রভৃতি বিস্তারিত আলোচনা আছে এই অষ্টম পরিচ্ছেদে।

"শিবাজী ১৬২৭ খ্রী: অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে তাঁহার বয়স কি ৪৬ বৎসর ছিল। তাহার পিতার নাম শাহজী ও পিতামহের নাম মল্লজী ভগশ্লে। ফুলতন দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর বংশের যোগপাল রাও নায়েকের ভগ্নী দিপারাইকে মল্লাজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেকদিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায় আহম্মদ নগরবাসীশাহ শরীফ নামক একজন মুসলমান পীরের নিকট মল্লজী অনেক অনুরোধ করেন এবং পীরেও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারাই কিছু পরে দীপাইয়ের গর্ভে একটি সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।"[৬৬] এইভাবে শিবাজির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এই অষ্টম পরিচ্ছেদে কিভাবে শিবাজীর পিতার বিয়ে জিজাবাঈয়ের সংগে হয় আবার কেমন করে শিবাজীর পিতা শাহজী দ্বিতীয় বিয়ে করে তাদের ছেড়ে চলে যান। এরপর শিবাজী মা জিজাবাঈয়ের নিকট মায়ের আদর্শে লালিত পালিত হতে থাকেন। বড় হয়ে মুগলদের অধিনস্ত দূর্গ হস্তগত করতে থাকেন। একপর্যায়ে বাবার সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ হয় তার সব কিছুর ইতিহাস বিস্তারিত ধারাবাহিকভাবে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর উপন্যাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

উনিশ শতকের সপ্তম দশকে দেশের খাতিরে শিবাজীর মত বীরের মাহাত্ম কথা প্রচারের প্রয়োজন ছিল। কারণ প্রতাপসিংহের বীরত্ব কাহিনী রাজপুত্র জাতির গর্বের বস্তু সন্দেহ নেই। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মত দুর্ধর্ষ মুঘল সম্রাটের সংগে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারেন একমাত্র শিবাজীই। সুতরাং শিবাজীই রাজপুত্র পরিত্যক্ত বিজয় গৌরবের উত্তরাধিকারী। রমেশচন্দ্রের শিবাজী ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের শিবাজীর চেয়ে আরও শক্তিশালী। ভুদেবের শিবাজী প্রেমিক, আর রমেশের শিবাজী স্বদেশ প্রেমিক ও স্বজাতিপ্রেমিক।[৬৭]

'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' উপন্যাসে লেখক যেভাবে সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্রের উল্লেখ এবং নীতির বিশ্লেষণ করেছেন সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক- লেখকের চোখে আওরঙ্গজেব ছিলেন, ক্রুর-কৌশল চতুর কপটচারী, হিন্দু বিদ্বেষী, অত্যাচারী স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী, সন্দিগ্ধমনা, অদূরদর্শী এবং দয়ামায়াহীন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত হিন্দুমেলার মাধ্যমে সঙ্গবদ্ধ হিন্দু সমাজকে উত্তেজিত করবার জন্য নিকটবর্তী অতীত ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেওয়ার মত যত চরিত্র ছিল, তার মধ্যে আওরঙ্গজেব অন্যতম। অন্যান্য মুঘল সম্রাটদের তুলনায় আওরঙ্গজেব যে অধিক ধর্মান্ত ও

গোঁড়ামুসলমান ছিলেন ইতিহাসে তার সমর্থন ররেছে। কাজেই, জাতীয় জাগরণের সময় এই ইতিহাসের উপস্থাপন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।[৬৮]

আওরঙ্গজেবে চরিত্রকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে "পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধিকৌশল ও রণনৈপূন্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লীল ময়ূর সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্য দেশ জয় করিয়া সমগ্র ভারতে একাধীশ্বর হইবার মহৎসঙ্কল্প করিয়াছিলেন, চল একবার সেই ক্রর কপটচারী, অথচ সাহসী, দুরদশী আরংজীবের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিব। তাহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষন করি।[৬৯] মনেরভাব নিরীক্ষন করতে গিয়ে যে বিষয়টিকে প্রকাশ করেছেন লেখক তাহলো আওরঙ্গঁজেবের আত্মঅহংকার। হিন্দুধর্মের প্রতি অবমাননা করার অভিলাষ, রাজপুত্র ও মহারাষ্ট্রীয়দের দমন করার প্রতিজ্ঞা এবং শিবাজীকে বন্দী অবস্থায় দেখার আনন্দ। এক পর্যায়ে লেখক বলেছেন "কোন কোন অজগর সর্প গো মহিয়াদি ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষের চতুর্দিকে জড়াইয়া-জাড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ইচ্ছানুসারে দংশন করে, ক্রর আওরঙ্গজেবও সেইরূপ কপোটতাজালে শিবাজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে বিনাশ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।"[৭০]

আবার দানেশমান্দের সাথে কথোপকথোনের সময়– "আওরঙ্গজেব সহাস্যে বলিলেন, দানেশমান্দ! আমি তোমার ন্যায় শাস্ত্রও নাহি; কবিতায় যাহা লিখে তাহা বিশ্বাস করিনা। মানব প্রকৃতি আমার শাস্ত্র; মানবের মহত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি। শঠতা, বিশ্বাস ঘাতকতা অনেক দেখিয়াছি। সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজ হস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি, সেই জন্য কাফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছি, বিদ্রোহাম্মুখ রাজপুতদিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নি:শত্রু করিব।"[৭১]

সম্রাট আকবর তাঁর শাসনামলে জিজিয়া কর যা মুসলমান শাসনাধীনে অমুসলমান প্রজার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অমুসলমানদের প্রদান করতে হতো। তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগদানের শর্তে এই কর প্রথাটি তুলে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে সম্রাট আওরঙ্গজেব পুনরায় জিজিয়া কর প্রবর্তন করলে তিনি হিন্দুদের আক্রোশের স্বীকার হন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের জিজিয়া কর পুনরায় প্রবর্তন করা সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতামত হচ্ছে- তিনি হিন্দু বিদ্বেষের কারণে নয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারনে অর্থ্যাৎ দীর্ঘদিন দাক্ষিনাত্যের যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকা এবং প্রায় ৮০ প্রকারের কর তুলে দেওয়ার ফলে রাজ্যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেন। তবে ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ব্যক্তি, স্ত্রীলোক, নাবালোক ও বৃদ্ধ প্রভৃতিকে এই কর দিতে হতো না। তথাপি হিন্দুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়েন যা অন্যান্য লেখকদের মত রমেশ চন্দ্রের লেখার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে।[৭২]

মুখলদের ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচুর্য ও শিল্পগুণ দেশ বিদেশের সমালোচকদের যেমন মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলে তেমনি সরাবিশ্বে তা সমাদৃতও হয়েছিল। সেই মুঘল স্থাপত্য ও শিল্পকলার বর্ণনা পাওয়া যায় রমেশ চন্দ্রের 'মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাত' উপন্যাসে।

রাজা জয়সিংহের সাথে সন্ধির শর্তানুসারে শিবাজী আড়রঙ্গজেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য যখন দিল্লীতে প্রবেশ করলেন তখন মুগলদের নির্মিত দিল্লী নগরীর জাকজমকপূর্ণ মনোহর শোভা দেখে শিবাজী বিস্মিত হন। দিল্লী নগরীর অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন লেখক তার সাবলিল ভাষায়-

শিবাজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে। বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য বহুমূল্যের স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব্ব খাদ্য সামগ্রী অপর্য্যাপ্ত গৃহানুকরণদ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবাজী রাপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। খোও গৃহের উপর দিয়া নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছেদে গৃহস্থেরা বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব: রাজা, মন্সবদার সেখ, আমীর ও ওমরাহগন গমনাগমন করিতেছেন; অশ্বারোহীগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়াযাইতেছে, সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মন্ডিত হইয়া শুপ্ত নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে সজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে; গুহুঙ্কার শব্দে শিবিকাবহকগণ যেন আরোহীর পদমর্য্যাদা চিৎকার শব্দের দ্বারা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে! শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা বায়গড়!"[৭৩] এরপর লেখক মুঘল স্থাপত্য শৈলীর বর্ণনা করেছেন যা ছিল জগতবিখ্যাত এবং ওই সমস্ত আড়ম্বরপূর্ণ স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখ করেছেন যা দর্শনে দর্শকমন আজও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। যাইতে যাইতে রামসিংহ দুরে তিনটি শ্বেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন- "ঐ দেখুন জুম্মা মসজিদ! সম্রাট শাহজাহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মন্দির নিম্মান করিয়াছিলেন,- শুনিয়াছি ওরূপ মসজীদ জগতে আর নাই।" শিবজী বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে দেখিলেন রক্তবর্ণ পুস্তরে নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া মসজিদের প্রাচীর

দেখা যাইতেছে। তাহার উপর সুন্দর শ্বেত-প্রস্তর বিনির্ম্মত তিনটি গম্বুজ ও দুইদিকে দুই মিনার যেন গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এই অপরূপ মসজিদের সম্মুখেই রাজপ্রসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ প্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দূর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে দুর্ঘ ও মসজীদের মধ্যে বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও রৌকরণ্য! সেই স্থানের ন্যায় আর একটী স্থান ভারতবর্ষে ছিল না। জগতে ছিল কি না সন্দেহ! দুর্গের প্রাচীরের টুপর সহস্র নিশান বায়ু-পথে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রাকশ করিতেছে! দুর্ঘদারে একজন প্রধান মনসরদারের প্রশস্ত শিবির; মনস্বদার দূর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে সেনা রেখায় রেখায় দন্ডায়মান রহিয়াছে।"[৭৪]

এর পর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে শিবাজী বিস্মিত হলেন- "চুতর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ কারখানায়" অসংখ্য শিল্পকারগণ বাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে, অপূর্ব্ব সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র মলমল মসলিন বা ছিট, বহুমূল্য গালিচা, চন্দ্রাতপ, তাম্বু বা পরদা সুন্দর পরিধেয়, উষ্ণীষ শালবা গাত্রভরণ অপরূপ সুবর্ণ রৌপ্য ও মনিমানিক্যের বেগম পরিধেয় অলঙ্কার, সুন্দর চিত্র, সুন্দর কারুকার্য্য, সুন্দর কাষ্ঠ বা শ্বেত প্রস্তরের গৃহানুকরণ দ্রব্য, রাশি রাশি নীল, পীতি রক্তভর্ণ বা হরিদ্বর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনাদ্রব্য, কত বর্ণনা করিব।"[৭৫] অর্থ্যাৎ লেখকও শেষ পর্যন্ত বর্ণনায় অপরাগতা প্রকাশ করেছেন। যেসমস্ত দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের বর্ণনা দিয়েছে সেগুলি হচ্ছে উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রাসাদ "দৌয়ান আম" সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর বিনির্ম্মত নানারূপ অলঙ্কারে অলকৃত জগতে অতুল্য" দেওয়ান খাস, প্রাসাদের ভিতর রত্নমানিক্য বিনির্ম্মিত সূয্যরশ্মি প্রতিঘাতী ময়ূর সিহাসন যেখানে সম্রাট সম্রাট উপবেশন করে আছেন। সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্য-বিনির্ম্মিত লে, তাহার সম্মুখে ভারতবর্ষের অগ্রগন্য রাজা মনসবদার ওমরাহ ও বীরপুরুষ এবং অসংখ্যলোক নি:শব্দে দন্ডায়মান রহিয়াছে।[৭৬] এইভাবে লেখক দিল্লী নগরী এবং মুঘল রাজদরবারের বর্ণনা করেছেন যেখানে মুঘলদের অভিজাত্যের বহি:প্রকাশ ঘটেছে।

উপন্যাসে চন্দ্ররাও জুমলাদার নামে উচ্চাভিলাষী, আত্ম-স্বার্থবাদী ও রঘুনাথের প্রতিপক্ষ হিসাবে যে ব্যক্তিটির পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসে তিনি চন্দ্ররাও মোরে নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি জাওলিতে ছোটখাট রাজ্য শাসন করতেন। শিবাজী ছলে বলে কৌশলে নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্ধস্বাধীন মারাঠা রাজার চন্দ্ররাও মোরের রাজ্যটি দখল করে নেন।[৭৭]

জীবন-প্রভাত – মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত উপন্যাসে রমেশচন্দ্র মূলত মুঘল-মারাঠা জাতির মহাযুদ্ধের ঘনঘটার মাধ্যমে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির জাগরণের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে রাজপুতদের আদর্শ ও হিন্দু জাতির

মাহাত্ম সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। যা হিন্দু জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও গৌরব সাধনের মূলমন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে এবং উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছেন।

ivRcÎ Rxeb-mÜ¨v

রমেশচন্দ্র দত্তের সর্বশেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজপুত্র জীবন সন্ধ্যা'। তিনি এ উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মুঘল সম্রাট আকবরের যুগকে উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় করেছেন। বিশেষ করে রাজপুত্র বীর প্রতাপসিংহের সাথে সম্রাট আকবরের দ্বন্দ্ব ও কিভাবে তাকে পরাজিত করে বিতোর জয় করেছেন সেই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে।

'প্রতাপসিংহের পতনের মধ্যেও যে বিজয়ের গৌরব নিহিত আছে, তাই সমসাময়িক সমাজকে বুঝিয়ে বলা লেখকের দায়িত্ব। রমেশ চন্দ্রের ইতিহাস চেতনা এভাবে যুগ-চেতনার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নরূপে অর্থবহ হয়ে চলেছে। প্রতাপসিংহের আত্মমর্যাদাবোধ আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতাস্পৃহা লেখকের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কাজেই এখানে মুঘলরা এসেছে উপলক্ষ হয়ে, মূল লক্ষ রাজপুত্র জাতির স্বাধীনতা রক্ষার কঠোর সংগ্রাম। হলদীঘাটের যুদ্ধে প্রতাপের পতনের মধ্য দিয়ে রাজপুত্র জাতির জীবন সন্ধ্যা নেমে আসে, কিন্তু স্বদেশের জন্য অনমনীয় সংগ্রামের মহৎ আদর্শও ফুটে উঠে তাতে।[৭৮]

মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোর বিজয় ছিল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের অন্যতম ঘটনা। আকবরের আমলে মেবারের পূর্ব-শক্তি, ক্ষমতা ও মর্যাদাবোধ আর ছিল না। রানা সংগ্রাম সিংহের পুত্র রানা উদয়সিং যেমন ছিলেন দুর্বলচেতা তেমনি অকর্মণ্য। কিন্তু অম্বরের বিহারীমলের ন্যায় তিনি সহজেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে বা তার কন্যার সাথে নিজের মেয়ে বিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। চিতোর দুর্গের সামরিক গুরুত্ব সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মালবের পলাতক রাজা রাজবাহাদুরকে আশ্রয় এবং বিদ্রোহী মির্জা হাকিমকে সাহায্য দান করার ফলে সম্রাট আকবর উদয়সিংহের উপর ক্ষুদ্ধ হন। ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে আকবর বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে উদয়সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন। উদয়সিং আরাবল্লী পর্বতে পলায়ন করে আত্মগোপন করেন। কিন্তু রাজপুত বীর জয়মল ও ফাতিসিংহ শেষ পর্যন্ত লড়াই করে প্রাণত্যাগ করেন। অসংখ্য রাজপুত সেন্য দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিলেন।

যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখে রাজপুত মর্যাদাশীল রমণীগণ জৌহর ব্রত অবলম্ব করে জলন্ত অঙ্গনকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। অবশেষে রাজপুত শক্তির পরাজয় ঘটে এবং সম্রাট আকবর যুদ্ধে জয়ী হন। চিতোর দূর্গ সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে মগলদের অধিকারে আসে।[৭৯]

পলায়নের চার বৎসর পর উদয়সিংহ মাত্র ১ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৫৭২ খ্রী: পুত্র প্রতাপসিংহ মেবারের রাজা হলেন। প্রতাপসিংহ ছিলেন পিতার পঁচিশ পুত্রের মধ্যে জেষ্ঠ্য পুত্র ছিলেন।[৮০] রাজপুত বীরত্বের ইতিহাসে প্রতাপসিংহের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মেবার ছিল ক্ষুদ্র রাজ্য কিন্তু বানা প্রতাপসিংহের সাহস ও দেশপ্রেম ছিল প্রবল যা অন্যান্য রাজপতদের অনুপ্রেরণা যোগাতো। তাই সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রীঃ মানসিংহ ও আসফখানের নেতৃত্বে প্রতাপসিংহকে দমনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং হলদিঘাট নামক স্থানে উভয়পক্ষ মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

সম্রাট আকবর সানসিংহ ও আসফ খানের নেতৃত্বে এক বিরাট মোগল সেনাবাহিনী রাণা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাটে উভয় পক্ষের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ বাধে। কিন্তু অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করেও রানা প্রতাপ শেষ পর্যন্ত মোগল বাহিনীর নিকট পরাস্ত হয়ে তার এক বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হন এবং তাঁর প্রিয় 'থশ্ব চৈতক' এ আরোহন করে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করেন এবং মোগল সেনাবাহিনী ক্রমে ক্রমে মেবার রাজ্যে দুর্গগুলি দখল করে নেয়। পর্বতে আশ্রয় নিয়ে দুঃখ দুর্দশা ও লাঞ্ছনার চরম সীমার পৌছিয়া ও রানা প্রতারে স্বাধীনতা স্পৃহা কমেনি। আশ্রয়হীনভাবে পর্বতারন্যের স্থান হতে স্থানান্তরে মোগল সেনাবাহিনী কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হয়েও তিনি নজি রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যান। মৃত্যুর পূর্বে অবশ্য তিনি কয়েকটি দুর্গ পুনরাধিকার করেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রানা প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমরসিংহ মেবারের রানা হন।[৮১] '১৫৯৯ খ্রী: মানসিংহ এবং যুবরাজ সেলিমের নেতৃত্বে মোগল সেনাবাহিনী অমরসিংহকে পরাজিত করে।[৮২] এরপরও (সমগ্র মেবার মোগল সাম্রাজ্য) ভুক্ত হয়নি। অসুস্থতার কারণে সম্রাট আকবর মেবারের আর কোন অভিযান প্রেরণ করেনি। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে আবার মেবার জয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তখন মেবারের রাজা ছিলেন বীর কেশরী রাণা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ। তিনি পিতার ন্যায় মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপ্রান চেষ্টা করেছিলেন। শাহজাদা পারভিজ মহাবত খান ও আব্দুল্লাহ খানের অধীনে সম্রাট পরপর সামরিক অীভযান প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু এই অভিযানগুলি ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৬১৫ খ্রীঃ সম্রাটের তৃতীয় পুত্র খুরবমের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরিত হয় এবং অমরসিংহ পরাজিত হন। তাঁর পুত্র কিরণসিংহ সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন।

মেবার অভিযানের সাফল্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর অত্যন্ত আনন্দিত হন। মোগল ও রাজপুত উভয়পক্ষের মধ্যে এক সম্মানজনক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অমরসিংহকে মেবার ফিরিয়ে দেওয়া হয় – সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বশ্যতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে। যুবরাজ কিরণসিংহকে পাঁচ হাজার সৈন্যের মনসবদার নিযুক্ত করেন। বিজিত শত্রুর প্রতি সম্রাট যে উদার ব্যবহার করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় ও তাঁর রাজনৈতিক দুরদর্শিতার পরিচায়ক। মেবারের রাণার বশ্যতা লাভে সমর্থ হয়ে সম্রাট এতো প্রীত হয়েছিলেন যে, তিনি অমরসিংহ ও কিরণসিংহের মর্মরমূর্তি নির্মান করে আগ্রার মোগল উদ্যানে স্থাপন করেছিলেন।[৮৩]

উল্লিখিত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই লিখিত হয়েছে "রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা"। তবে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে হলদিঘাট নামক স্থানে হলদিঘাটে যে যুদ্ধ হয় তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মানসিংহ এবং আসফ খান। লেখক আসফ খানের স্থানে উল্লেখ করেছেন সেলিমের নাম। যুবরাজ সেলিম ও মানসিংহ যুদ্ধ করেছিলেন ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে অমরসিংহের বিরুদ্ধে প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর। রাজপুতদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার জন্য রমেশ চন্দ্র মানসিংহকে তিরস্কার করতে ছাড়েননি।

"যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধির দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেন ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অসাধারণ চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া রোষে বলিলেন, - "কাপুরুষ! দিল্লীর দাস! দিল্লীর সৈন্য-বলে অদ্য জীবন রক্ষা পাইলে রাজপুতকুলাঙ্গার। রাজপুতগণ নিজ খড়গর উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম্ম অদ্য ভুলিলে?" মানসিংহ বহুদূরে তীব্রনয়নে সেন্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এ তিরস্কার কথা শুনিতে পাইলেন না।"[৮৪]

'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যার' সমস্ত ইতিহাসই James Tod এবং Rajasthan থেকে নেয়া। রমেশচন্দ্র দত্ত টডের অনুসরেণ বর্ণনা করেছেন ১৫৭৬ সালের হলদীঘাটের যুদ্ধ, ১৫৬৮ খ্রীঃ আকবর কর্তৃক প্রতাপসিংহের পিতা উদয়সিংহকে পরাজিত করে কিভাবে চিতোর দুর্গ অধিকার করেন। চিতোর বিজিত হওয়ার পর উদয় সিংহ মাত্র চার বৎসর জীবিত ছিলেন, প্রতাপসিং, পিতার মৃত্যুর পর জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কঠোর ব্রতাবলম্বন গ্রহণ করেছিলেন বলে লেখক উল্লেখ করেছেন- তিনি উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহের অসাধারণ বীরত্ব ও চারিত্রিক কঠোর সংকল্প ও সুদৃঢ়তার কথা তুলে ধরেছেন এইভাবে" প্রতাপসিংহের কোষে আমি লম্বমান রহিয়াছে, নিকটে তৃণ শয্যা রচিত হইয়াছে, চিতোর পুনরায় হস্তগত না করিয়া অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই ব্রত যতদিন না সিদ্ধ হয়, ততদিন সুবর্ণ রৌপী, স্পর্শ করিবেন না; জটা শ্রশ্রু বিমোচন করিবেন

না। বৃক্ষপত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবেন না; আহার, ব্যবহার বেশভুষার সামান্য দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু স্পর্শ করিবেন না; পুরাতন মুনি ঋষিগণও ইষ্টসানার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা কঠোর ব্রত ধারণ করেন নাই; জগতের বীরাগ্রগণও নিজ নিজ অভীষ্ট সাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা ভীষণ উদ্যম করে নাই।

সমগ্র ভারত ভুমির ঐশ্বয্য বীরত্ব বৃদ্ধিবল বাহুবল, অস্ত্রবল, প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে একত্রিত ইয়াছে; তাহার সংগে রাজস্থানের অসাধারণ বীরত্ব, মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রর্ভতি প্রদেশের যুদ্ধবল একত্রিত হইয়াছে। ঐ র্জিন পর্বত শিখরে যে যোদ্ধা এই নির্জ্জন অন্ধকার রজনীতে দন্ডায়মান রহিয়াছে, ওনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একাকী বুঝিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথবা স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য শেষ রণস্থলে মেওয়ারের শেষ উপত্যকায় বা পর্ব্বতাশিখরে হৃদয়ের শোনিত দিবেন, স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।"[৮৫]

প্রতাপসিংহ ও শিশোদীয়কুলের চিরস্বাধীনতাকামী মনোভাব এবং হলদিঘাটের যুদ্ধে তাদের বীরত্ব প্রদর্শনের বর্ণনায় লেখক অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেছেন- "তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধবাস্থা অপর দিকে শিমোদীয়কুলের চিরস্বাধীনতা রক্ষার প্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য ও সুশিক্ষিত সৈন্য অপরদিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব। তুমুল শব্দে দুর্দ্দসনীয় ও অপ্রতিহত রাজপুত পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; মোগল সৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ আর্জ্জুনির কথা স্মরণ করিল; মুসলমানগণ মুহূত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গনিল।"[৮৬] মানসিংহ ও অধিকসংখ্যক মুঘলবাহিনীর নিকট পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখে প্রতাপসিংহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ণ করেন। যুদ্ধে প্রতাপসিংহের পরাজয় ঘটে। এই পরাজয় সম্পর্কে লেখক বলেছে প্রতাপসিংহ পরাজয় বা বঙ্গঁদেশে প্রাচীন মোগলযোদ্ধাগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হলদীঘাট ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া সন্ধ্য বা সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিত।"[৮৭] এইভাবেই তিনি তাঁর 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাসে হিন্দু পূর্বপুরুষদের বাহুবলের বর্ণনা দিয়েছেন।

১৫৯৭ সালে প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান অমরসিংহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পিতা প্রতাপসিংহ তাঁকে আজীবন মুঘল বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে লড়াই করার উপদেশ দিয়ে যান স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থে। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি মেবারের বিরুদ্ধে পিতার অনুসৃত যুদ্ধনীতি অবলম্বন করেন। শাহাজাদা পারভেজ, মহাবত খান ও আব্দুল্লাহ খানের অধীনে সম্রাট পর পর কয়েকটি অভিযান

পরিচালনা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৬১৫ খ্রীঃ সম্রাটের তৃতীয় পুত্র খুররমের নেতৃত্বে (লেখক যাকে কুর্ম্ম বলে উল্লেখ করেছেন এবং যিনি পরবর্তীতে শাহজান নামে পরিচিতি লাভ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন) এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং অমরসিংহ পরাজিত হয়ে পুত্র কিরণসিংহ সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং পরবর্তীতে উভয়ের মধ্যে একটি সম্মানজনক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

রমেশচন্দ্র জগৎবিখ্যাত সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের গুনের কথাও উল্লেখ করেছেন। "নুরজাহানের নাম জগদ্বিখ্যাত, তিনি যেরূপ সুন্দরী ছিলেন, সেইরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন; স্বামীকে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রুফলাবণ্য ও চতুরতায় বিমোহিত করিয়া রাখিতেন; অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমগ্র ভারত বর্ষের শাসনকজার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। নুর্জিহান যুবরাজ করণকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন; খিল্লতহস্তী ঘোটক, অসি প্রভৃতি নানা দ্রব্য দান করিয়া যুবরাজের মনস্তুষ্টি করিলেন। সম্রাট ও রাজ্ঞী উভয়ে যতদূর সাধ্য যুবরাজের সম্মান করিলেন।"[৮৮]

লেখক প্রতাপসিংহের ন্যয় পুত্র অমবসিংহের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কথা উল্লেখ করেছেন। যখন শাহজাদা খুররম যখন ফরমান আনলেন যে এখন থেকে দিল্লীরশ্বরের ফরমান অনুযায়ী দেশ শাসন করতে হবে তখন তিনি তা গ্রহণ করতে পারলেন না, " প্রতাপসিংহের পুত্র পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইবেন না; অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য করিবেন না। যুবরাজ অদ্য হইতে রাজা হইলেন। সেই দিন (১৬১৬ খ্রী:) সেই দিন অমরসিংহ রাজধানী উদয়পুর ত্যাগ করিয়া নচৌকি নামক স্থানে যাইয়া আবাস করিলেন; তাহার পর পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আর রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই, রাজদন্ড হস্তে গ্রহণ করেন নাই। ১৫৬৮ খৃ: অব্দে আকবর শাহ মেওয়ার প্রথম আক্রমন করিেন চিতোর হস্তগত করেন। তাহার প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পর জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মেওয়ারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল; সমস্ত রাজস্থানে জাতীয় জীবন অবসান হইল।"[৮৯]

এইভাবে লেকক তাঁর উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন। ইতিহাসের প্রতি একনিষ্ঠ লেখক রমেশচন্দ্র তৎকালীন সময়ের রাজপুত জাতির উপর লেখা একমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ টডের রাজস্থানকে অনুসরণ করেছেন। সেখানে প্রতাপসিংহ সম্পর্কে এবং মুঘল রাজপুত সম্পর্কে যেভাবে আছে রমেশচন্দ্র দত্তও তাই লিখেছেন। তবে ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁর রাজস্থান কাহিনীতে টডের অনেক ভুলভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন "আমরা বাল্যকাল হইতে যে সমস্ত কথা অবিসংবাদী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি যথা, প্রতাপ ও শক্তিসিংহের বিরোধ কুমার মানসিংহের অপমান--- ভীলদের আশ্রয়ে স্বপরিবারে প্রতাপের গিরিগুহা বাস, দারিদ্র পীড়িত ভগ্নহাদয়ে প্রতাপের মবোর ত্যাগের

সংকল্প চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রতাপের সন্ন্যাসবৃত ও শপথ ইত্যাদি সেকালের ভাটচারনের কল্পনামূলক কাব্য নাটকের মনোরম শাখাপল্লব বলিয়া এখন আমাদের সন্দেহ হয়।"[৯০] তবে তিনি রাণা প্রতাপসিংহের বীরত্বের কথা স্বীকার করেছেন, মহারাণ প্রতাপের বীরত্ব, স্বদেশাভিমান ও স্বাধীনতার উপাসনা সীমাহীন কল্পনা প্রান্তরের সুদূর আলেযা ভ্রান্তি নহে। সমস্ত ভারতবর্ষে এতদিন মিথ্যার উপসনা করে নাই, স্তাবকের ছন্দে কালের বাতাসে মহারানা প্রতাপের মিথ্যা খ্যাতি কথায় কথায় পল্লবিত হইয়া উঠে নাই।[৯১]

উপন্যাসে লেখক ভোজ সভায় প্রতাপসিংহ রাজা মানসিংহকে অপমানের কথা উল্লেখ করেছেন। ভোজ সভায় মানসিংহ প্রতাপসিংহকে আমন্ত্রণ জানালে প্রতাপসিংহ বলেন- "তুর্কিকে যে রাজপুত ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন সম্ভবত তুর্করি সহিত যাহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রানা খাইতে পারেন না।"

এ সম্পর্কে কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন, কুমার মানসিংহ ডুঙ্গরপুর বিজয় করিয়া ঐ বৎসর (১৫৩৭ খ্রী:) আষাঢ় মাসে উদয়পুরে যাত্রা করেছিলেন। মহারাণা প্রতাফ কুম্ভলমীর (কমলমীর) হইতে উদয়পুর আসিয়া বিশিষ্ট অতিথিভাবে তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন। ইহার পর কি ঘটিয়াছিল এই সম্বন্ধে রাজপুত ও মুঘল পক্ষের বিবরণে ঘোরতর অসামঞ্জস্য দেখা যায়।[৯২]

কেন সম্রাট আকবর মেবার জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন সে সম্পর্কে কালিকারঞ্জন কানুন অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে দুরদৃষ্টিসম্পন্ন তিনি জানতেন হাড়া কচ্চবাহ, রাধোর শুধু বেতন বৃদ্ধি অবলম্বন করে মুঘল শক্তির কাছে অবনত হয়ে আছে, সুযোগ পেলেই মাথা তুলবে। সুতরাং জাতির মানসপট হতে স্বাধীনতার আদর্শ মুছে না ফেললে, রাজপুত গৌরব ও স্বাধীনতার মেষ অঙ্গিনকনা না নিভাতে পারলে তাঁর একচ্ছত্র সাম্রাজী মেবারের মুকুটমনি মোগলসিংহাসনের পাদপীট স্পর্শ না করিবে ততদিন অন্যান্য রাজপুত্রের মস্তক নত হইলেও মন নুইয়া পড়িবেনা, রাজপুত জাতির মেরুদন্ড অনমনীয় থাকিবে। এজন্যই ক্ষুদ্র মেবার জয়ের জন্য মোগল সম্রাটের এত বলবতী ইচ্ছা, এত আয়োজনের ঘটা।[৯৩]

মুঘল সম্রাটগণ বহুবার মেবার আক্রমণ করেছিলেন। জয়ও করেচিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের স্বদেশ চেতনা ও মাবারের স্বাধীনতা রক্ষার অনির্বাণ প্রদীপ শিখাকে সমূলে উৎপাটিত করতে সক্ষম হননি। 'মহারানা প্রতাপের ত্যাগ ও বীরত্বে মেবারের নৈতিক প্রবাব সমস্ত রাপপুতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের হস্তে

পরাজিত হইয়া মহারাণা সংগ্রামসিংহ রাজপুতনায় যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হারিয়েছিলেন, প্রতাপসিংহ, পঁচিশ বৎসর ভারত সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রাজপুত জাতির মনে বিলুপ্ত স্বাধীনতা স্পৃহা পুন: প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল রাজত্বের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে যে বিরাট জাগরন ঘটে তার মূলে প্রতাপের মহান আদর্শের প্রেরণা কম ছিল না। প্রতাম না জন্মালে মেবারের মহারানা রাজসিংহ জন্মাতেন কিনা সন্দেহ, রাজসিংহ না থাকলে মেবার ও মাড়ওয়ারের আওরঙ্গজেবের হিন্দু বিরোধনীতি প্রতিহত হত না। এই জন্যই রমেশচন্দ্র দত্ত 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাসে প্রতাপসিংহের ইতিহাসকে বড় করে দেখেছেন।"[৯৪]

লেখক যুবরাজ সেলিম (পরবর্তীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর) সম্পর্কে বলেছেন- 'সম্রাটপুত্র সেলীম, সুখপ্রিয় ও বিলাসী' তাহার ন্যায় বিলাসী কখনও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন নাই। ওযৌবনেই শয্যাপ্রিতা অপেক্ষা 'সুখপ্রিয়তা প্রবল হইয়াছিল। পরে এই সুখপ্রিয়তা এমন প্রবল হয় যে, নুর্জিহান ঐ রাজ্য শাসন করেন, দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বন্ধু ও অমাত্য রমনী ও মদিরা লইয়া কালযাপন করিতেন। এ সকল দোষ থাকিলেও সলীম নির্গুন ছিলেন না। উদারতা ও সরলতা সুখপ্রিতার সহিত তাঁহার তৃদয়ে সর্ব্বদাই বিরাজ করিত'। মানসিংহ সম্পর্কে বলেছেন,- মানসিংহ অসাধারণ দীসম্পন্ন, অসাধারণ স্থির প্রতিভা ও কার্যপটু, অসাধারণ যোদ্ধা, দিল্লী হইতে নির্গত হইয়া অবধি মানসিংহই সমস্তকার্য সম্পাদন করিতেন। সলীম মানসিংহের উপরই নির্ভর করিবেন।[৯৫] মানসিংহ সম্পর্কে লেখকের দুঃখ একটি 'হায় জাতি বিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই। জাতি বিরোধের জন্য অদ্য রাজপুত কুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু।'

আকবর জাহাঙ্গীর, খুররম কুর্ম্ম, ইদয়সিংহ, প্রতাপসিংহ, অমরসিংহ, ও মানসিংহ প্রভৃতি চরিত্র ছাড়া এ উপন্যাসে, দুর্জয়সিংহ তেজাসিংহও পুস্কাকুমারীর চরিত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসে বৈচিত্রহীনভাবে তেজাসিংহ ও পুষকুমারীর প্রণয় কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে। রাজপুতদের গৃহবিবাদের চিত্রও চিত্রিত হয়েছে। যেমন রাধোরকুলের তেজাসিংহ ও চন্দ্রাওয়াৎকুলের দুর্জযসিংহের মধ্যের বিবাদ। এ সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন- 'জীবন-সন্ধায় তেজাসিংহ দুর্জয়সিয়হের মধ্যে একটা বংশগত চির-বিরোধ, প্রতাপসিংহের অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, ও তাঁহার সামন্তগনের অবিচলিত প্রভূবক্তি ইউরোপের মধ্যযুগের Feudalism এর সহিত ভারতের বীরযুগের একটা গভীর ভাবগত ঐক্যর সাক্ষ্য প্রদান করে।"[৯৬] যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক শাধ্য ষড়যন্ত্র দুঃসাহসিক অভিযান, বীরত্ব আত্মত্যাগ প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার 'জীবন-প্রভাত' ও ;জীবন-সন্ধ্যাতে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যদিয়ে বর্ণাঢ্যময় বর্ণনার সাহায্যে উপস্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসের সংগে আছে প্রবল স্বদেশ চেতনার সুর।[৯৭] সবশেষে অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়- ইতিহাসের ঘনঘটা, রোমান্সের ঐশ্বর্য এবং

পারিবারিক ঘটনার স্নিগ্ধ বর্ণনাকে এক সূত্রে মিলিয়ে দিয়ে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক রোমান্সের বঙ্কিমচন্দে সমকক্ষ না হলেও, প্রায় অনুরূপ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেই জন্য বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাঁর স্থান সকলেই স্বীকার করে থাকেন।"[৯৮]

রাজপুত বীরত্বের ইতিহাসে উদয়সিংহের পুত্র রানা প্রতাপসিংহের নাম চীর স্মরণীয় হয়ে আছে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর প্রতাপ সিংহ স্বোরের স্বাধীনতা রক্ষার্থে ও রাজপুতদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে মৃর্ত্যুকে উপেক্ষা করে সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং বীরত্বের সাথে মৃত্যুবরণ করেন। রাজপুতদের অনেকেই বশ্যতা স্বীকার করলেও রাজ্যহীন, সম্পদহীন অবস্থায়ও রাণা প্রতাপ মুঘল শক্তির নিকট মাথা নত করেন নাই। এজন্যই রাজপুত বীরত্বের ইতিহাসে রানা প্রতাপ সিংহের নাম স্বর্ণাক্ষরের লেখা আছে। প্রতাপসিংহের বীরত্বের ইতিহাস, তাঁর আত্ম-মর্যাদাবোধ, আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতাস্পৃহা লেখককে মুগ্ধ করেছে, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাই তো রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর রাজপুত জীবনসন্ধ্যা উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে রানা সিংহকে চিত্রিত করেছেন। যা উনিশ শতকের ইতিহাস চেতনা ও যুগ-চেতনার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।

Z_¨wb‡'k

৩১। রমেশ-রচনাসম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত,মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৯

৪২। রমেশ-রচনাসম্ভার,পূর্বোক্ত,

৮৩। বঙ্গবিজেতা পৃঃ ১২০, ১২১

৯৪। পূর্বোক্ত

১০৫। পূর্বোক্ত পৃঃ ১৮৩

১১৬। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ৪৯ (প্রকাশক রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, বি.এ. মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

১২৭। বঙ্গঁবিজেতা পৃঃ ২৭১

১৩৮। Charles Stewart, - History of Bengal - 1st end 1813, P. 172

১৪৯। Sir Jadonath Sarkar, The History of Bengal, vol. 11, P. 198-199

১৫১০। আবদুল করিম,বাংলার ইতিহাস মোগল আমল, প্রকাশক- জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্যারিদাস রোড, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯২, পৃ. ১৬০-১৬১

১৬১১। দিলওয়ার হোসেন, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, পৃঃ ৩২৫ – (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ)

১৭১২। আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

১৮১৩। আকবরনামা

১৯১৪। সতীশন্দ্র মিত্র যশোর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৩১, উদ্ধৃত দেলোয়ার হোসেন

২০১৫। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

২১১৬। মাধবীবঙ্কণ - পৃ: ২১

২২১৭। পূর্বোক্ত - পৃ: ২৩

২৩১৮। এ. কে. এম. আবদুল আলীম, প্রকাশক- মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৬৯, পৃ. ২৫৮।

২৪১৯। মাধবীকঙ্কণ- নবম পরিচ্ছেদ।

২৫২০। R. C. Majumdar, H. C. Ray Chaudhuri and Kalikinkar Datta – An Advanced History of India, Fourth Edition – Published – S. G. Wasani for MacMillan, India Limited, P. 474-478

২৬২১। মাধবী কঙ্কন - পৃ ৮৩-৮৪

২৭২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

২৮২৩। ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ, এ শর্ট হিষ্ট্রি অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৪৪৩

২৯২৪। মাধবীকঙ্কন, পূর্বোক্ত, পৃ, ২০-২১

৩০২৫। পূর্বোক্ত - পৃ: ২৭

৩১২৬। পূর্বোক্ত - পৃ: ৪৭

৩২২৭। পূর্বোক্ত - পৃ: ৪৭

৩৩২৮। পূর্বোক্ত - পৃ: ২৩

৩৪২৯। পূর্বোক্ত - পৃ: ২৬

৩৫৩০। পূর্বোক্ত - পৃ: ২৬

৩৫.১৩১। দিলওয়ার হোসেন, evsjv Dcb¨v‡m gNj B wZnv‡mi e¨envi, পৃ: ৩৩৫

৩৬৩২। মাধবীকঙ্কন - পৃ: ৬০

৩৭৩৩। পূর্বোক্ত - পৃ: ৮৫

৩৮৩৪। পূর্বোক্ত - পৃ: ৮৯

৩৯৩৫। পূর্বোক্ত - পৃ: ৯২

৪০৩৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, e½mvwn‡Z¨ Dcb¨‡mi aviv, পৃ: ৫১

৪১৩৭। পূর্বোক্ত - পৃ: ৫৮

৪২৩৮। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, fviZe‡li BwZnvm, পৃ. ১২২-১৩৯, প্রকাশক- পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

৪৩৩৯। James Grant Duff, ***A History of Maharattar***

৪৪৪০। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'

৪৫৪১। পূর্বোক্ত -পৃ: ৪৩৫

৪৬৪২। পূর্বোক্ত - পৃ:

৪৭৪৩। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ: ৪৩৬

৪৮৪৪। এ. কে. এম আবদুল আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৪৯৪৫। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ: ৪৩৫

৫০৪৬। পূর্বোক্ত - পৃ: ৪৩৬

৫১৪৭। পূর্বোক্ত - পৃ: ৪৩৭

৫২৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩৭

৫৩৪৯। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ:

৫৪৫০। অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, evsjv mvwn‡Z¨i m¤úY BwZeË (cvÁv), পৃ: ৫৫০

৫৫৫১। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, fviZe‡li BwZnvm, পৃ: ১৩৩, ১৩৪

৫৬৫২। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৬

৫৭৫৩। পূর্বোক্ত, পৃ:

৫৮৫৪। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ: ৪৯৪

৫৯৫৫। পূর্বোক্ত, পৃ:

৬০৫৬। কে আলী, fvivxq Dcgnv‡'‡ki BwZnvm, পৃ: ২৬৩

৬১৫৭। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ: ৪৫৯

৬২৫৮। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ: ৪৫৯

৬৩৫৯। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ:

৬৪৬০। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ:

৬৫৬১। পূর্বোক্ত, জীবন প্রভাত, পৃ: ৪৭৩

৬৬৬২। পূর্বোক্ত, জীবন প্রভাত, পৃ: ৪৬৬

৬৭৬২.১। দিলওয়ার হোসেন, evsjv Dcb¨v‡m gNj BwZnv‡mi aviv, পৃ: ৩৪৯

৬৮৬৩। পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৫১

৬৯৬৪। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ: ৫৬২

৭০৬৫। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

৭১৬৬। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

৭২৬৭। এ. কে. এম. আবদুল আলীম, fvi‡Z gmwjg ivR‡Zi BZnvm miKvi, শট হিষ্ট্রি, পৃ: ১৫৭। ইলিয়াট আন্তজ্ঞান, সপ্তম খন্ড, পৃ: ২৯৬

৭৩৬৮। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ: ৫৪৮

৭৪৬৯। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভা', পৃ: ৫৪৯

৭৫৭০। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ: ৫৪৯

৭৬৭১। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', পৃ: ৫৫০

৭৭৭২। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, fvivZe‡li BwZnvm, পৃ: ১৩৪

৭৮৭৩। দিলওয়ার হোসেন, evsjv Dcb¨v‡m gNj BwZnv‡mi aviv, পৃ: ৩৫৮

৭৯৭৪। এ. কে. এম আব্দুল আলীম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৬

৮০৭৫। কালিকারঞ্জন কানুনগো, ivR¯vb Kwnbx, পৃ: ৪

৮১৭৬। এ. কে. এম আব্দূল আলীম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৭

৮২৭৭। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫০

৮৩৭৮। এ. কে. এম আব্দুল আলীম, পূর্বোক্ত পৃ: ২৩৫

৮৪৭৯। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা', পৃ: ৩৪১

৮৫৮০। পুর্বোক্ত, পৃ: ৩৪১

৮৬৮১। সপ্তম পরিচ্ছেদ (জীবন সন্ধ্যা)

৮৭৮২। রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, পৃ: ৩৪৪

৮৮৮৩। পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩০

৮৯৮৪। পূর্বোক্ত, পৃ:

৯০৮৫। কালিকারঞ্জন কানুনগো, পূর্বোক্ত, পৃ: ২

৯১৮৬। কালিকারঞ্জন কানুনগো, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩

৯২৮৭। রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, পৃঃ ৩৪০

৯৩৮৮। কালিকারঞ্জন কানুনগো, পৃঃ ৭

৯৪৮৯। দিলওয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৪

৯৫৯০। রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৯৬৯১। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫৭

৯৭৯২। অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪৯

৯৮৯৩। অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪৯

তথ্য নির্দেশ ঃ

১ক) রমেশ রচনাবলী

২খ) পূর্বোক্ত

৫গ) পূর্বোক্ত

৬ঘ) Ramesh Chandra Dutt – Open letters to Lord Curzon and speeches and papers, Calcutta, 1904, p. 150, উদ্ধৃত, অশোক কুমার দে, বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, ১৯৭৪, পৃ. ১৭৫।

৭ঙ) নিখিল সেন, রমেশচন্দ্র দত্তঃ প্রবন্ধ সংকলন, উদ্ধৃত ড. সুনীল সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী কলিকাতা-৬, ১৩৭৬, পৃ. ৮

PZ_ Aa¨vq

e¼gP‡›‘i Dcb¨v‡m BwZnvm‡PZbv

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সামাজিক উপন্যাসের অভাব না থাকলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাধান্য ছিল। কৃতি ঔপন্যাসিকরা ঐতিহাসিক ঘটনার সংমিশ্রণে সুখপাঠ্য উপন্যাস রচনা করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ঐতিহাসিক ঘটনাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে কয়জন ঔপন্যাসিক, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

শৈশবকাল থেকেই ইতিহাসের প্রতি তাঁর ঐকান্তিকতা ছিল এবং পরে বিভিন্ন ইংরেজ লেখকদের লেখাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি স্যার ওয়ালটার স্কটের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্কট পাঠককে আবিষ্ট করে রাখার মতো প্লট রচনা করতে পারতেন যা বঙ্কিমচন্দ্রকে অবশ্যই আকর্ষণ করেছিল। স্কটই তাঁকে জটিল বিন্যস্ত প্লট রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু বঙ্কিম আরও এগিয়ে গিয়েছিলন। নিছক ঘটনা বিন্যাসকে তিনি ভাবগম্ভীর সুক্ষ্ম শৈল্পিক উৎকর্ষের স্তরে উন্নীত করতে সফল হয়েছিলেন। বঙ্কিমের মতো উচ্চস্তরের সাহিত্য-প্রতিভার পক্ষেই ইতিহাসের শুষ্ক কঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব ছিল। জটিল ঘটনার জাল বুনে, সেইসঙ্গে গভীর মানবিক ট্রাজেডির চকিত উদভাবে তিনি ইতিহাসের ঘটনাকে জীবনের চালচিত্রে রূপান্তরিত করেন।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যজীবন শুরু করেন তখন তিনি ভারতবর্ষ ও বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য জানতেন না। তাই তখনকার দিনের উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ স্টুয়ার্টের 'History of Bengal' (১৮১৩) এবং মার্শম্যানের 'Outline of the History of Bengal' (১৮৩৯) এর উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। বিশেষ করে

'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' ও 'সীতারামে'র কাহিনীর উপকরণ তিনি স্টুয়ার্টের বই থেকেই পেয়েছিলেন। যেহেতু তখন এটিই ছিল একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ, সে জন্যই অন্যান্য উপন্যাস রচনার সময়েও এই গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন।[২]

মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তিনি অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। উপন্যাসগুলো বাংলার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কেবলমাত্র 'রাজসিংহ' এর ব্যতিক্রম। মুঘল হারেম, রাজপুতদের জীবন ও চরিত্র, ষোড়শ শতাব্দীর দিল্লি প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র অভূতপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো হচ্ছে দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) রাজসিংহ (১৮৮২) সীতারাম (১৮৮৭) ও আনন্দমঠ লেখকের মতে কেবল রাজসিংহই প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। অন্যগুলি অনৈতিহাসিক, অর্ধঐতিহাসিক। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস খোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়। 'বাঙ্গালী জাতির মুক্তি কোন পথে ও কিভাভে এ চিন্তা বঙ্কিম-মানসের উৎসমূলে নাড়া দিয়েছিল। এই মুক্তির পথ ইতিহাস বোধের সামগ্রিক চেতনাতেই সম্ভব- একথা বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন। সেজন্য ইতিহাসে গৌরবোজ্জল অতীতকে তিনি বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।[৩]

আবার ভবতোষ দত্ত লিখেছেন- বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন অতীতের ইতিহাসকে স্পষ্ট করবার জন্য নয়। তাঁর আসল বক্তব্য ইতিহাস নয় নরনারীর প্রেম। বিষয়টা অবশ্যই অভিনব বা মৌলিক নয়। কিন্তু ইতিহাসের পটভূমিতে প্রেম কাহিনী স্থাপন নতুন। ইংরেজি নাটকে উপন্যাসে এর দৃষ্টান্ত আছে। বাংলা সাহিত্যে ছিল না। ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' অবশ্য বঙ্কিমের আগেই লেখা। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নরবারীর প্রেমকে স্বাভাবিক ও সঙ্গত করে অর্থবহ করে তুলতে বঙ্কিমই পেরেছিলেন। রূপকথার গল্পেও তো রাজকুমার-রাজকুমারীর প্রেমের বিষয় ছিল, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ আলাদা স্তরের সৃষ্টি। মানুষের জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা দ্বন্দ্ব সঙ্কট সংশয় তার মধ্যে ছিল না। এই গভীরতা নিয়ে আসবার অন্যতম উপাদান হিসাবে বঙ্কিম ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন। ইতিহাসের মানুষও বাস্তব মানুষ। তাদের আচরণ বিচরণও ঘটনার কার্যকারণে বদ্ধ। বঙ্কিম ইতিহাসের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থেকে কল্পনার প্রেমও ইতিহাসের বাস্তবকে একসংগে যোগ করে দিয়েছেন। ঘটনার কার্যকারণে বদ্ধ। বঙ্কিম ইতিহাসের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থেকে কল্পনার প্রেমও ইতিহাসের বাস্তবকে একসংগে যোগ করে দিয়েছেন।[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদানকে দুইভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের ব্যবহার করে রোমান্সের জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যেমন- দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, ও চন্দ্রশেখর

এই পর্যায়ের উপন্যাস। একে বিশুদ্ধ শিল্প বলা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম উপন্যাসে সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ চেতনাকে তুলে ধরেছেন পাঠক মনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

বঙ্কিচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে; রচনাকাল ১৮৬২-১৮৬৪ সাল। দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনী উৎস সম্পর্কে বলা হয়, মুঘলবাদশা আকবরের রাজত্বকালে বাংলার গড়মান্দারণ নামক স্থানে সংঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি এই উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কণিষ্ঠ ভ্রাতা সহোদর পূর্ণচজন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনায় জানা যায় যে, এই ঘটনা তিনি শুনেছিলেন একশত আট বৎসর বয়স্ক তাঁর খুল্লপিতামহের কাছ থেকে।

মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মাঝামাঝি অবস্থিত। মান্দারণের ঘটনাটি ঐ অঞ্চলের লোকমুখে কিংবদন্তির মতো প্রচলিত ছিল। মান্দারণ জমিদারের গড় ও সুবৃহৎ প্রাসাদপুরীর ভগ্নাবশেষ সেই সময়ও বর্তমান ছিল। প্রচলিত ছিল যে, উড়িষ্যা থেকে পাঠানরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরি লুট করে এবং সস্ত্রীক জমিদারও তাঁর কন্যাকে বন্দি করে নিয়ে যায়। রাজপুত বীর কুমার জগৎসিংহ তাঁদের উদ্ধার করতে গিয়ে বন্দি হন। আঠার-উনিশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র এই গল্প শুনেছিলেন এবং তার কয়েক বৎসর পর তিনি এই প্রচলিত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে দুর্গেশনন্দিনী রচনা করেন।

পাঠান-মুঘল সংঘর্ষ, এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। পাঠান শাসক দাউদ খানকে পরাজিত করে সম্রাট আকবরের সময় মুঘলরা বাংলা দখল করে নেয়। এরপর হতে বাংলায় মুঘল ও পাঠান দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এমনি একজন বিদ্রোহী পাঠান হলেন কতলু খাঁ যাঁর বাংলায় তৎপরতা রয়ে যায় এবং তিনি উড়িষ্যা ও মেদেনীপুর অধিকার করেন। এই বিদ্রোহী পাঠান বীর কুতলু খাঁকে দমন করার জন্য দিল্লীশ্বর আজিম খাঁ ও শাহবাজ খাঁকে পাঠান। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হলে রাজপুত বীর মানসিংহকে পাঠানো হয় তার ৪ জন পুত্রসহ। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন জগৎ সিং, যিনি এই উপন্যাসের নায়ক।

দর্গেশনন্দিনীর কাহিনী কাঠামো নিম্নরূপ-

এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে শৈলম্বর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে তিলোত্তমা ও তাঁর সঙ্গিনী বিমলা আটকা পড়ে। তিরোত্তমা গড়েমানাদারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা। এই দুর্যোগের মুহূর্তে রাজপুত বীর সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহও আশ্রয়ের সন্ধানে সেখানে এসে উপস্থিত হন। এখানে তিলোত্তমাও জগৎসিংহের পরিচয় এবং প্রণয়ের সূত্রপাত এক পক্ষকাল পর জগৎসিংহের সাথে তিলোত্তমার সাক্ষাতের জন্য জগৎসিংহকে বিমলা পরিকল্পনানুযায়ী গুপ্তপথে দুর্গের মধ্যে নিয়ে যায়। বিমলা একাজে পারদর্শিতার পরিচয় দিলেও অসাবধানতাবশত দুর্গের গুপ্তপথের মুখ বন্ধ করে আসতে ভুলে যায়। তখন মুঘল ও পাঠানদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছিল। জগৎসিংহ ছিলেন পাঠান সর্দার কতলু খাঁকে দমন করতে বঙ্গদেশে আসা মানসিংহের পুত্র।

বিমলা যে গুপ্তপথের দ্বার বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল, সেপথ দিয়েই কতলু খাঁর ভাতুষ্পুত্র পাঠান সেনাপতি ওসমানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে এবং গড়মান্দারণ অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহ তাঁর কন্যা তিলোত্তমাও বিমলাকে বন্দী করে। জগৎসিংহ পাঠানদের এই আচরণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যদিও জগৎসিংহ ওসমানকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু একসময় অসংখ্য পাঠান সেনা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলে পাঠানদের হাতে আহত অবস্থায় বন্দী হন তিনি। উপন্যাসে প্রথমখণ্ডের কাহিনী কাঠামো এমন।

দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে আয়শা, জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেমকাহিনী যেখানে ইতিহাসের তুলনায় রোমাঞ্চের ভাগই বেশী। দ্বিতীয় খণ্ডের শুরু আহত ও ধৃত জগৎসিংহকে দিয়ে, যাকে উদারমনা পাঠান সেনাপতি ওসমান খান বন্দি করেন এবং তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বন্দী জগৎসিংহের শুশ্রুষার দায়িত্ব নেন কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা। এই উপন্যাসে এইভাবেই আয়েশার আবির্ভাব ঘটে। যার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনি আয়েশা।" এই সেবা শুশ্রুষার পরিবেশে উভয়ের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ কারণে ওসমান খানের ভালবাসাকে আয়েশা প্রত্যাখ্যান করে। অপরদিকে মুঘলদের পক্ষাবলম্বন করার অপরাধে বীরেন্দ্র সিংহকে পাঠান নেতা কতলূখাঁর আদেশে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্ত্রী বিমলাকে প্রতিশোধ নিতে বলে যান। বিমলা প্রথমদিকে পরিচারিকা রূপে অবস্থা করলেও পরে তিনি নিজেকে বিরেন্দ্র সিংহের স্ত্রী বলে দাবি করেন।

এদিকে আয়েশা ক্রমশ জগৎসিংহের প্রতি প্রণয়াশক্ত হয়ে পড়ে, যা ছিল একান্তই অন্তর্মূখী, প্রণয়ের বিহঃপ্রকাশ কখনো ঘটেনি। কেবল একদিন তার এই ভালবাসা নিয়ে ওসমান তিরস্কার করলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে জগৎসিংহের সামনে তাঁর হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করেন এই বলে "এই বিন্দই আমার প্রাণেশ্বর।"

অন্যদিকে সে জগৎসিংহ তিলোত্তমার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, সেই তিলোত্তমাকে তিনি রূঢ় বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন, কতলু খাঁর উপপত্নী হয়েছেন এই সন্দেহে। এদিকে বিমলার প্রতীক্ষিত দিন চলে আসে কতলুখাঁর জন-সবকে কেন্দ্র করে। উৎসব নৃত্যগীত করতে আসা বিমলা লুকিয়ে রাখা ছুরি দ্বারা কতলু খাঁকে আহত করে এবং তিলোত্তমাকে নিয়ে দুর্গ হতে পলায়ন করে সন্যাসী অভিরাম স্বামীর নিকট আশ্রয় নেয়। এদিকে কতলু খাঁ মৃত্যুর পূর্বে জগৎসিংহকে ঢেকে সন্ধিদর প্রস্তাবদানপূর্বক তাঁকে মুক্ত করে দেন। তিলোত্তমা জগৎসিংহের দুর্ব্যবহারে মর্মাহত হন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমেই সেই অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করলে অভিরাম স্বামী জগৎসিংহকে ডেকে পাঠান এবং জগৎসিংহের ভুল ভেঙ্গে দেন। পরে জগৎসিংহের সেবায় তিলোত্তমা আরোগ্য লাভ করলে উভয়কে গড়মান্দারণে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেন। অপরদিকে আয়েশা তাঁর মনের ভাব গোপন রেখে বিয়েতে নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে আসেন এবং তিলোত্তমাকে বহু মূল্যবান উপহার প্রদান করেন। ফিরে গিয়ে তিনি অঙ্গুরীতে রক্ষিত বিষপানে আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু পরে সেই মতের পরিবর্তন করে নারী হৃদয়ের অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। Charless John Stewart এর 'History of Bengal' থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। যদুনাথ সরকার দুর্গেশনান্দিনীর ঐতিহাসিকতা, ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা, প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণে (১৩৪৫ বঙ্গাব্দে)। তিনি বলেছেন, 'দুর্গেশনান্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস এবং বঙ্গসাহিত্যে প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। যদিও উপন্যাসিক নিজেও 'দুর্গেশনন্দিনীকে' যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করেন না।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রেমের উপন্যাস হলেও এর পটভূমিকায় রয়েছে মুঘল-পাঠানের যুদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে না করলেও ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে। শুধু যে ইতিহাসের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তাই নয় মোঘল-পাঠান ও হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের চিত্র একে ব্যক্তিগত কাহিনীকে ইতিহাসের বিশালতা দান করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম উপন্যাসে এই সময়কার ঘটনাকে নির্বাচন করার কারণ সম্ভবত তিনিসেই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর পাঠান শাসনকে বাংলার আদর্শ যুগ বলে মনে করতেন। সুতরাং এই সময়কার ইতিহাস যে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে সর্বপ্রথম আলোড়িত করবে সেটাই স্বাভাবিক।[৫]

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৫৭– খ্রীঃ)। ব্যক্তিগত জীবনে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্প্রীতির ভাব বজায় থাকায় সমালোচকরা মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র খানিকটা অঙ্গুরীয় বিনিময় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সুকুমার সেন মনে করেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাস হিসাবে সম্পূর্ণাঙ্গ, যদিও আকারে ক্ষুদ্র। কতকটা ইহারই আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনী ফাঁদিয়াছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনীর' কোন কোন ভূমিকায় 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' কোন কোন চরিত্রের ছাড়া পড়িয়াছে।[৬] শিবাজীর সঙ্গে জগৎসিংহের বা ওসমানের কোন মিল নাই বটে, তবে আয়েশা সিঃসন্দেহে রোসেনারার আদর্শে গঠিত। রামদাস স্বামীও অভিরাম স্বামীর আদর্শ। উভয় নায়িকার অঙ্গুরীয় কাহিনীকে ঘুরাইছে।[৭]

'On the Origin of Hindu Festivals' লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ স্বীকার করেছেন। 'Other festivals clearly have an astronomical origin, and are mere representatives of essential phenomena. I shall advert here to some ingenous hints, for which I am indebted to a paper by Babu Bhubeb Mukharji.'[৮]

তবে নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার সারমর্ম অতীতের যে কোন ঔপন্যাসিকের তুলনায় বাংলা গদ্য-শৈলীর উৎকর্ষ সাধন করেছে। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুঘলদের বাংলায় আগমন ও পাঠান-মুঘল সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে লিখিত 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, 'আমি পূর্ব্বে ('রাজসিংহ' উপন্যাস রচনার পূর্বে) কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস (রাজসিংহ) লিখিলাম। এই পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই তাহা বলা বাহুল্য।'[৯] পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করার কারণ- তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন, স্টুপর্ট কর্তৃক যে 'হিষ্টরী অব বেঙ্গল' দুর্গেশনন্দিনীর অবলম্বন তা প্রকৃত ইতিহাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, মার্শমান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি, সে কেবল সাধ-পূরাণ মাত্র।[১০] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে যাই বলুন না

কেন- 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হওয়ার পর বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে আলোড়ন পড়ে যায়। পত্র পত্রিকায় অভিনন্দন ও প্রশংসার বাণী প্রচারিত হয়। বিখ্যাত লেখক ও সমালোচকগণও এর বয়সী প্রশংসা করেন।

ইহিহাস প্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ইতিহাসবোধ ছিল প্রখর। বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস লিখিত না হওয়ায় তাঁর মধ্যে দুঃখবোধ কাজ করত- তাই তিনি লিখেছেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালী কখোনো মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। যে বাঙালীরা মনে জানে যে আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল-অসার, আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের পূর্ব গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল অসার গৌরব শূন্য বিন্ন অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না- চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না । কোন দুর্ব্বল অসার গৌরব শূণ্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে? সেই সারকথা কোথা পাইব, বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস। কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিত্র মাত্র।

বাংলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই? আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করি।[১১] ইতিহাস চেতনায় তাঁর এই বাঙ্গালীত্ববোধ থেকেই তিনি তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মে বাঙ্গালীর প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং এই ধারা তাঁর উপন্যাসগুলিতেও প্রবাহিত হয়েছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' মুঘল পাঠান দ্বন্দ্বকে এক ক্ষুদ্রাংশ নিয়ে লিখিত উপন্যাস। প্রশ্ন এসে যায় প্রথম উপন্যাস তিনি কেন সামাজিক ঘটনার পরিবর্তে ঐতিহাসিক বা ইতিহাস অন্তর্গত ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন? এর কারণ হিসাবে বলা যায় সামাজিক ঘটনা অনেকটা সরল রৈখিক আর ইতিহাসের ঘটনায় জীব বৈচিত্র, চরিত্র বৈচিত্র ও নাটকীয়তা। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে ইতিহাসকে উপকরণ করার পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে। মুঘল ইতিহাস যেহেতু ভারত ইতিহাসের নিকটতম উপাদান এবং সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব সংঘাতের বৈচিত্র্যে ঘটনাবহুল সেকারণেই তিনি তাঁর প্রায় উপন্যাসে মুঘল ইতিহাস ব্যবহার করেছেন এবং পাঠক নন্দিত হয়েছেন। যদিও

চরিত্রগুলো ইতিহাসের তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের আচার-আচরণ, উচ্চারণ, প্রেম-ঘৃণা দ্রোহ প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দের নিজস্ব। দুর্গেশনন্দিনীতে এর ধারা পরিলক্ষিত হয়।

উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে মুঘল ইতহাসের ঘটনার আবির্ভাব ঘটেছে এবং এখানে জগৎসিংহের পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। জগৎসিংহ রাজপুর কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তর মধ্যে একাকী গমন করিতেছেন, তৎপরিচয় উপলক্ষে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজীয় গটনা কতক কতক সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচ্ছেদ ইতিবৃত্ত সম্পর্কিয়। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থাগারের পরামর্শ এই যে অধৈর্য ভাল নহে।[১২]

এরপর তিনি মুঘলদেব বাংলা বিজয়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়, এরপর মুসলমানদের কয়েক শতাব্দীকাল রাজ্য শাসন ও ১৫২৬ খ্রীঃ (৯৭২ বঙ্গাব্দে) মুঘল সম্রাট বাবরের দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তখন ও বঙ্গদেশ মুঘলদের অধীকারে আসেনি। সম্রাট আকবরের সময় করবাণী বংশের শাসক দাউদ খান সম্রাট আকবরের আনুগত্য অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে সম্রাট মুনিম খানকে প্রেরণ করলে দাউদ খান পরাজিত হয়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করলে বঙ্গদেশে মুঘলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে বঙ্গদেশের জনগণ পাঠান নেতা কতলু খাঁর নেতৃত্বে উড়িষ্যাও মেদিনীপুর পুনরায় অদিকার করে। তাদের দমন করার জন্য সম্রাট আকবর আজিম খাঁ, শাহবাজ খাঁকে প্রেরণ করলে তারা ব্যর্থ হন। এবং পরবর্তীতে রাজপুত বীর মানসিংহকে বাংলার সুবেদার করে পাঠান। এবং মানসিংহ তার পুত্র জগৎসিংহ দুর্জনসিংহ ও শক্তি সিংহকে নিয়ে বাংলায় আসেন। এই জগৎসিংহ হচ্ছেন দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের নায়ক। এটুকুই ইতিহাসের উপাদান আর বাকি অংশ জগৎসিংহ তিলোত্তম আয়েশা ও বিমলার প্রেম কাহিনী। এভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম 'দুর্গেশনন্দিনী'তে উপন্যাসে ইতিহাসও রোমান্সের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

তবে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির অংশের আরও বিশদ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে কররামী বংশের শেষ শাসক। দাউদ খানকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। যদিও আফগান ও বার ভূঁইয়াদের প্রতিরোধের মুখে বাংলায় পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার ঘটাতে পারেননি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সুবেদার ইসলাম খান বাংলার বিদ্রোহী আফগান ও বার ভূঁইয়াদের দমনের মাধ্যমে বাংলায় মুঘল আধিপত্যের

বিস্তার ঘটান। যাই হোক সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের নায়ক ছিলেন মূলত মুনিম খান, রাজা টোডরমল ও খান-ই-জাহান।

মানসিংহের আগমন ঘটে আরও পরে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খানকে পরাজিত করে বাংলায় মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও আফগান ও বারভূঁইয়াদের বাঁধার কারণে প্রকৃত আধিপত্য লাভে সময় লেগেছিল ২০ বৎসর (১৫৭৬-৯৬)। সম্রাট আকবর এই ২০ বৎসর বাংলায় আধিপত্য স্থাপনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালান।[১৩] এই সময়ই ১৫৯৪ খ্রীঃ বাংলায় রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলার সবেদার নিযুক্ত করেন। বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করার পর রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা অভিযানের আয়োজন করেন। পশ্চিম ও পূর্বদিক থেকে উড়িষ্যা অভিযান শুরু হয়। আকস্মিকভাবে বর্ষা শুরু হলে যুদ্ধ স্থগিত থাকে। বিদ্রোহী আফগান বতলু খান লোহানী (উড়িষ্যার শাসক) এ সুযোগ গ্রহণ করে মুঘলবাহিনী বিধ্বস্ত করতে লাগলেন। মানসিংহরে পুত্র জগৎসিংহকে গড় মান্দারণে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি বিষ্ণুপুরে বন্দী হন। ইতিমধ্যে কুতলু খানের মৃত্যু হলে কুতলূ খানের শিশুপুত্রের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী খাজা ঈসা মুঘলবাহিনীর সাথে সন্ধি প্রার্থনা করেন এবং মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যমে কুতলু খানের শিশুপুত্র উড়িষ্যার শাসনকর্তার পদ লাভ করে।[১৪]

এরপর রাজা মানসিংহ তাঁর দুইপুত্র দুর্জন সিংহ ও শক্তিসিংহের সহায়তায় ঈশা খাঁর সাথে সন্ধি, কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ ও ভুষণার জমিদার কেদার রায়কে পরাস্ত করেন। এভাবে দুই পর্যায়ে ১৬০৪ খ্রী: পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে বাংলা শাসন করেন। পিতার ন্যায় দুর্জনসিংহ ও শক্তিসিংহ বীরযোদ্ধা ছিলেন এবং তারা বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁদের পিতা রাজা মানসিংহকে সহায়তা করেন। উভয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তবে মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎসিংহ সম্পর্কে বলা হয় যে তিনিও অকাল মৃত্যুর স্বীকার হন অধিক মদ্য পানের ফলে।[১৫] অর্থাৎ জগৎসিংহকে যতটা নিস্কলুস চরিত্রের অধিকারী হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে মূলত ততখানি তিনি ছিলেন না। এ সম্পর্কে যদুনাথ সরকার রসিকতা করে বলেন "কোথাও তিলোত্তমা যদি সত্য জগৎসিংহকে বিবাহ করিতেন তবে তাহার কপালে অকাল বৈধব্য লেখা ছিল। কারণ কুমার জগৎসিংহ অল্প বয়সে (১৫৯৯ খ্রী:) অতিমাত্রা মদ খাইয়া মারা যান।"[১৬]

উপন্যাসে বর্ণিত মাসুম খা কাবুলী ও ঐতিহাসিক চরিত্র। মাসুম খান কাবুলী ছিলেন আকবরের সেনাপতি। আকবরের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের মুঘল অফিসারেরা বিদ্রোহ করলে মাসুম খান কাবুলী বিদ্রোহীদের একজন নেতা ছিলেন। আকবর বিদ্রোহ দমন করেন কিন্তু মাসুম খান কাবুলী আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেননি। তিনি ঈশা খা মসনদ-ই-

আলার সঙ্গে এক যোগে মুঘলদের বিরোধিতা করেন এবং আমরণ যুদ্ধ করে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।[১৭]

আবদুল করিম তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বার ভূঁইয়া পরিচিতিতে ওসমান খানকে বাংলার বারভূঁইয়াদের একজন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবে তিনি খাজা ওসমান হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন উড়িষ্যার কতলু খান লোহানীর ভাই ও মন্ত্রী ঈশা খান মিয়াকেলের পুত্র। আকবরের সময় রাজা মানসিংহ উড়িষ্যার আফগানদের পরাস্ত করে ওসমনা ও তাঁর ভাইদের (সোলায়মকান, ওয়ালী, মাসহী ও ইব্রাহিম) বাংলায় নির্বাসন দেন। ওসমান সাতগাঁও ভূষণা ঘুরে ময়মনসিংহের গৌরীপুর বুকাই নগরে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। জাহাঙ্গীরের সময় তিনি পরাজিত ও নিহত হন।[১৮] পর্যাপ্ত গবেষণাধর্মী ইতিহাসগ্রন্থের অভাবহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনায় অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। যদুনাথ সরকার পরবর্তীতে সেইসব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তাঁর দুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকা নামক গ্রন্থে অর্থাৎ এর ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু এবং কল্পনার সৃষ্টি কতখানি তা নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে বঙ্কিম পদে পদে ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিয়া এটাকে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ও প্রাযশঃ সত্য ইতিহাস হইতে লওয়া এবং সেই যুগের উপযোগী চরিত্র ও ভাব দিয়া সাজাইয়া তাহাদের খাড়া করা হইয়াছে। এমন কি মানসিংহের বহুনারী বল্লভত্ব, রাজপুত সম্ভ্রান্ত ঘরে নিম্নজাতীয়া বাদী রাখা বঙ্গে মানসিংহের প্রতিনিধির অতুলনীয় বীরত্ব এবং অধিক সংখ্যক পাঠান সেনার পরাজয়, দুর্গমধ্যে অত্যাচার ও খুন- এসব কথা সেই যুগের সত্য ইতিহাস হতে জনা যায়। তাঁহার কল্পনা হইতে আসিয়াছে শুধু জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেমকাহিনী এবং আয়েশার দেবকন্যা সদৃশ চরিত্র কথা।[১৯]

১৯৯৯ সালে মির্জা নাথানের বাহারিস্থাস্তান-ই গায়েবী নামক গ্রন্থে ওসমানের বউয়ের চরিত্রও আবিষ্কার করেছেন। মির্জা নাথান ছিলেন মুঘল সেনাপতি দীর্ঘদিন তিনি বাংলায় অবস্থান করেন এবং গ্রন্থটি ছিল তাঁর আত্মকাহিনী। এবং গ্রন্থটি বাংলা, বিহার উড়িষ্যা ও আসামের নানা ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ফার্সি ভাষায় লেখা ছিল, যদুনাথ সরকার সেটিকে অনুবাদ করে সত্য ইতিহাসের আলোকে ওসমানের যুদ্ধ, মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় বাঙ্গালার সুবাদার ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া যশোহর রাজ্য অধিকার করিলেন। ওসমানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুত হইল। ইহার প্রধান সেনাপতি হইল সুজোযেৎ খাঁ।

১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা ফেব্রুয়ারী বাদশাহী সৈন্য কুর্বাণী ঈদ পালন করে পরদিন টুপিয়া দুর্গে পৌছে। 'দৌলাম্বাপুর' ২রা মার্চ ১৬১২ খ্রীষ্টব্দে উসমান ও বাদশাহী সৈন্যের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। উসমানের বয়স তখন ৪১ বৎসর। আসীম বীরত্বের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ প্রথমে উসমানের ভ্রাতাগুলি, পরে উসমান নিজে প্রাণ ত্যাগ করেন।[২০]

যদুনাথ সরকার, মানসিংহ, জগৎসিংহ কতলু খা খাজা, ঈসা, উসমান সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। জগৎসিংহ পাঠানদের নিকট পরাজিত হয়ে এক দুর্গে আশ্রয় নেন এবং তার কিছুদিন পরই কতলূ খার মৃত্যু হলে তাঁর দেওয়ান খাজা উক্ত বালক পুত্রের পক্ষে রাজ্য বাঁচার জন্য বহু মূল্য উপঢৌকন দিয়ে সন্ধি করেন। এসবই সত্য ইতিহাসের আলোকে লেখা বলে উল্লেখ করেছেন যদুনাথ সরকার। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে কাল্পনিক দৃশ্যপট নিজে কল্পনা করে সৃষ্টি করেননি যেমন, জগৎসিংহের আহত হয়ে কতলু খাঁর দুর্গে আবদ্ধ থাকা, মৃত্যু কালে কতলু খাঁর সন্ধি ভিক্ষা করা ইত্যাদি শাখা পল্লবগুলি ইতিহাসের বাইরের। তবে এগুলি বঙ্কিমের কল্পনার ফসল নয়। ঐতিহাসিক Alexander Dow এর কল্পনা প্রসূত বলে তিনি উল্লেখ করেন। Alexander Dow সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের অভিযোগ মূলত এই কারণে যে সে তাঁর History of Hindostan যাকে Dow ফিরিস্তার অনুবাদ বলে উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি অনেক মেকি কথা চালিয়েছেন যাতে ফিরিস্তাতে নেই। যদুনাথ সরকার তাঁর অভিমতকে আরও জোরদার করেন ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন এবং স্যার উইলিয়াম জোনসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে। গিবন তাঁর Decline and Fall of the Roman Empire গ্রন্থের এক স্থানে Dow এর তথাকথিত ফিরিস্তার অনুবাদ উদ্ধৃত করে ব্যঙ্গ করেছেন এইভাবে 'I have copied this passage as a specimen of the persian manner, but I suspect that by some old fatality the style of Ferishta has been improved by that of Ossian.'[২১]

Alexander Dow এর অনুবাদ সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম জোন্স বলেছেন; I know Dow, who understand little or nothing of persian, and his history was translated into Hidostarce by a native from information the colonel's work was framed.'[২২] Alexander Dow এর History of Hindostan (2 VOIS) গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে Translated from the passian of Muhummud casim Ferista of Delhi.[২৩]

যদুনাথ সরকার বলেছেন, "ডাও সাহেবের মেকী ইতিহাস হইতে লইয়াছেন কাপ্তেন চার্লস স্টুয়ার্ট, যাঁহার বাংলার ইতিহাস (১৮১৩ খ্রীঃ প্রকাশিত) বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র সম্বল ছিল। তখনও আকবরের সমসাময়িক পারসিক ইতিহাসগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ হয় নাই। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র কি করিয়া মানসিংহের[২৪] বঙ্গ বিজয়ের নির্ভুল সংবাদ পাইবেন?" চার্লস স্টুয়ার্ট তাঁর হিস্টরী অব বেঙ্গল গ্রন্থের ঐতিহাসিক উপাদান কোন কোন সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। তাতে পারসিক সূত্রের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ আছে:

'Tabakta Akbory,' 'Tarikh Ferishtach,' 'Akbar Nameh,' 'Jehangire Nmeh,' 'Shah Jahan Naemh,' 'Alumgire Nameh,' 'Musair Aulamgiry,' 'Muntekhub al lebab; or 'Tarik Khafy Khan;, Ryaz Assula....cn এবং দশ নম্বরে অনুবাদের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে History of Hindoostan by Dow (1780) এর কথা। স্টুয়ার্টে অনুসরণে মানসিংহ-জগৎসিংহ-কতলু খাঁর ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ:

৯৯৮ হিজরী সালে রাজা মানসিংহ বিহার থেকে সসৈন্যে পাঠানদের বিরুদ্ধে মেদেনীপুরের দিকে রওয়ানা, বাঙ্গলয় নিজ প্রতিনিধি সুবাদার সৈয়দ খাঁকে সৈন্য নিয়ে যোগ দিতে বলেন। বর্ধমান পৌছে রাজা জানালেন যে, সৈয়দ খা বর্ষা শেষ না হলে সৈন্য গুছিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন না। মানসিংহ 'জেহানাবাদে শিবির স্থাপন করে বর্ষা শেষের প্রতীক্ষায় রইলেন। এই অবসরে কতলু খা নিজের একজন সৈন্য ' ধীরপুরে'- জেহানাবাদ থেকে ৫০ মাইল দুরে পাঠিয়ে ঐ দেশিটি লুট করতে লাগিয়ে দিলেন আফগানদের এই ধ্বংশ কাজ থামাবার জন্য রাজা নিজপুত্র জগৎসিংহকে পাঠিয়ে দিলেন। জগৎসিংহ প্রথমে পাঠানদের হেটে যেতে বাধ্য করে, পরে তাদের কপট সন্ধির প্রস্তাবে প্রতারিত হয়ে অবশেষে আফগানদের দ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত ও বন্দী হলেন। তারা তাঁকে বিসন্তপুরে ধরে নিয়ে গেল এবং কয়েকদিন পর্যন্ত গুজব রটল যে, তারা জগৎসিংহকে হত্যা করেছে। বাদশাহের সৌভাগ্য ফলে কতলু খাঁ আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন এবং এই ঘটনার কয়েকদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। আফগান প্রধানেরা জগৎসিংহকে মুক্তি দিয়ে তাঁর মধ্যস্থতায় মানসিংহের সংগে সন্ধি করলেন যুদনাথ সরকার দেখিয়েছেন স্টয়াটের এই বিবরণে 'অসংখ্য ভুল' আছে। তাঁর মতে তারিখের গোলমাল এবং ঘটনার এলামেলো সাজানো স্টুয়াটের পুস্তকে এত বেশী যে, যাহার সংশোধন করিতে হইলে বইখানি আমূল নূতন করিয়া লিখিতে হয়'। যদুনাথ সরকার বলেছেন জগৎসিংহের এই যুদ্ধ আকবর নামায় (ডয় খন্ড) আছে, নিজামউদ্দিন, ফিরিসক্তা, গোলাম হুসেন সলিম কেউই তাঁর নাম পর্যন্ত করেননি। তাছাড়া সৈয়দ খার স্থলে 'সাঈদ' খাঁ হবে অর্থ ভাগ্যবন্ত কিন্তু সৈয়দ বংশদ্ভুদ নয়। তিনি ছিলেন বাংলার সুবাদার মানসিংহের ডেপুটি বা নায়েব নন। মানসিংহ তখন শুধু বিহারের সুবাদার ছিলেন। 'বিসন্তপুর' নামটি ' গড়বিষ্ণুপুর'

শব্দের পারসিক লেখায় ভুল আকার বিসন্তপুর' আকবরের ভক্ত সামন্তরাজা বীর হাম্মিরের রাজধানী, তা পাঠানদের কবতলগত ছিল না।

'আকার নামানুসারে'[২৫] রাজা মানসিংহ বিহার প্রদেশের বিদ্রোহীদেরকে পূর্ব বৎসর দমন করার পর ৯৯৮ হিজরী সনে (খ্রীষ্টাব্দ ১৫৯০) ঝাড়খন্ডের পথে উড়িষ্যা জয় করবার জন্য রওয়ানা হন। তিনি ভাসলপুর ও বর্ধমান হয়ে জেহানাবাদে পৌছে তথায় শিবির স্থাপন করেন- বর্ষা শেষে জমিদারগণ সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে এই প্রতীক্ষায়। কতলু যুদ্ধাভিলাষে উড়িষ্যা থেকে ধরপুর আগমন করলেন। দরপুর জাহানাবাদ থেকে ২৫ ক্রোশ দূরে। সেখান থেকে কতলু নিজ সেনাপতি বাহাদুর কুরুকে প্রকান্ড সৈন্যদলসহ রায়পুরে পাঠালেন। রাজা মানসিংহ জগৎসিংহের অধীনে একদল ফৌজ বাহাদুরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। ধূর্ত বাহাদুর একটি দুর্গে আশ্রয় নিয়ে কুমারকে ভুলাতে আরম্ভ করল এবং তার চতুরতার দ্বারা এই অনভিজ্ঞ যুবক কুমারকে একপ্রকার অসাবধান করে ফেলা হল। গোপনে কতলুর নিকট আরও সৈন্যের সাহায্য চাওয়া হল।

১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে যখন জগৎসিংহ মদের নেশায় ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন কতলুর অগনিথ সৈন্য তাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করে পরাস্ত করে দেয়। জমিদার হামির জগৎসিংহকে বলেছিলেন যে, বাহাদুর প্রতারক এবং তার বলবৃদ্ধির জন্য আরও পাঠান সৈন্য আসছে কিন্তু কুমার তাঁর কথা শুনেননি। জগৎসিংহ আরও অসতর্ক হয়ে রইলেন। দিনশেষে শত্রুরা এসে কুমারের শিবিরে পৌছল। পরামর্শ ও বন্দোবস্তের সূত্র ভিন্ন হওয়ায় অধিকাংশ বাদশাহী সৈন্য যুদ্ধ না করেই পালাল। অল্প ক'জন বীর খাড়া থেকে যুদ্ধ করল। তাঁদের মধ্যে বিকারাধোর, মহেসদাস এবং নরুচালন যুদ্ধ করে বীরত্বের সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মুঘলদের পরাজয় হল। পাঠান পক্ষের ও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হল। উমর খাঁ, মীরু এবং হুমায়ূন-কুলীর পুত্রগণ এবং তাদের কিছু অনুচর যুদ্ধে মারা গেল। জমিদার হামির ঐ প্রমত্ত যুবক জগৎসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে নিজ রাজধানী বিষ্ণুপুরে নিয়ে গেলেন। একটা গুজব রটল যে কুমার জগৎসিংহ নিহত হলেন। এ সময় শাহানশাহের ভাগ্য ফলল। দশদিন পর কতলুখাঁর মৃত্যু হল। খাজা ঈসা (কতলুর দেওয়ান এবং ওসমানের পিতা) সন্ধি প্রার্থনা করলেন বাদশাহী সৈন্যের অতিবৃষ্টি এবং পরাজয়-পিড়াতে ভারাক্রান্ত ছিল এজন্য তারা সন্ধি করতে সম্মত হল। আফগানরা বাদশাহকে অধিরাজ বলে স্বীকার করল এবং আকবরের নামে খুৎবা পড়তে ও মুদ্রা অঙ্কিত করতে এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও তার চতুর্দিকে জমি বাদশাহী সরকারকে দিতে প্রতিশ্রুত হল। ১৫ই আগস্ট (১৫৯০) ঈসা কতলুর পুত্রকে (জেষ্ঠ্যপুত্র নসীর) রাজার সম্মুখে উপস্থিত করল এবং ১৫০টি হস্তি এবং অন্যান্য দ্রব্য উপহার দিল। এরপর মানসিংহ বিহারে ফিরলেন। জগৎসিংহের মৃত্যু সম্পর্কে সত্যিকার তথ্য হচ্ছে, তিনি অত্যধিক

মদ্যপান করে ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে ৬ অক্টোবর আগ্রার নিকট অকাল মৃত্যুবরণ করেনে। কিন্তু মানসিংহের অপর দুই পুত্র হিম্মৎসিংহ এবং দুর্জনসিংহ বঙ্গে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে বহুবার জয়ী হয়েছেন। জগৎসিংহের পরাজয় ঘটে কোন স্থানে, সে সম্পর্কেও যদুনাথ সরকার সত্য ইতিহাসের আলোকে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তাঁর অনুসন্ধানানুসারে মুঘল বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র ছিল জেহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ)। পলাতক জগৎসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিষ্ণুপুরে (আরামবাগের উত্তর পশ্চিমে) নিয়ে গিয়ে রক্ষা করা হয়। কতলূ খাঁর অপঘাত মৃত্যু সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের মতামত হচ্ছে, বঙ্গদেশ পাঠান শেরশাহের হাতে পড়বার পর হতে মানসিংহ কর্তৃক বঙ্গ বিজয় পর্যন্ত এই ষাট বৎসরে পাঠানদের রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী ও সেনাপতির মধ্যে অসংখ্য লোক খুন হন। সুতরাং কতলু খাঁর অপঘাত মৃত্যু বঙ্কিমচন্দ্রের অসম্ভব কল্পনা ছিল না। জগৎসিংহ তিলোত্তমার বিবাহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, জমপুরের রাজপুত্র যে বঙ্গদেশের একজন জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করলেন, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। কারণ, জয়পুরের নিজস্ব ইতিহাস হতে জানতে পারা যায়, এই কয় বৎসরের মধ্যে মানসিংহ এবং তাঁর বংশীয় কুমারগণ কুচবিহার থেকে দু'জন পূর্ববঙ্গ থেকে একজন উড়িষ্যা থেকে একজন, বিহার থেকে একজন। এই পাঁচজন রাজা ও জমিদার কন্যার পানিগ্রহণ করেন। এতে কোন শাস্ত্রীয় বোধ হয়নি।

Professor Cowell দুর্গেশনন্দিনীকে 'historical momance' বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক রোমান্সে ইতিহাস কিভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'we have now before us an historical romance (Durgeshnandini) by a Bengali author, which rejecting all the mythological times has fixed its scene in the days of the great Emperor Akbar and without an single marvel of magic or met qmp sychosis seeks its sole interest in human passion and life's daily struggle with adverse circumstances.'

তিনি Successful inaugurator of a new kind of literature in Bengal বলে উল্লেখ করেছে 'দুর্গেশনন্দিনী'কে। ইতিহাসের উপর কে আশ্রয় করে লেখা সৃষ্টিশীল এই নতুন সাহিত্য ধারা, যা ইংরেজী ভাষাতে স্যার ওয়ালটার স্কট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারই উর্বর বীজ বঙ্কিমচন্দ্র বপন করলেন ভারতবর্ষে। পাশ্চাত্যের Historical Novel-এর সঙ্গে প্রাচ্যের 'Histrocial romance' অপূর্ব সেতুবন্ধন রচনা করল।[২৭] উপন্যাসও রোমান্সের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ঘটনার প্রাধান্য- অনৈসর্গিক, অলৌকিক ও অদ্ভুদের বিচিত্র সমন্বয় ঘটে রোমান্সে, আর বাস্তব কাহিনীর প্রাধান্য। সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে ব্যক্তি নানা জীবন জটিলতা উপন্যাসে

প্রকাশ পায়। এবং চরিত্র চিত্রণই এখানে মূখ্য। রোমেন্সর চিত্তাকর্ষক ঘটনা এবং উপন্যাসের বাস্তবতা একত্রে মিলিত হলে তাকে রোমান্সধর্মী উপন্যাস বলা যায়। এর সাথে ইতিহাস যুক্ত হলে তাকে ঐতিহাসিক রোমান্স বলা হয়। ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন ' দুর্গেশনন্দিনী-তে উপন্যাসের চেয়ে, রোমান্সের উপদান অধিক, চরিত্রের দ্বন্দ্বের চেয়ে কাহিনী বয়ানের গুরুত্ব বেশী।[২৮]

অপরদিকে আনিসুজ্জামান এর মতে ' বঙ্কিমচন্দ্র মুঘল ইতিহাসের পটভূমিকায় কাহিনী বর্ণনায় এবং চরিত্র বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যোগসাজস করে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক। রোমান্সধর্মী উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা ঘটালেন। সূদুর অতীতের প্রতি মোহমুক্ত দৃষ্টিপাত। অসাধারণ বীর জীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ, নর-নারীর হৃদয়ঘটিত দ্বন্দ্বের মোহনীয় উন্মোচন- বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস জগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুর্গেশনন্দিনীতে তার প্রথম পরিচয় আমরা পাই।[২৯]

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক যিনি বাঙালীর মনোজীবনে নতুন আলোড়ন তুলেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় তাঁর প্রভাব ছিল গভীরে। বাঙালীর জীবনকে প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্যের আদর্শের মিলন ভূমিতে স্থাপন করেছিলেন তাঁর মননশীল সাহিত্য, কথা সাহিত্য দেশ ও দশের কথা প্রভৃতির মাধ্যমে। শুধু তাই নয় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর রেনেসাঁসের মুল সুরও তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মাঝে আমরা সেই সুরের প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই।

Kcvj KÛjv

'কপালকুন্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। দুর্গেশনন্দিনীর মত রাজনৈতিক কোন ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই উপন্যাস রচনা করেননি। উপন্যাস রচনার পটভূমিকা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে মেদেনীপুরের কাঁথি অঞ্চলের সমুদ্রতীরকে। সেই সময় এই অঞ্চলের নাম ছিল নেগুয়া মহকুমা। ১৮৬০ সালে কর্মসূত্রে যশোর থেকে বদলি হয়ে সেখানে যান। এখানেই তিনি 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তাঁর কণিষ্ঠ ভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, নেগুয়া থাকাকালীন একজন সন্নাসী কাপালিককে কেন্দ্র করেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীর জন্ম লাভ করে। নেগুয়ায় থাকাকালীন 'একজন সন্নাসী কাপলিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল মধ্যে মধ্যে নিশীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন। তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর কস করিতেন, তখন এই সন্নাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত।

চাঁদপুরের কিছুদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে ঐ সন্নাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত।[৩০]

'কপালকুণ্ডলা'য় মুঘল ইতিহাস অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে। আসলে এই উপন্যাসের মূল বিষয় হচ্ছে- অরণ্যবাসিনী কপালকুণ্ডলার ও নবকুমারের প্রণয় এবং তাদের ভাগ্যের লিখন নিদারুণ পরিণতি। উপন্যাস শুরু করেছেন পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণের কথা উল্লেখ করে। দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পর্তুগীজও অন্যান্য জলদস্যুদের ভয়ের কথা বলেছেন। অর্থাৎ উপন্যাস প্রকাশের (১৮৬৬ খ্রীঃ) ২৫০ বৎসর পূর্বে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের সময়কাল বলে মনে হয় তবে আকবরের সময়ে বাংলায় মুঘল পাঠান-যুদ্ধ হয় এবং সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রীঃ বাংলা অধিকার করেন। আবার জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহন এবং মেহেরুন্নেসার সঙ্গে প্রণয়ের উল্লেখ থাকায় ঘটনাকাল ১৬০৫ হওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর আকবরের মৃত্যুর পর শাহজাদা সেলিম নুরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ভাষায় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর অপার করুণায় ১০১৪ হিজরী সালের জমাদিয়স্-সানির ২০ শে তারিখ, বৃহস্পতিবার (২৪শে অক্টোবর ১৬০৫) বিশেষ একটি নাক্ষত্রিক মুহূর্তে অতীত হলে আমি রাজধানী আগ্রার রাজতক্তে আরোহন করলাম। আমার বয়স তখন পয়ঁত্রিশ বছর।'[৩১]

মুঘল-পাঠান ইতিহাসের সঙ্গে 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনী যুক্ত হয়েছে নবকুমারও পদ্মাবতীর বৈবাহিক সম্পর্ক ও বিচ্ছেদের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। বঙ্কিম চন্দ্রের ভাষায়- এই সময়ে পাঠানেরা আকবর শাহ কর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল। তাহাদের দমনের জন্য আকবর শাহ বিধিমতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। যখন রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন মোঘল-পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আগমনকালে তিনি পথিমধ্যে পাঠান সেনার হস্তে পতিত হয়েছেন। পাঠানেরা তৎকালে ভদ্রাভদ্র বিচার শূন্য, তাহারা নিরপরাধী পথিকের প্রতি অর্থের জন্য বলপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামগোপাল কিছু উগ্রস্বভাব; পাঠানদিগকে কটু কহিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিস্কৃতি পাইলেন।"

দুর্বৃত্তদের কবলে পড়ে অর্থ বা সম্পদ হারানো স্বাভাবিক। কিন্তু অবরুদ্ধ হয়ে জোরপূর্বক মুসলমান হওয়ার ঘটনাটি মুসলমানদের প্রতি এক প্রকারের বিদ্বেষের আভাস পাওয়া যায়। 'দুর্গেশনন্দিনী'তেও গজপতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার ঘটনা জানা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ ছিল। তাই তিনি হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্য তৎকালীন শাসক জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফের বক্তব্য- 'তিনি হিন্দুদের মনে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্য পুরাতন দুশন (বর্তমানে মৃত হলেও) মুসলমানদের বিরুদ্ধে (আসলে তুকি-মুগল শাসক গোষ্ঠীই লক্ষ) হিন্দুদের উত্তেজিত করে তুললেন- নানা সত্য ও কাল্পনিক অত্যাচারের ও অমানুষিকতার চিত্র তুলে ধরে। হিন্দু উত্তেজিত করে তুললেন- নানা সত্য ও কাল্পনিক অত্যাচারের ও অমানুষিকতার চিত্র তুলে ধরে। হিন্দু উত্তেজিত হলে বলা চলে হিন্দু মনে মুসলিম বিদ্বেষের সাথে সাথে স্বাজাতী ও স্বদেশ প্রেম জাগল- হিন্দুজাতি গড়ে উঠল, কিন্তু ভাঙ্গল মুসলমানের মন ক্ষুব্ধ হয় শিক্ষিত মুসলমান।'[৩২]

তুর্কী ও মুঘল মুসলমানগণ পাঁচ শতাধিক বৎসর এদেশ শাসন করেছে। ফলে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বেদনা ও বিদ্বেষ হিন্দুদের মুসলমানদের প্রতি বিরূপতার সৃষ্টি করে যদিও এই বিরূপতা দেখিয়েছেন। সে বিরূপতা বিদ্বেষ ও বিদ্রূপরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি মধুসূদনের মতো সংস্কার মুক্ত প্রতিভাও এ দোষ থেকে মুক্ত নন। অন্যদের কথা আলোচ্য নয় এজন্যে যে তাঁরা কেউ প্রভাবশালী ছিলেন না। কিন্তু বঙ্কিম যুগ-স্রষ্টা প্রতিভা বলে স্বীকৃত। কাজেই তাঁদের পক্ষে এ-অনুদার ও অভিজ্ঞজনোচিত মনোভাব দূষণীয়"।[৩৩] এসত্ত্বেও উনিশ শতকের উপন্যাসিকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে আছেন। অসামান্য শিল্পিও রোমান্স রচয়িতা হিসেবে। তিনি হিন্দু জাতীয়তা ও স্বদেশ প্রেমের মন্দ্রদ্রষ্টা হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। যেহেতু তিনি ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তাই তাঁর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকের মধ্যে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

'তিনি উনিশ শতকের শেষার্ধের লোক হয়েও এবং তাঁর সমকালের ইউরোপীয় নাস্তিক্য, দর্শন, সংশায়বাদ, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র দর্শন, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং ফরাসি বিপ্লব, শিল্পবিপ্লব, মার্ক্স ও ডারইন মতবাদের সঙ্গে পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় হিন্দু অভ্যুত্থানের স্বপন্ন দেখতেন। তাঁর ধারণায় হিন্দু রাজত্ব হলেই হিন্দু জাতির প্রতিষ্ঠাও উন্নতি। অথচ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেষার্ধেও হিন্দু রাজত্ব চিল দিবাস্বপ্ন মাত্র'।[৩৪] বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর বাহুবল ও চরিত্রবলের জয়গান করতে যেয়ে ভূলেই গিয়েছিলেন অথবা উপলব্দির মধ্যে আসেনি যে, কেবল শাসনে নয় শিক্ষা ও অর্থনীতির বুনিয়াদের উপর একটি জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নতির বীজ নিহিত। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বাদ দিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বাধীনতার আকাঙ্খা বাস্তবসম্মত নয় ইংরেজ শাসন আমলে যখন হিন্দু ও মুসলমানদের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা তখন দূরদশী বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য হওয়া

উচিত ছিল হিন্দু ও মুসলমানের সংহতির চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে তিনি এতটা সচেতন ছিলেন না। 'তাই তিনি হিন্দর ঋষি হলেন বটে, কিন্তু দেশের চিন্তানায়কের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রইলেন।'[৩৬]

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শুরু কুয়াশায় পথহারা নৌকার দুই আরোহীর কথোপকথোনের মাধ্যমে। যাদের একজন তরুণ অপরজন বৃদ্ধ। দিকহারা নৌকা একসময় সমুদ্র-উপকুলে এসে পৌছায়। আরোহীরা নেমে একসময় পানাহারের ব্যবস্থা করতে থাকে। এই সময় প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য তরুণ একাই জঙ্গলে প্রবেশ করে অন্যান্যদের অপারগতার কারণে। এখানে বিলম্ব হওয়ায় তরুণকে বাঘ হত্যা করছে আশংকায় তাকে ছাড়াই যাত্রীরা স্বদেশ গমন করে এবং তরুণ সমুদ্র তীরে একাই বনবাসে বিসর্জিত হয়। এই তরুণের নাম নবকুমার। সমুদ্র উপকূলের গভীর অরণ্যে দেখা পান সন্নাসী কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত নবকুমার কাপালিকের আতিথেয়তার মুগ্ধ হয়। কিন্তু পরে সন্নাসীর দূরভীসন্ধির কথা জানতে পালে তিনি কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পলায়ন করেন। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পূজারি অধিকারীর নিকট নিয়ে গেলে নবকুমার তথায় কপালকুণ্ডলার পরিচয় লাভ করে যে সে ব্রাহ্মণ কন্যা। পর্তূগীজ জলদস্যু দ্বারা অপহৃত হয়ে সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত হয়। সেখান থেকে কাপালিক তাকে তুলে এনে আপন যোগখিদিধর উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করেন। নবকুমার কপালকুন্ডলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে স্বদেশ সপ্তগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

যে (চট্টগ্রাম) সপ্তগ্রামের নবকুমারের বসবাস। সে স্থান সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত এই নদীবন্দর এক সময় অন্তর্বাণিজ্য ও বর্হিবাণিজ্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। বঙ্গোপসাগর থেকে ভগীরথী চেয়ে সরস্বতীর জনপথে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত বাণিজ্যের কার্যক্রম চলত, তাতে পুর্তগীজ বণিকদের বিশেষ প্রভাব আর সেই সাথে জলদস্যুদের উৎপাতা পর্তুগীজ বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, কৃষি শিল্প-সংস্কৃতি ও ভাষায় অনেক অবদান রেখেছেন। এতদ্সত্ত্বেও তাদের অসামাজিক কার্যকলাপ ও জলদস্যুতার জন্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে এদেশ হতে বিতাড়িত হতে হয়। সম্রাট শাহজাহানের সময় তাদের প্রধান ঘাটিগুলো ধ্বংশ করে দেওয়া হয় এবং তারা এক প্রকার এই উপমহাদেশ হতে বিতাড়িত হয়।

যাইহেক কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করে নবকুমার সপ্তগ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন, তারপর নানা ঘটনা, ঘাত, প্রতিঘাত এবং উভয়ের করুণ পরিণতির মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তি। এই ছল মোটামুটি কপালকুণ্ডলার কাহিনী। এর মধ্যে অত্যন্ত সর্তভাবে বঙ্কিমচন্দ্র মুঘল ইতিহাসকে গল্পের সঙ্গে যুক্ত করেছেন প্রথমে পদ্মাবতীল (লৎফু-উন্নিসার) বাবা

রামগোবিন্দ ঘোষাল এবং তার পরিবারকে মুঘল রাজদরবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে তিনি সম্রাট আকবরের গুণগান করেছেন- 'আকবর শাহের নিকট কাহারও গুণ অবিদিত থাকিব না; শীঘ্রই তিনি ইহার গুণগ্রহণ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসার পিতা শীঘ্রই উচ্চপদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমারাহ মধ্যে গণ্য হইলেন।'[৩৭]

এরপর উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের প্রায় সকল পরিচ্ছেদে মুঘল ইতিহাস স্থান পেয়েছে। যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে লুৎফ-উন্নিস ও যুবরাজ সেলিমের সম্পর্ক, সেলিম মেহের-উন্নিসার প্রেম, যুবরাজ খসরুর (সেলিমের পুত্র) সিংহাসনারোহনের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। তবে এখানে কোথাও কপালকুণ্ডলাকে যুক্ত করেননি।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের অনেক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা আছে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেইসব দিক বেশি উৎসাহ না দেখিয়ে বরং মুঘল হেরেমের রোমাঞ্চদের ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। যেমন লুৎফ-উন্নিসাকে পারসিক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমতি করে সেলিমের হেরেমের প্রবেশ করান, সেখানে তিনি গোপনে যাদের কৃপা বিতরণ করতেন যুবরাজ সেলিম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় লুৎফ-উন্নিসার ন্যায় বুদ্ধিমতি মহিলা যে অল্প দিনেই রাজকুমারের হৃদয়াধিকার করিবেন। ইহা সহজেই উপলব্দি হইতে পারে। সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগশূণ্য হইয়া উঠিল যে, লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল। কেবল লুৎফ-উন্নিসার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল, টমেত নহে, রাজপুরবাসী সকলেরই উহা সম্ভব বোধ হইল। এইরূপ আশার স্বপনে লুৎফ-উন্নিস জীবনবাহিত করিতেছে, মত সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ (আকতিমাদ-উদ্দৌলা) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকুলে প্রাধান্য সুন্দরী। একদিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেইদন মেহের-উন্নিসার সহিত সাক্ষাত হইল এবং সেইদনি সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন।'[৩৮] এর পরের ঘঠনা আর উল্লেখ না করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ইতিহাস পাঠক মাত্রই তা জানেন। তবে তিনি তাঁর নিজের মত করে আরো কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেমন, বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের সাথে মেহেরুন্নেসার বিয়ে, সেলিমের প্রতি পিতার মনোভাব শের আফগানের প্রতি সেলিমের আক্রোশ-ইত্যাদি খুব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরো যে বিষয়গুলি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে- সেলিমকে সিংহাসনে না বসানোর জন্য মেহেরুন্নেসার ষড়যন্ত্র। সেইসাথে সেলিমের মেহেরুন্নেসার প্রতি অনুরাগ এর কারণে লুৎফ-উন্সিা এবং সেলিমের রাজপুত স্ত্রী উভয়ের মনপীড়া ইত্যাদি।

লুৎফ-উন্নিশ যখন বুজতে পারলেন মেহের-উন্নিসার কারণে তার সেলিমের পাটরাণী হওয়া সম্ভব নয় তখন তিনি সেলিমের প্রধান মহিষী রাজপুত কণ্যার সহযোগিতায় সেলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। উভয়ে সেলিমের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ স্বরূপ, সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর খসরুকে দিল্লীর সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা করেন।

খসরু ছিলেন সেলিমের রাজপুত মহিষীর গর্ভজাত সন্তান। দুই রমণীর ভরসনা ছিল যেহেতু খসরুর মাতুল রাজপুত জাতির ছুড়া রাজা মানসিংহ এবং রাজমন্ত্রি মুসলিম প্রধান আজিম খান (মির্জা আজিজ কোকা) তাঁর শ্বশুর। কাজেই এই দুইজন উপযোগী হলেই যুবরাজ খসরুকে সিংহাসনে বসান সম্ভব। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়- মুঘলদের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে রাজপুতদের বাহুবলেই। বঙ্কিম এখানে রাপুতদের আত্মমর্যাদাবোধ, অহঙ্কার ও মান-সম্মানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। পরিশেষে সম্রাট আকবরের বিচক্ষণতার কাছে লুৎফ-উন্নিসার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। সেলিমকে তিনি জাহাঙ্গীর শাহ নামে সিংহাসনে বসান। আকবর কিভাবে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেছেন বঙ্কিম তার বিবরণের আবশ্যকতা মনে করেননি যেহেতু তা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তবে ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত ঘটনার পুরোপুরি মিল লক্ষ করা যায় না। সত্য ইতিহাসে বর্ণিত সেনাপতি মানসিংহের সহায়তায় আজীজ কোকা স্বীয় জামাতা খসরুকে সিংহাসনে বসাবার চক্রান্ত করেন। এ সম্পর্কে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে উল্লেখ করেছেন যে আজীক কোকা খসরুকে সিংহাসনের বসানোর চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন এবং তিনি তার শাস্তি স্বরূপ আজিজ কোকার জায়গীর চ্যুত করেন'।[৩৯] সুতরাং এখানে লুৎফ-উন্নিসা নামে কোন নারীর ভূমিকা ছিল না।

বঙ্কিমের বর্ণনায় প্রথম চক্রান্তে ব্যর্থ হয়ে লুৎফ-উন্নিসা দ্বিতীয়বার চক্রান্তে লিপ্ত হলেন একটু অন্যভাবে। তাঁর ধারণা মেহের-উন্নিসার ন্যায় অদ্বিতীয় সুন্দরীকে সেলিম বিয়ে করলে সে আর রাজপুরে থাকতে পারবে না। তাই বর্ধমানে গিয়ে মেহের-উন্নিসাকে শের আফগানের প্রতি অনুরক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। মেহের উন্নিসা ছিল তার বাল্যসখি সেই সূত্র ধরে সে বর্তমানে মতিবিবি নামে উপস্থিত হয় মতিবিবির ধারণা মেহের-উন্নিসা যদি জাহাঙ্গীরের প্রতি অনুরাগী না হয়ে স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশীল হয় তবে জাহাঙ্গীর শত আফগান বধ করলেও মেহের-উন্নিসাকে পাবে না।

মেহের-উন্নিসার সঙ্গে কথপোকথনের পর মতিবিবি বুঝতে পালেন যে সে যথার্থই জাহাঙ্গীরের অনুরাগিনী "আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপতি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। আর দাসির স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনো দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবেক না, আর যদি দিল্লীশ্বর কর্তৃক তাহার স্বামীর প্রানান্তর হয় তবে স্বামী হত্যার সহিত ইহজনমে তাহার

মিলন হইবেক না।"[৪০] মতিবিবির সাথে এইরূপ কথপোকথনের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র মেহের-উন্নিসার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। মতিবিবি মেহের-উন্নিসার সাথে আলোচনার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যেহেতু মানুষের হৃদয় বিচিত্র গতির, তাই জাহাঙ্গীরের অনুরাগিনী মেহের-উন্নিসা নারী দর্পে যাই বলুক পথ উন্মুক্ত হলে মনের পতিরোধ করতে পারবে না। তাহা আশাভঙ্গ হয়ে মতিবিবি আগ্রার পথে যাত্রা করলেন। মূলত উপন্যাসে ইতিহাসের অংশ এখানেই শেষ হয়েছে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ রস সঞ্চারের জন্য যেটুকু ঐতিহাসিক উপকরণের সংশ্রব ঘটিয়েছেন তার পুরোভাগ জুড়েই ছিল জাহাঙ্গীর ও মেহের-উন্নিসার (নুরজাহান) প্রেম উপাখ্যান। যা প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। উপন্যাসে জাহাঙ্গীরের প্রেয়সী মেহের-উন্নিসা চরিত্রের আবির্ভাব ঘটানো সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, "মেহের-উন্নিসা চরিত্রের সহিত এই উপন্যাসের ঘটনাগত কোন সম্পর্ক নাই, গ্রন্থকার একটি সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা উপন্যাসের মধ্যে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ নারীর একটু স্থান করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে কাহিনীর শোভ বৃদ্ধি হইয়াছে।"[৪১]

মুঘল সম্রাটদের ঘটনাবহুল রাজ্য শাসন বৈচিত্যময় জীবনযাত্রা, নাকীয় ও বিলাসী হারেম জীবন, চমকপ্রদ ও মুখরোচক ঘটনাবলী যেন, মুঘল-রাজপুতদের আত্মীয়তা, জাহাঙ্গীর নুরজাহানের বিবাহ, এইসব বিষয় তৎকালীন লেখকদের আকৃষ্ট করেছিল। তাই খাঁটি রোমান্সধর্মী উপন্যাস লিখতে গিয়েও বঙ্কিচন্দ্র মুঘল ইতিহাসের এই রোমান্সকর কাহিনী (জাহাঙ্গীর নূরজাহানের প্রেম) ব্যবহার করার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। এক্ষেত্রে স্বত:স্ফূর্তভাবে তিনি নুরজাহানের গুণের ও রূপের প্রশংসা করেছেন, তবে জাহাঙ্গীরকে নারীভোগী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন যদিও তাঁরও গুণের অভবা ছিল না। নূরজাহানের ক্ষেত্রে বলেছেন "মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান রূপবতী এবং গুণবতী বলিয়া খ্যাতি লাব করিয়াছিলেন। বস্তুত, অদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৌন্দর্য্যে ইতিহাস কীর্ত্তিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাঁহার প্রধান্য ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তৎকালীন পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকেই তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্য গীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয় কবিতা রচনা বা চিত্রলিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সরস কথা তা*হার সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও মোহময়ী ছিল।" তবে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উপন্যাসে একজন রোমান্টিক প্রেমিক ও নারীভোগী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে যেমন- আগ্রার রাজদরবারে লুৎফ-উন্নিসার সাথে জাহাঙ্গীরের কথোপকথন- "দিল্লীর বাদশাহকে তোমার গোলাম করিয়া দিয়াছি; আরও পুরস্কার চাহিতেছে? আবার- "প্রেয়সী" তোমাকে আমার

অদেয় কিছুই নাই। মোতার যদি সেই প্রবৃত্তি হয় তবে তদ্রূপই কর। কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র-সূর্য্য উভয়ে বিরজি করেন না? একবৃন্তে কি দু'টি ফুল ফুটে না।"[৪২] লুৎফ-উন্নিসার প্রতি সম্রাট জাহাঙ্গীরের এই উক্তিগুলি তাঁর বহুনারী ভোগাকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন।

তিনি ছিলেন ভদ্র, অমায়িক দয়ালু, শিষ্ঠাচারী ও ন্যায়পরায়ণ সম্রাট। ড. ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে জাহাঙ্গীর ছিলেন মোগল ইতিহাসে অন্যতম চমকপ্রদ চরিত্রের অধিকারী"। তিনি আরও বলেছেন "তাঁর চরিত্রে অনেক কিছুই ঘৃণার বিষয় থাকলেও এমন অনেক অনেক গুণের বিষয় রয়েছে যার ফলে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে আকর্ষণীয় নরপতিগণের কাতারে বসিবার যোগ্য ও বটে।" তিনি সদাসর্বদা প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ৬০টি ঘন্টাযুক্ত ৩০ গজ লম্বা ৪ মণ ওজনের একটি সোনার শিকল আগ্রার দুর্গ হতে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যানুরাগী ও জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি যেমন তুর্কী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন তেমনি ফার্সী সাহিত্যেও তার জ্ঞান ছিল অগাধ। তাঁর রচিত জীবন-চরিত তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী একটি উৎকৃষ্ট এবং ইতিহাসসমৃদ্ধ গ্রন্থ। এছাড়াও সম্রাট সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রশিল্পের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়েছি। এসবই সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা সত্য ইতিহাসে জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের (মেহের-উন্নিসা) সাক্ষাত, পরিণয় ও তাদের সম্পর্কে যে ভাবে বর্ণিত আছে সংক্ষেপে তা আলোচিত হলো- সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে জগদ্বিখ্যাত রূপসী নূরজাহানের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাদের নিয়েও অজস্র কাহিনী প্রচলিত আছে যার অধিকাংশই ঐতিহাসিক সত্যতা নাই। তবে মূতামিদ খান লিখিত "ইকবাল-নামা-ই জাহাঙ্গীরি গ্রন্থের বিবরণকে ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন। নূরজাহানের বাল্য নাম ছিল মেহের-উন্নিসা। পিতা মির্জা গিয়াস বেগ (ইতিমদ্-উল-দৌলা) পারস্য থেকে ভারত উপমহাদেশে আসেন, পথে কান্দাহারে মেহের-উন্নিসার জন্ম হয়। গিয়াসবেগ সম্রাট আকবর এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলিকুলি বেগ নামে যে পারসিক বর্ধমানের জায়গীর এবং শের আফগান উপধি পেয়েছিলে তাঁর সঙ্গে মেহের-উন্নিসার বিয়ে হয়। শের আফগানের বিদ্রোহী মনোভাবে সংবাদ জাহাঙ্গীরের নিকট আসায় তিনি তাকে শায়েস্তা করার জন্য বাংলার শাসক কুতুবউদ্দিনকে পাঠান। যুদ্ধে কুতুবউদ্দিন ও শের আফগান উভয়ে নিহত হন ১৬০৭ খ্রীঃ এবং বেগমসহ রাজদরবারে পাঠানো হয়। এই ঘটনার ৪ বৎসর পর অর্থাৎ ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে নওরোজ উৎসবে এক মিনাবাজারে মেহের-উন্নিসাকে দেখতে পেয়ে তার অসামান্য রূপ ও সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে বিয়ে করেন এবং প্রধান মহিষীর মর্যাদা দান করেন।

কিংবদন্তি আছে যে, জাহাঙ্গীর পূর্ব হতেই মেহের-উন্নিসার অপরূপরূপে মুগ্ধ ছিলেন এবং সেজন্যই শের আফগানকে পথের কাঁটা মনে করে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওলন্দাজ পর্যটক De Late এই মত প্রদানকারীদের একজন- তিনি তাঁর 'India of Jahangir' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, মেহের-উন্নিসার বিয়ের পূর্বেই জাহাঙ্গীর যুবরাজ থাকা অবস্থায় তাঁর প্রতি আসক্ত হন। আকবর এই বিয়ে অনুমোদন না করায় জাহাঙ্গীর তখন মেহের-উন্নিস কে বিয়ে করতে পারেননি কিন্তু পরে তিনি তাঁর আশাপূর্ণ করেন।[৪৩] তবে ড. বেণীপ্রসাদ এর বিপক্ষে মত দেন তিনি তার 'History of Jahangir' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে (বিয়ের) জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিসাকে দেখেননি এবং শের আফগানকে হত্যা করার পেছনে তাঁর কোন হাত ছিল না।

তাছাড়া-সমসাময়িক ভারতীয় ঐতিহাসিক ও ইউরোপীয় পর্যটকগণ ও এ সম্পর্কে কোন তথ্য দেননি পরবর্তী লেখকগণ ঐ গল্প সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া নূরজাহানের মত বিচক্ষণ মহিলা তাঁর স্বামী হত্যাকে কখোনই বিয়ে করতে সম্মত হতেন না।[৪৪] বাস্তবিকই কোন ইউরোপীয় বা পারসিক পর্যটক এ ব্যাপারে কোন তথ্য দেননি একমাত্র De-Late ছাড়া। আবার জাহাঙ্গীর যদি মেহের-উন্নিসাকে পূর্ব হতে ভালবাসতেন তাহলে শের আফগানের মৃত্যুর পর ৪ বৎসর কেন অপেক্ষা করবেন। তবে ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ তাঁর 'Short History of Muslim Rule in India' গ্রন্থে ড. বেনীপ্রসাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তাঁর মতে মেহের-উন্নিসার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের পূর্ব প্রণয় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নয়। শের আফগান যে বিদ্রোহী হয়েছিলেন তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আবার স্বামীর মৃত্যুর পর মেহের উন্নিসাকে তারঁ পিতার নিকট না পাঠিয়ে কেনইবা জাহাঙ্গীর মুঘল হারেমে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। ৪ বৎসর অপেক্ষা করা সম্পর্কে ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন পূর্ব স্বামীর শোক ও কষ্ট ভোলার জন্য। সুতরাং শের আফগানের হত্যার ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের দায়িত্ব ছিলনা এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে তিনি এও স্বীকার করেছেন যে, এই অভিযোগ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণও পাওয়া যায়নি। এমন কি মেহের-উন্নিসার প্রতি তাঁর প্রচন্ড আবেগ থাকা সত্ত্বেও জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে বিয়ের ব্যাপারে কোন কিছু উল্লেখ করেননি।

যাই হোক বিয়ে করার পর প্রথমে জাহাঙ্গীর তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'নূরমহল' (মহলের আলো) এবং পরে পরিবর্তন করে রাখেন 'নূরজাহান' (জগতের আলো)। অনুপম রূপ লাবণ্যবর্তী এই পারস্যরমণীর বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। চরম উচ্চাভিলাষী এই নারীর পারস্য সাহিত্য ও শিল্প কর্ম সম্পর্কেও জ্ঞান ছিল। স্বীয় গুণে স্বামীর উপর

অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পরম রূপবর্তী রমণী অত্যন্ত সাহসিও ছিলেন। স্বামী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে শিকারে যেয়ে নিজ হাতে বাঘ শিকার করেছিলেন। তিনি দরিদ্র এবং অনাথদের অকাতরে অর্থ সাহায্য দিতেন। সর্বোপরি জাহাঙ্গীরের প্রতি ছিল তাঁর অনাবিল ভালবাসা। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আঠার বৎসর বেঁচে ছিলেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হলে লাহোরের সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি পাশ্বেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এহেন আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্থান পাওয়াই স্বাভাবিক।

'কপালকুণ্ডলা'তে যেটুকু মুঘল ইতিহাস আলোচিত হয়েছে তার সবটুকুই বঙ্কিমচন্দ্র নিয়েছেন Charles Stewart এর 'History of Bengal' থেকে। মেহের-উন্নিসার রূপগুণের বর্ণনা স্টুয়ার্ট থেকে নেওয়া। স্টুয়ার্ট লিখেছেন- In beauty excelled all the ladies of the East. She was educated with utmost care and attention. In music, in dancing in Poetry, in Painting she had no equal among her sex.'

তাছাড়া সেলিম- মেহের-উন্নিসার প্রথম দর্শন, মেহের-উন্নিসার প্রতি আকর্ষণ বোধ ও অনুরাগের সঞ্চার এর সবই স্টুয়াটের 'History of Bengal' এ আছে এবং সেখান থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছেন। 'Histroy of Bengal' এ যা আছে- 'Selim, the prince-Royal visited one day he father. When all the public entertainment was over, when all expect the principal guests, were withdrawn and wine was brought on the table, the ladies, according to custom, were introduced in their veils. The ambition of Meherun-Nisa aspired to a conquest of the Prince. She sung- he was in raptures, she danced- he could hardly be restrained by the rules of decency, to his place. Her stature, her shape, her gait, had raised his ideas of her beauty to the highest pitch. When his eyes secmed to devour her. She as by accident dropt her veil and shone upon him, at once with all her charms, the confusion, which she could well feign on the occasion, heighened the beauty of her face. Her timid eye by steath fell upon the prince and kindled all his soul into love.[৪৬]

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ সেলিমকে সম্রাট হতে না দেওয়ার ষড়যন্ত্র, সেলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসানোর চক্রান্তে লুৎফু-উন্নিসা, মানসিং ও আজম খানদের জড়িত থাকা এ সবই স্টুয়ার্টের হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল

থেকে নেয়া। ঐতিহাসিক রাখাল দাসের মতে আমাদের দেশে যথার্থ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য উপাদানের অভাব রয়েছে।[৪৭] তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ইতিহাসের উপাদান পর্যাপ্ত না থাকায় যেটুকু পেয়েছেন তার উপরই তিনি তাঁর ইতিহাস চেতনার কাঠামো তৈরী করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাই মোহিতলাল মজুমদার কপালকুণ্ডলাকে ঐতিহাসিক রোমান্স বলে মূল্যায়ণ করেছেন। ইতিহাস হিসাবে নয়।[৪৮] অবশ্য আমাদেরও মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস রচনা করেননি, সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাকে কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে যে রোমান্স তৈরী করা হয় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- যাহা স্বভাবতই আমাদের হইতে দুরস্থ, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্ত্তী তাহাকে কোন একটি ছুতায় খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলে পাঠকের প্রত্যয় উপাদান লেখকের পক্ষে সহজ হয়। রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণ যতটুকু সাহায্য করে যে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হননা। ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যঅসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি উপন্যাসিকের বড় লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাহার কোন খাতির নাই।"[৪৯]

'কপালকুণ্ডলা' যদিও মুঘল ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস তথাপি এর ঐতিহাসিক পটবিস্তার নেই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ কিছু চরিত্রের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। যেমন আকবর, জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, মানসিংহ আজিম খান (আজিজ কোকা) ইত্যাদি। তবে তাদের ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা রোমান্স এর উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাহলে কপালকুণ্ডলাকে কি ধরনের উপন্যাস বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মানদন্ডের সংজ্ঞানুসারে হয়ত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাবে না তবে মোহিত লাল মজুমদারের মতে ইতিহাস রস। যেহেতু এর কাব্য রসকে সমৃদ্ধ করেছে তাই একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বা ইতিহাসগন্ধী রোমান্স বলা যেতে পারে।[৫০]

একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর বিকাশকালের সাহিত্য শিল্পে মুঘল-ইতিহাসের প্রভাব যে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, এখানে তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

gYvwjbx

'মৃণালিনী' একটি রোমান্টিক উপন্যাস। ঔপন্যাসিক রোমাঞ্চের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য ইতহাসের যে অংশটুকু সংযোজন করেছেন, তা আবার মুঘল ইতিহাস নয়। বাংলার ইতিহাস অর্থাৎ তুর্কী বীর বখতিয়ার খলজির বাংলা

বিজয়ের ইতিহাস। আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রেম, কাহিনীটির ঘটনাকাল চিহ্নিত করার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়। কাহিনী কাঠামো নিম্নরূপ:

কাহিনীর শুরু গল্পের নায়ক হেমচন্দ্র ও ব্রাহ্মণ মাধবাচার্যের কথোপকথোনের মাধ্যমে। হেমচন্দ্র যিনি পিতার শত্রু ও রাজ্যধিকারী বখতিয়ার খলজির প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জন্য ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য তাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মৃণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের ভালবাসা। তাই মাধবাচার্য মৃণালিনীকে ছলনার আশ্রয় নিয়ে পাঠিয়ে দেন দৌড় নগরের (লক্ষ্ণাবর্তী) ঋষিকেশের নিকট, যা হেমচন্দ্রের নিকট থাকে অজানা। তবে পরবর্তীতে যবনদের ধ্বংশ করার প্রতিশ্রুতি আদায়ের মাধ্যমে হেমচন্দ্রকে মাধবাচার্য মৃণালিনীর সন্ধান দেন। অতপর আত্মসত্য প্রতিপালনের জন্য নবদ্বীপে গমন করেন। উদ্দেশ্য, গৌড়েশ্বরকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা। এদিকে মাধবাচার্য্য রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন যে তুকীদের দমনের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ তারা নবদ্বীপের আশেপাশে চলে এসেছে। জবাবে সভাপণ্ডিত দামোদার তাঁকে জানান, যে যেহেতু বিষ্ণুপুরাণে (শাস্ত্রে) আছে তুর্কী বীররা এদেশ আক্রমণ করবে তাই যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নাই, এতে করে মাধবাচার্য্য ক্ষুব্ধ হলে ধর্ম্মাধিকার পশুপতি বলেন যে, যকন আসলে তারা যুদ্ধ করবেন। এই কথায় মাধবাচার্য্য সন্তুষ্ঠ হন এবং এই কাজের সহযোগিতার জন্য তিনি তাঁর শিষ্য বরিপুরুষ মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন। তুর্কী দমনের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে অবস্থা করেন। নবদ্বীপে অবস্থঅনকালে হেমচন্দ্রের মনোরমা নামে এক মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে যাকে তিনি ভগ্নি বলে সম্বোধন করে। এই মনোরমা তাঁকে তুর্কিদের সন্ধান দেবেন বলে আশ্বাস দেন। এদিকে মৃণালিনী মিথ্যা অপবাদে ঋষিকেশের বাড়ি হতে বিতাড়িত হয়ে গিরিজায়াকে সঙ্গে করে হেমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করেন।

গৌড়দেশের ধর্মাধিকার পশুপতি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বৃদ্ধ রাজার রাজকার্যে অপারগতার কারণে তিনি ছিলেন গৌড়রাজ্যের সর্বেসর্বা। তাঁকে দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর বলে মেন করা হতো এবং তিনি ভবিষ্যতে গৌড়ের রাজা হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করতেন। এই উদ্দেশ্যে তুর্কি বীর বখতিয়ার খলজির বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মুহাম্মাদ আলীর সঙ্গে গোপনে গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। পশুপতির প্রেয়সী ছিল মনোরমা, সুন্দরী তেজয়িণী প্রতিভাময়ী ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী। তুর্কীদের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে পশুপতির ষড়যন্ত্রের কথা মনোরমা জানতে পেরে হেমচন্দ্রকে জানায়, এতে পুশপতির চর হেমচন্দ্রকে বন্দী করলে পরে মনোরমার সাহায্যে মুকজত হন। মনোরমা হেমচন্দ্রকে জানায় যে যবনদের সংখ্যা ২৫ হাজার এবং তাদের শিবির নগরের উত্তরে। হেমচন্দ্র অশ্ব সজ্জিত হয়ে শত্রু শিবির

অভিমুখে রওনা করলে পথিমধ্যে শান্তশীল কর্তৃক আহত হন। এ অবস্থায় শিবির অভিমুখে যাত্রা স্থগিত করে নগরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দুর্বল অবস্থায় একটি কুটিরের সামনে বসে ঘুমিয়ে পড়েন। এখানে মৃণালিনী তাঁকে দেখতে পায়। মৃণালিনী জানতো হেমচন্দ্র যবনদের ধ্বংস না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে না, তাই মৃণালিনী হেমচন্দ্র জেগে উঠার আগেই চলে যায়। এদিকে ঋষিকেশের বাড়ি থেকে মৃণালিনীর বিতরণের সংবাদ হেমচন্দ্র মৃণালিনী কুলটা, হেমচন্দ্রের সঙ্গে মনোরমার এ নিয়ে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়; যদিও পরবর্তীতে তা দূর হয়।

একদিন নগরবাসী অবাক দৃষ্টিতে দেখলেন, অপরিচিত সতের (১৭) জন পুরুষ অশ্বারোহী রাজভবনাভিমুখে যাত্রা করছে (বেলা প্রহরেকর সময়) নগরবাসী জানলো তারা যকন রাজপুত্র। পশুপতির আজ্ঞাক্রমে ও সেই পরিচয়ে তারা নির্বিঘ্নে নগরের মধ্যে প্রবেশ করে। দ্বার রক্ষীদেরও তারা একই কথা বলে যে, তারা যবন রাজদূত, গৌড়েশ্বরের সাথে দেখা করতে এসেছে। দ্বার রক্ষিরা বাঁধা দিলে সর্বাগ্রে একজন খর্বকায়, দীর্ঘবাহু কুরূপ যবন (বখতিয়ার খলজি) তাদের আক্রমণের নির্দেশ দিলে রক্ষীদের হত্যা করে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করে। এই সংবাদে বৃদ্ধ রাজা (লক্ষ্মণসেন) ভীত হয়ে পিছন দ্বার দিয়ে নৌকাযোগে সুবর্ণ গ্রামে (সোনার গাঁও) পালিয়ে যায় এবং গৌড় তুর্কীদের হস্তগত হয়। রাজ্য দখলের পর সন্ধির শর্তানুযায়ী পশুপতি বখতিয়ার খলজিকে তার উপর রাজ্যভার অর্পণের প্রস্তাব করলে বখতিয়ার খলজি তাকে মুসলমান হওয়ার প্রস্তাব করে। এতে করে পশপতি বিস্মিত হন এবং একসময় আগুনে আত্মাহুতি দেন। তার সাথে মৃণালিনী ও চিতার সহমরণ বরণ করে। এদিকে বিনা যুদ্ধে যবন বাংলা দখল করলে হেমচন্দ্র যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে মাধবাচার্য্যের পরামর্শে নবদ্বীপের দক্ষিণে নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী মিনাত্মক পরিণতির মাধ্যমে উপন্যাসের সমাপ্তি টানেন।

বলাবাহুল্য বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের ঘটনাকে বঙ্কিমচন্দ্র এই রোমান্টিক উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। তবে প্রকৃত ইতিহাস থেকে কিছুটা অতিরঞ্জিত করেছেন হয়ত তা গল্পের প্রয়োজনে। যেমন বখতিয়ার খলজির বিশ্বস্ত প্রতিনিধির সঙ্গে গৌড়ের অধিপতির ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে উপন্যাসে। কিন্তু কোনরূপ ষড়যন্ত্র করে নয়, বখতিয়ার খলজি বঙ্গবিজয় করেছেন, আপন দক্ষতা ও প্রতিভা বলে। আবার পশপতিকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত করার প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে, যা ইতিহাস সম্মত নয়। ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার ঐতিহাসিক সততার দেখা মিলবে না। যুগে যুগে এই ধর্মের সাম্য, মৈত্রী, সহমর্মিতা ও সহনশীলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন এবং যা আজও অব্যাহত আছে।

কেন জানি বঙ্কিমচন্দ্র বারবার এই জোপূর্বক ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি এনেছেন তাঁর উপন্যাসসমূহে। প্রথম জীবনে ইউরোপীয় জীবন মহিমায় মুগ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। কখনও তিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁস, কখনও বা বেদ উপনিষদ, আবার কখনও সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সামান্তবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু জাগরণের প্রতি উৎসাহিত হয়েছেন যা তার শিল্প ও সাহিত্যিকে করেছে প্রশ্নবিদ্ধ।

বখতিয়ার খলজি বঙ্গবিজয়ের ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত মিনহাজ-ই-সিরাজের লিখিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' হতে ধারণা নিয়েছিলেন। যদিও তিনি পুরোপুরি মিনহাজ এর উপর আস্থা রাখতে পারেননি। নিম্নলিখিত উক্তিতে এর প্রমাণ মেলে ------ বৎসর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউদ্দিন এইরূপ লিখিয়া ছিলেন। ইহার কতদুর সত্য কতদুর মিথ্যা তাহা কে জানে? যখন মুনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমান কর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হয়েছিল,তখন সিংহের হস্তে চিত্র ফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মুষিকতুল্য হইতে সন্দেহ নাই। মন্দ ভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বল, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্র ফলক।"[৫১] ১৭ জন সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খলজি রাজা লক্ষণ সেনকে পরাভূত করে বঙ্গ বিজয় করেন। এই সত্যকে মেনে নিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বঅভিমানে আঘাত লাগে তা তার উক্তি থেকেই বুঝা যায়। আর সেই ইতিহাস লেখক যদি হন যবনদের একজন তাহলে তো কথাই নেই।

দেখা যাক মিনহাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয় সম্পর্কে কি উল্লেখ আছে। সংক্ষেপে বর্ণিত হলো: ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার দখলের পর একটি সেনাবাহিনী গঠন করে বিহার থেকে অগ্রসর হলেন। তিনি এমন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন যে যখন তিনি অতর্কিতভাবে হঠাৎ 'নোদীয়হ' পৌছিলেন তখন মাত্র ১৮ জন ঘোড় সওয়ার তাঁর সঙ্গে আসতে পেরেছিল, বাকি সৈন্যরা পিছনে আসছিল। মুহম্মদ বখতিয়ার স্বেচ্ছায় কোন লোকের বিরক্তি উৎপাদন করলে না এবং শান্তিপূর্ণভাবে কোন বড়াই না করে চলতে লাগলেন যাতে তিনি কে এই বিষয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে না পারে। জনসাধারণ মনে করল তিনি ব্যবসায়ী, বিক্রী করার জন্য ঘোড়া নিয়ে এসেছেন। এই কৌশলে তিনি বায় লখমনিয়ার প্রাসাদের কাছে এসে তরবারি বের করে আক্রমণ করেন। তখন রায় মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছিলেন, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সোনারও তরবারি বের করে আক্রমণ করেন। তখন রায় মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছিলেন, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সোনারও রূপার পাত্রে খাদ্য ভরে তার সামনে রাখা হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর প্রাসাদের দরজায় ও নগরে একটা চিৎকার উঠে, কি ঘটেছে তা বুঝবার আগেই মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি তীব্র বেগে প্রাসাদে ঢুকে তলোয়ার দিয়ে কয়েকজনকে বদ করলেন। রায় খালি পায়ে প্রাসাদের পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে গেলেন প্রচুর

ধনরত্ন এবং অসংখ্য হাতি তাদের হস্তগত হয়। ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্যবাহিনী এসে পৌছিলে সমস্ত নগরী দখল করেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য লাভ করেন। রায় লখমনিয়া সঙ্কনৎ ও বঙ্গ অভিমূখে গেলেন। মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি রায়ের (লখমনিয়া) রাজ্য অধিকার করে 'নোদীয়হ' ধ্বংস করলেন এবং লখনৌতিতে তাঁর শাসন কার্যের কেন্দ্র স্থাপন করলেন। তিনি চারপাশের স্থানগুলি তাঁর অধিকারে আনলেন। এখানে উল্লেখ্য লখমনিয়া লক্ষ্মনসেনকে বুঝানো হয়েছে এবং ' নোদীয়হ' হচ্ছে নদীয়া বা নবদ্বীপ। মিনহাজ তার বিবরণিতে শুধুমাত্র ১৮ জন সৈন্যের কথা লিখেননি যা নিয়ে অনেকে নানা বির্তক করেছেন এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মিনহাজ নিজেই তার লেখায় বলেছেন মুহম্মদ বখতিয়ার এতদ্রুত গতিতে এসেছিলেন যে মাত্র ১৮ জন সৈন্য তার সঙ্গে এসেছিলেন এবং বাকি সৈন্যরা পরে এসে যোগ দিয়েছেন। যদুনাথ সরকারের মতে, বখতিয়ার সম্ভবত তেলিয়াগড়ি গিরিপথ দিয়ে না এসে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল পার হয়ে খুব ক্ষিপ্রগতিতে নদীয়ায় এসে পৌঁছেছিলেন। মিনহাজ লিখেছেন ও ঐ ১৮ জন সৈন্যকে লোকেরা অশ্ব বিক্রেতা বলে মনে করেছিল। এ সম্পর্কে যদুনাথ সরকার বলেন, The Surprise of a city by foreign soldiers dismissed as an impossible figment of the to imagination."[৫২]

প্রশ্ন হচ্ছে তবকাৎ-ই-নাসিরীতে বর্ণিত এই ঘটনা কতখানি সত্য? এই নিয়ে অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন এবং ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'History of Bengal', Vol-1, 'History of Ancient Bengal' এবং যদুনাথ সরকারের 'The History of Bengal', (Vol. 11, 1998). 'মৃণালিনী' উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র ছিল শুধুমাত্র রাজা লক্ষ্মণসেন এবং বঙ্গ বিজেতা বখতিয়ার খলজি। এছাড়া অন্যান্য চরিত্র ছিল লেখকের কাল্পনিক এবং গল্পের প্রয়োজনে সৃষ্ট। দুটি বিষয়ে তিনি গোঁড়াহিন্দুয়ানীর পরিচয় দিয়েছেন। এক, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে দেখিয়েছেন কিভাবে বখতিয়ার চাপ সৃষ্টি করে পশুপতিকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্ট করেছেন (এইরূপ তিনি ' দুর্গেশনন্দিনী' ও কপালকুণ্ডলাতেও দেখিয়াছেন)। কিন্তু মিনহাজ-ই-সিরাজ হতে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো ঐতিহাসিকের মতামতে এর সত্যতা পাওয়া যায় না। দুই পশুপতির চিতায় মনোরমার সহমরণের মাধ্যমে বঙ্কিম সেই সময়ের হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

বঙ্কিমচন্দ্র বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়কে উপজীব্য করে 'মৃণালিনী' উপন্যাসখানি লিখে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণসমূহে ঐতিহাসিক শব্দটি বাদ দেন। অন্যান্যদের মত হয়ত তিনিও মিনহাজউদ্দিনের বঙ্গ বিজয়ের বিবরণকে কিংবদন্তি বলে মনে করেছেন (যদিও পরবর্তীতে সত্য বলে প্রমাণিত)। এ

সম্পর্কে শ্রী প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "এখানে বঙ্কিমের মন অবিশ্বাস ও বিশ্বাসের মাঝামাঝি, তবে অবিশ্বাস জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। পরে অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, আর এই পরিবর্তনের খুব বেশী সময়ের প্রয়াজন হয়নি। মৃণালিনীর প্রকাশ ১৮৬৯-এ, রচনা কিছু আগে। সামান্য কয়েক বছর পরে বঙ্গদর্শন পত্রে এবং আরও কিছু পরবর্তীকালে প্রচারপত্রে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর যে- সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাসও অবিশ্বাস দুই-ই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে মিনহাজউদ্দিনের কিংবদন্তীর উপরে স্থাপিত উপন্যাসকে "ঐতিহাসিক বলে চালানো তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। কাজেই মৃণালিনীর আখ্যাপত্র থেকে ঐতিহাসিক শব্দটি বাদ পড়লো।"[৫৩] মৃণালিনী ঐতিহাসিক উপন্যাসের মানদন্ডের মধ্যে পড়ে কিনা? অথবা একটি উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে আখ্যায়িত করতে হলে যে সব উপদানের প্রয়োজন তা মৃণালিনীতে ছিল কিনা সেটি আপলোচনার বিষয় হতে পারে। তবে মিনহাজ-ই-সিরাজের বঙ্গ বিজয়ের ইতিহাস কিংবদন্তি নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লিখছিলেন তখন তথ্য সংকট ছিল মৃণালিনী (১৮৬৯ খ্রিঃ) প্রকাশিত। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণার মাধ্যমে সত্য ঘটনা উৎঘাটিত হয়। এই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি হচ্ছে-

১. Jalunath Sarkar এর 'The history of Bengal', Vol-11, 1948.

২. Dr. Romesh Chandrah Moyjumder এর 'History of Bengal', Vol-1 ও History of Ancient Bengal'.

৩. কে. এম. রইছউদ্দিন খান, ১৯৮৬ প্রকাশকাল।

৪. সুখময় মুখোপাধ্যায়ের, 'বাংলার ইতিহাস' প্রকাশকাল-২০০০ খ্রীঃ।

উল্লিখিত গ্রন্থের লেখকগণ মিনহাজের বঙ্গবিজয়ের বিবরণকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন।

মীনহাজ বখতিয়ার খলজির বিহার ও বাংলা অভিযানের বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন লক্ষণাবর্তীতে বসে, যা পূর্বে বখতিয়ারের সমসাময়িক ও প্রত্যক্ষদর্শী লোক জীবিত ছিলেন। মিনহাজ তাদের অনেকের দেখা পেয়েছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছিলন। তাই তিনি সূত্র হিসাবে 'বিশ্বাসী' লোকদের উক্তি'র উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ভাবতে পারেননি যে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠবে। বখতিয়ার ১৮ জন সৈন্যসহ নদীয়ায় প্রবেশ করেন এবং লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদের হানাদেন, অতর্কিত আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে তিনি পলায়ন করেন, এই বিষয়টি মিনহাজের বিবরণে সেভাবে বর্ণিত আছে মোটামুটি সেভাবে ঘটেছিল বলে মেনে নেয়া হয়েছে। বখতিয়ার যখন ১৮

জন সৈন্য নিয়ে লক্ষণসেনের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন তখনই তাঁর পেছনের সৈন্যদলের শহরে প্রবেশ ঘটে। অল্প সময়ের মধ্যে বখতিয়ারের সমস্ত সৈন্য নদীয়া শহরে প্রবেশ করে এবং খুব সহজেই নদীয়া বিজিত হয়েছিল। তবকাৎ-ই-নাসিরীর বর্ণনায় বখতিযার ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার জয় করেছিলেন এবং পরের বছর অর্থ্যাৎ ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া এর পরের বছর ৬০১ হিজরী ১৯শে রমজান অর্থাৎ ১০ই মে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় অর্থ্যাৎ রক্ষণাবর্তী জয় করেন। এসবই এখন প্রমাণিত। "বখতিয়ার খলজির একটি নব-আবিস্কৃত টঙ্ক (স্বর্ণমুদ্রা) থেকে গৌড় জয়ের তারিখ জানা যায়"। এই মুদ্রা এই পযন্ত তিনটি পাওয়া গেছে সেগুলি, দিল্লী, লন্ডন ও ওয়াশিংটন ডি.সি-তে (স্মিথসোনিয়ান যাদুঘরে) রক্ষিত আছে।"[৫৪]

বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়কে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখে ক্ষান্ত হন নাই, পরবর্তীতে এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি তার অবিশ্বাস জন্ম নেয় এবং বিভিন্ন লেখনিতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। যেমন- বঙ্গদর্শন, পত্রিকা, বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রবন্ধ প্রভৃতিতে উল্লেখ করেছেন- রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন "সতের জন্য অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়ালি, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিনহাজউদ্দিন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস করনা। কেননা অসম্ভব কথা। আর মিনহাজউদ্দিন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লান বদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস করনা, কিন্তু সে সাত শত বৎসর মরিযা গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জাননা, তথাপি তুমি তাহার কথা বিশ্বাস কর। আমি বলিতেছি আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি। আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি। আর মিনহাজউদ্দিনের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি, কি স্বকপোল কল্পনার উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এইমাত্র কারণ যে, সাহেবেরা সেই মিনহাজউদ্দিনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজীতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী বিশ্বাস না করিবে কেন? তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করনা, তাহার কারণ এই যে ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে। আরিস্টটল হইতে মিল পর্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালী। তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতের জন লোক লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমত? যদি তাহা না হয় তবে হে চাকজরি প্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর? বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খলজি যে বাংলা জয় করেন নাই, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক। বখতিয়ার খিলজি বহুতর সৈন্য লইয়া বহুতর নৈ্য লইয়া বাঙ্গলা জয় করিতে পারেন নাই। বখতিয়ার খিলজির পর সেন বংশের

রাজাগণ পূর্ব বাঙ্গলায় বিরাজ করিয়া অর্ধেক বাঙ্গলা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তর বাঙ্গলা দক্ষিণ বাঙ্গলা কোন অংশই বখতিয়ার খিলজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবর্তী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদশে ভিন্ন বখতিয়ার খিলজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।"[৫৫]

উল্লেখ্য ইতিহাসে ১৮ জন সৈন্যের বর্ণনা থাকলেও বঙ্কিম সবসময় ১৭ জন সৈন্যের কথা বলেছেন। হয়ত তিনি বখতিয়ারকে বাদ দিয়ে সতের জন উল্লেখ করে থাকেন এবং বখতিয়াসহ ১৮ জন সৈন্য।

উপরের উক্তিগুলি হতে বুঝা যায় যে তিনি কিছুতেই এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে মেনে নিতে পারছিলেন না যে, একজন মুসলমান তার স্বজাতীয় রাজাকে মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে পরাজিত করতে পারে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ক্ষিপ্র গতিতে Surprise attack করলে রক্ষিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় এবং আক্রমণকারীরা কার্যোদ্ধার করে। এইরূপ ঘটনা সর্বকালেই ঘটতে দেখা গেছে। মুঘল আমলে নিরাপত্তা ভেদ করে শিবাজী একাই শায়েস্তা খাঁনকে আহত করেছিলেন। আধুনিক কালে হিটলারের ঝটিকা-বাহিনী কর্তৃক বন্ধী মুসোলিনীকে উদ্ধার ইত্যাদি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যদুনাথ সরকারও ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক মনে করেছেন এই ব্যাপারে তাঁর উক্তি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বখতিয়ার বঙ্গবিজয় সম্পর্কে বলেছেন যে বখতিয়ার কখনোই বঙ্গবিজয় করতে পারে নাই লক্ষ্মণাবর্তীর আশেপাশে ছাড়া, আর সেনবংশের রাজাগণ পূর্ব বাংলায় বিরাজ করে অর্ধেক বাংলা শাসন করেছেন এর ভূরি ভূরি ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে বলে তিনি বলেছেন। বখতিয়ার উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা দখল করে লক্ষ্মণাবর্তীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ঐতিহাসিক সত্যটি বঙ্কিমচন্দ্র মানতে কেন রাজি নন তা বোধগম্য নয়। দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলা লক্ষণসেন ও তার বংশধরগণের অধিনে ছিল, তুর্কী সৈন্যবাহিনী যে অঞ্চলে ঘোড়া চালিয়ে যেতে পেরেছে সে অঞ্চল পদানত করেছে। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ ছিল নদী বিধোত তাই শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করার পর মুসলমানরা এই অঞ্চল জয় করে এবং এ জন্য দীর্ঘ সময় লেগেছিল। তবে এয়োদশ শতাব্দীর শেষে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জয় করে এবং এ জন্য দীর্ঘ সময় লেগেছিল। তবে এয়োদশ শতাব্দীর শেষে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ অঞ্চলে (দক্ষিন ও পূর্ব বাংলা) মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ড. নীহারঞ্জন রায় তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন "মনে হয় এয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ কোন রকম করিয়া মুসলমান অধিকারের তাহ হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল কোথাও সেনবংশীয় রাজাদের একনায়কত্বে, কোথাও অন্য কোন স্থানীয় রাজ্য বা সামন্তের নায়কত্বে। নদী বহুল

জলমগ্ন ভাটি অঞ্চলে মুসলমান অভিযাত্রীরা বহুদিন পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করতে পারে নাই। কিন্তু এয়োদশ শতকের পর বঙ্গদেদেশর কোথায় আর কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র হিন্দু নরপতির নাম শোনা যাইতেছে না।"[৫৬]

বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে লিখেছেন ইংরেজ ইতিহাস লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্বে দেখানো হয়েছে সে কথার কোন মূল নাই; বালক মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র। বস্তুত মুসলমানরা সহজে বাঙ্গালা জয় করিতে পারেন নাই, কেবল লক্ষ্মণাবর্তীই জয় করিয়াছিল। তাহারা তিনশত বৎসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই।"[৫৭]

এখানে একটি বিষয় পরিস্কার যে 'মৃণালিনী' রচনার পর বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে বখতিয়ার খলজি বঙ্গবিজেতা নন, কাজেই মৃণালিনীকে তিনি আর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নয় উপন্যাস মনে করতেন। যদিও উপন্যাসে বখতিয়ার খলজির লক্ষ্মণাবর্তী জয় ছাড়া আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল না। এমন কি তৎকালীন সমাজ ও পরিবেশের কোন উল্লেখ নাই 'মুণালিনী' উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে শ্রী প্রথমনা বিশী লিখেছেন "ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমরা ইতিহাসের পাত্রে গল্পকে চাই। পাত্রটা সোন তামা লোহা যারই হোক না কেন, গল্পটা সোনার হওয়া আবশ্যক। কেননা ঐ গল্পের মূল্যেই উপন্যাসের মুল্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে রমেশ দত্ত এবং পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও রাখাল দাসের বন্দ্রোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাত্রগুলি সোনার, কাহিনী সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির পাত্র কোন ধাতুতে গঠিত? মৃণালিনীর কাহিনী অংশ স্বর্ণময়, কিন্তু পাত্রটি? আমি যতদুর বুঝি পাত্রটি আদৌ ধাতুময় নয়, নিতান্তই পত্রপুট। পত্রপুটে স্বর্ণময় কাহিনী বিন্যস্ত করে তিনি পাঠকের সম্মুখে ধরেছেন, পত্রপুট বলার অর্থ-পাত্রটি দৃঢ় নয় তাতে ধাতব দার্ঢ্য নেই, আছে পাতার নমনীয়তা। ধাতুর অভাবে পাতা। অভাবের কারণ স্পষ্ট। মৃণালিনী রচনার সময় লক্ষ্মণসেনের কালও সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। গ্রন্থ খানিতে লক্ষণসেন ও বখতিয়ার খিলজি ব্যতিত অপর কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নাই, এমন কোন চালচিত্র নাই, যাকে তাৎকালিক ও তাৎস্থানিক বলে গ্রহণ করা যায়।"[৫৮]

ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুটি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন একটি নিত্য সত্য ও অপরটি ঐতিহাসিক রস। অর্থাৎ মানব স্বভাবের মধ্যে যে নিত্যরস আছে তার সঙ্গে ইতিহাস মিশিয়ে ঐতিহাসিক রসের সৃষ্টি হয়। "নিত্যরসে ও ইতিহাসে মেশানোর একটি অলিখিত অনুপাত আছে, তারই তারতম্যে সাফল্য বা অসাফল্য। সকল

লেখকের এটি আীর্ধগত নয় ফলে অনেক সময়েই ঐতিহাসিক উপন্যাস হতে গিয়ে ইতিহাস হয়ে যায় কিংবা সাধারণ ধরনের একটা সামাজিক উপন্যাসে দাঁড়ায়। এই কারণেই প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা এত অল্প।"[৫৯]

এবার দেখা যাক বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে ইতিহাস ব্যবহার করেছেন এবং কিভাবে ইতিহাসের সঙ্গে মানব স্বভাবের নিত্যরস মিশিয়ে ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করেছেন। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে তিনি একটি মাত্র ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করেছেন। বখতিয়ার খলজি কতৃক লক্ষ্মণাবর্তী অধিকার ও সেন রাজার পলায়ন। এছাড়া মৃণালিনী উপন্যাসে আর কোন ঐতিহাসিক তথ্য নেই। সাধারণত ঐতিহাসিক উপন্যাসে তৎকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক চিত্র াঙ্কিত থাকে 'মৃণালিনী-তে' সেটিরও অভাব রয়েছে। একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তাহলো বখতিয়ার খলজি নদীয়া অধিকার করলো অথচ কোন প্রজাই প্রতিরোধার্থে সামান্য উদ্যমী হয়নি। এটিই ছিল সেই সময়ের রাজনীতির সঠিক চিত্র। কারণ রাজ্য রাজার সম্পত্তি বলে মনে করা হতো। কারণ এতে জনগণের কোন অংশ গ্রহণ ছিল না। রাজা ও প্রজার মধ্যে অসীম দুরত্ব বিরাজ করত। তাছাড়া কখনও কে রাজা হলো সেটি নিয়ে প্রজাদের মাথা ব্যাথা ছিল না। কারণ তারা শাসিত ও শোষিত হত একইভাবে। তাই রাজার হয়ে সাধারণ জনগণ কখোনই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতো না, যা কিছু প্রতিরোধ সৈন্যরাই গড়ে তুলতো বা রাজার হয়ে যুদ্ধ করতো, জেতে ভাল আর হারলে রাজার ক্ষতি তাই রাজা লক্ষণসেনের প্রজারা ছিল নির্বিকার ও উদাসীন। এতো গেল সাধারণ প্রজাদের কথা, এবার দেখা যাক মৃণালিনী উপন্যাসে অসাধারণ লোকদের রাজা পরিবর্তনে যাদের ভূমিকা, এবং লাভ ও ক্ষতির আশংকার সাথে জড়িত তাদের মনোভাব কিরূপ ছিল? এটুকু বলা যায় প্রতিরোধমূলক ছিল না। বরং উপন্যাসে দেখানো হয়েছে সভাপণ্ডিত ও পশপতির জন্যই বখতিয়ারের পক্ষে বঙ্গবিজয় সহজ হয়েছে। সভাপন্ডিত দামোদার তুর্কী প্রতিরোধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, মাধবাচায্যের এইরূপ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, শাস্ত্রে আছে তুর্কীয়রা এদেশ অধিকার করবে। যেহেতু শাস্ত্রে এইরূপ আছে কাজেই অবশ্যই তা ঘটবে সুতরাং যুদ্ধ করে লাভ কি? সেই সময় জনশ্রুত ছিল যে কোন এক জ্যোতিষী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে বাংলা এক সময় তুর্কীদের অধিকারে চলে যাবে এবং সেই তুর্কীর দৈহিক বর্ণনাও দিয়েছিলেন যা বখতিয়ার খলজি সঙ্গে মিলে। আর সেই জন্যই লক্ষ্মণসেন কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত সেই জনশ্রুতি থেকেই প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। তবে এটিও সত্যি যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের ঘটনা জ্যোতিষ প্রভাবিত। হতে পারে এটি তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ফল। এবার পশুপতির আচরণগত দিক আলোচনা করা যেতে পারে। পশুপতি ছিলেন রাজ্যের কমান্ডার-ই-চীফ অর্থাৎ কিনা দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর। সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র তার

হাতে এবং তার আদেশ ছাড়া সৈন্যরা অগ্রসর হয় না। যৌবনাকালে লক্ষ্মণসেন বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু এখন ৮০ বছরের অশতিপর বৃদ্ধ রাজা পুরোপুরিভাবে প্রজাসামন্তের উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে পারেন এবং ইচ্ছে করলে শত্রুকে সহায়তা করতে পারেন। পশুপতি শোষোক্তটিই করেছিলেন। শত্রুদুত মুহাম্মদ আলীর মাধ্যমে বখতিয়ার খলজির সাথে যোগযোগ করে তার অনুকুলে সবকিছু ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কেন তিনি এমন করেছিলেন? সহজ উত্তর রাজ্যলোভ। সেইসময় রাজপুরী অধিকার হওয়া মাত্রই রাজ্য অধিকার হওয়া। বখতিয়ার খলজি কতৃক নিযুক্ত শাসনকর্তারূপে তিনি বাংলার সিংহাসনে আসীন হবেন। তিনি বিধবা (মনোরমা) বিবাহ করতে চান, যা রাজানুশাসনের অধিকারী না হলে সম্ভবপর নয়।

ইতিহাসের আশ্রয়ে একটি অনৈতিকহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যেমন মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের পিতৃরাজ্যাধিকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। মাধবাচার্য্যের উপদেশে তিনি বখতিয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা করেন। এবং সেই লক্ষ্যে তিনি গৌড়ে আসেন লক্ষ্মণসেনকে সাহায্য করার জন্য যদিও তার প্রয়োজন হয়নি। বখতিয়ার খলজি মগধ জয় করেছিলেন সত্য তবে হেমচন্দ্রের মত কোন যুবরাজের সম্মুখীন হননি। তাছাড়া সেই সময়ে ভারতরে অঙ্গরাজ্যগুলির রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। তাছাড়া কোন রাজ্য বহি:শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাকে সাহায্যের জন্য অপর কোন রাজ্যের বাজার অগ্রসর হওয়ার আশা ছিল অবান্তর। এমতাবস্থায় মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্র গৌড়ে যবণাক্রমাণে এগিয়ে এসে সাহায্য করবেন এটি ইতিহাস সম্মত নয়। তবে হেমচন্দ্রের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের কালের আকাংখার বহি:প্রকাশ ঘটেছে। হেমচন্দ্র আসলে সেযুগের নয়, বঙ্কিমের যুগের ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ যার মধ্যে স্বাধীনতার আকাংখা এবং হিন্দুরাজ্য স্থাপনরে অঙ্কুর জন্মেষিত হয়েছে। তবে উপন্যাসে হেমচন্দ্রের চরিত্রটি অস্পষ্ট। তিনিই গল্পের নায়ক কি না। তাঁর মধ্যে অনেক বিরোচিত গুণ আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও তার বহি:প্রকাশ ঘটতে দেখিনি। শাধবাচার্য্য তাকে বিজয়ী যবনদের প্রতিদ্বন্দ্বি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রণয়যোম্মত্ত এই যুবক মৃণালিনীর প্রেমেই মগ্ন হয়েছিলেন। মাধবাচার্য্য তাঁকে গৌড়ে নিয়ে যান এবং উপবনগৃহে অবস্থান নেন গৌড়েশ্বরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু সেখানে হেমচন্দ্রকে গৌড়ের সৈন্যের সংস্পর্শে আসতে বা যবন নিধনে সভাসদদের সাথে কোন পরামর্শ করতেও দেখা যায়নি। বরং উপবন-গৃহে বসে মৃণালিনীর সংবাদের জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। অনেক সময় মনে হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র এমন একজন লোকের চিত্র অংকন করতে চেয়েছিলেন যাকে বখতিয়ার খলজির উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বি বলে মনে হতে পারে। দৃশ্যত তা হয়নি। বঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে হেমচন্দ্র কোনভাবেই জড়িত ছিলেন না। তবে গিরিজায়া বুঝতে পেরেছিলেন হেমচন্দ্রের বীরত্ব কতখানি ফাঁপা ছিল। গিরিজায়াকে হেমচন্দ্র বেত্রাঘাত করতে চাইলে জবাবে গিরিজায়া বলেছিল "বীর পুরুষ বটে! এই রকম

বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুজি নদীয়া এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না- এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানদের জুতা বহিতে, আর গরীব-দুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে"।[৬০] যাইহোক উপন্যাস শেষ হয়েছে হেমচন্দ্রের নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের পর মাধবাচার্য্য তাকে নতুন রাজ্য স্থাপন এবং যবন দমনোপযোগী সৈন্য সৃষ্টির পরামর্শ দিলেন। সেই পরামর্শ অনুসারে হেমচন্দ্র নবদ্বীপ হতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন মৃণালিনী, গিরিজায়া এবং দিগ্বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে। তবে এখানে একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে সামনে এনেছেন হেমচন্দ্রকে অবলম্বন করে। তাহলো, লক্ষ্মণসেন পরাজিত হওয়ার পর বঙ্গের দক্ষিণে বিক্রমপুরে চলে যান এবং এই দক্ষিণ বাংলায় তিন তিন বৎসর শাসন করেন। এরপর তার মৃত্যু হলে তাঁর বংশধরগণ দীর্ঘদিন এই দক্ষিণ বাংলা শাসন করেন।

P› ‘ †kLi

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্স 'চন্দ্রশেখর'। একই সাথে তিনি সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপাদান সংযুক্ত করেছেন এই উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসের প্রতি কৌতুহল সুবিদিত। ইতিহাস প্রিয় এই লেখক লেখার উপজীব্য বিষয় পেতে বার বার হাত বাড়িয়েছেন ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে। এবার তিনি বাংলার ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট যুগকে কাহিনীর পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বাংলার শেষ স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাসিমের সময়কালকে কেন্দ্র করে তিনি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করেছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন ইংরেজ এবং নবাব মীর কাসিমের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে। আমরা সকলে অবগত আছি বাংলার ইতিহাসে এই সময়ের গুরু সম্পর্কে। পলাশীর যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে গোড়াপত্তন করেছিল বক্সারের যুদ্ধে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। বাংলার মাটিতে ইংরেজ শক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাটদের উদাসীনতা অদূরদর্শিতা ও সুষ্ঠু বাণিজ্য নীতি না থাকায় ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করার অনুমতিসহ বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। সুবাদার শাহ সুজা, সুবেদার শায়েস্তা খান মুগল সম্রাট ফররুখ শিয়ার এবং সম্রাট প্রথম শাহ আলম বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজদের এই উদারতা এবং অদূরদর্শিতাকে পুঁজি করে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে কুঠি তৈরী করে একচেটিয়া বাণিজ্য করতে থাকে এবং শক্তি সঞ্চয় করে উদ্ধত্য ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখাতে থাকে। তারা বাণিজ্য শুল্ক প্রদান করতে অস্বীকার করে, এমনকি এক পর্যায়ে ভারতের রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ করতে থাকে। বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে ষড়যন্ত্র করে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে মীর জাফরকে নামে মাত্র ক্ষমতায় বসায়। মীর জাফর ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকলে তাঁকে অপসারিত করে তাঁরই জামাতা মীরকাসিমকে বাংলার মসনদে বসান। মীর কাসিম ছিলেন দুরদর্শী রাজনীতিবিদ, স্বাধীনচেতা ও প্রকৃত দেশ প্রেমিক নবাব। মীর কাসিমের এই স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্যই

ইংরেজরা ভবিষ্যাতে বিপদের সম্ভাবনা দেখতে পায় এবং নবাবের বিরোধিতা শুরু করে। ইংরেজ এবং মীর কাসিমের এই বিরোধের এই ঐতিহাসিক অংশটুকু 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। যদিও স্পষ্ট কোন রাজনৈতিক বক্তব্য তাতে ফুটে উঠেনি। কাহিনীতে বাড়তি রোমান্স হিসাবে ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি প্রেমের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন নবাব ও দলনি বেগমের মধ্যে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কাহিনীর দুটি ধারা শৈবলিনী প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর একদিকে অপরদিকে মীর কাসিম দলনী বেগমও ইংরেজ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসকে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীও প্রতাপের গল্প সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আবার যেসমস্ত জীবনের যে সমস্ত ঘটনা উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক নিবিড় নয়। তবে উপন্যাসে ইতিহাস ও কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে একটি চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়েছে যা পাঠককে মুগ্ধ করে। প্রতাপ ও শৈবলিনী প্রত্যন্ত পল্লীতে বসবাস করত। হঠাৎ চন্দ্রশেখরের আগমনে তাদের জীবনের মোড় ঘুরে যায় আবার লরেন্স ফস্টরের আগমনে চন্দ্রশেখরের ঘর ভেঙ্গে যায় এইভাবে ব্যাক্তিগত বিপর্যয় তাদেরকে ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত করে এবং সাধারণ জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে সাহস, বুদ্ধি কৌশল অপরিসীম বিস্তৃতি ও অন্যান্য সাধারণ বিশালতা লাভ করেছে। এতে ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা বিঘ্নিত হলেও রোমান্সের গভীরতা বেড়েছে।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ১৭৬২ হতে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের বাংলার রাজনৈতিক-পটপরিবর্তনের ইতিহাসের আদলে কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক চরিত্র, ঘটনাকাল এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষয় ঠিক রেখে তিনি এই উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করেছেন। তাতে মনে হয় তিনি বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন। "১৮৪৭-এ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস' পড়ে তিনি প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে কৌতুহল মিটিয়েছিলেন। এরপর তিনি বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্বের ইতিহাস জানার জন্য পড়েছেন গোলাম হোসেনের সিয়ার-উল-মুতাখখিরিণ।"[৬১] সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন আলোকে তিনি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যঅসের কাঠামো তৈরি করেছেন। চন্দ্রশেখরে ইতিহাস অংশের মূল চরিত্র মীর কাসিম মূল ঘটনা ইংরেজ ও নবাবের মধ্যকার দ্বন্দ্ব পরিশেষে এবারের পরাজয়। মৃণালিনীর মতো তিনি চন্দ্রশেখর উপন্যাসেও দেখিয়েছেন কিভাবে রাজকর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কিছু সংখ্যাক বিদেশী তাদের অসাধারণ শৌর্যবীর্য্যের দ্বারা দেশীয় রাজাকে পরাস্ত করেছেন। উপন্যাসে গুরগন খাঁ, জগৎশেঠ, অমিয়েট, জনস্টন গলস্টন প্রমুখের চরিত্রের সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবুও প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব প্রকৃতিতে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

'হুরুগণ খাঁ ঐতিহাসিক চরিত্র। কলকাতার বিখ্যাত আরমানী বণিক-খোজা পিদ্রুর ভাই গ্রেগরী ইতিহাসে গুরগন খাঁ নামে পরিচিত।[৬২] উপন্যাসে তিনি মীর কাসিমের প্রধান সেনাপতি, তার জন্মস্থান উস্পাহান জাতিতে আরমানী পূর্বে

ছিলেন একজন বস্ত্র বিক্রেতা, ক্রমে নবাবের উপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করেন যে নবাব তার উপর অনেকটাই নির্ভশীল ছিল। নবাব মীর কাসিম মনে করতেন গুরগন খাঁর সহায়তায় তিনি ইংরেজদের দমন করবেন।

এদিকে গুরগন ভবিষ্যত নবাব হবার স্বপ্ন দেখেন। পরিকল্পনা মত তিনি প্রথমে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াবেন এবং পরে মীর কাসিমকে বিদায় করে নিজেই নবাব হবেন। নবাবের স্ত্রী দলনী বেগম ছিল তাঁর বোন। গুরগন খাঁ তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে অর্থ সংগ্রহের জন্য বাংলার শেঠদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের সাথে নবাবের যুদ্ধ আরম্ভ হলে গুরগন খাঁ নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের দলে যোগ দিলে নবাব কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হন। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে গুরগন খাঁ এইভাবে চিত্রিত হয়েছেন। বাস্তব ইতিহাসেও তিনি অনুরূপ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। গোলাম হোসেন সলীমের রিয়াজ-উস-সালাতিন এ যেভাবে উল্লেখ আছে- 'গুরুগন খাঁ ইনি নবাবের (তাপথানার অধ্যক্ষ ছিলেন) প্রভৃতি সেনানায়কগণ ইংরাজের সহিত সম্মিলিত হইলেন, এজন্য তাঁহারা নির্ভয়চিত্তে রজনী যোগে নবাবের সৈন্য আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে নবাব সৈন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

এই পরাজয় অতিগুরতর হইল। মোসলমান সৈন্য অত্যন্ত দুরাস্থায় মুঙ্গেরে উপনীত হইল। এই পরাজয় বার্ত্তা নবাবের কর্ণগোচর হইলে ক্ষোভে ও নিরাশায় তাহার মুখশ্রী পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। নিজের অন্নপুষ্ট কৃতঘ্ন সেনানায়কগণের ষড়যন্ত্র হেতু তিনি ইংরাজে বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে দন্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইয়া ভয়ব্যাকুল চিত্তে আজিমাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; তৎপূর্বে গুরগুন খাঁর ইহলিলার অবসান করিয়া তাঁহার কৃতঘ্নতার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।[৬৩]

এখানে উল্লেখ্য যে গুরুগন খানের নাম বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে লিখিত হয়েছে গোলাম হোসেন সলীম এর রিয়াজ-উস-সালাতিনে- গুরগুণ খাঁ, ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বাংলাদেদেশর ইতিহাসে (২য় খন্ড) গরগণি খাঁ, কে আলীর বাংলাদেদেশর ইতিহাসে গুর্গন খাঁ এবং বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন গুরগণ খা।

গুরুগন খানের মতো সেনাপতি তুর্কী খানও ঐতিহাসিক চরিত্র। তবে পার্থক্য হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে তাঁকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন বাস্তবে তিনি তা ছিলেন না। উপন্যাসে তাঁকে ইংরেজদের আজ্ঞাবহ, নারীলোভী বিশ্বাসঘাতক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দলনি বেগমের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাওয়ার ষড়যন্ত্র করেন ফলে দলনি বেগম আত্মহত্যা

করে। দাসী কুলসুমের উক্তিতে তকী খাঁ চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এইভাবে: 'আমি এই আম দরবারে সেই পাপিষ্ঠ স্ত্রীঘাতক, মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন! সে আমার প্রভুর-পত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া আমার প্রভুকে শ্যিা প্রবঞ্চন করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নমার দলনী বেগমকে পিপীলিবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে- জাঁহাপনা ! পিপীলিকাবৎ বই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন'।[৬৪] পরবর্তীতে তকী খান নবাবের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। তবে সত্য ইতিহাসে কী খান ছিলেন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার দাবিদার। সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা ও রণকৌশলে তিনি ছিলেন পারদর্শী। তিনি কাটোয়ার যুদ্ধে বীরবিক্রমে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। একের পর এক শত্রু নিধন করে ইংরেজদের পিছু হটতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু ইংরেজদের অতর্কিত বন্দুকের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং নবাব কাটোয়ার যুদ্ধে (১৯শে জুলাই ১৭৬৩ খ্রীঃ) পরাজয় বরণ করেন গুরগন খাঁর শেষ পরিণাম উপন্যাসে দেখানো হয়নি। ইতিহাসের গুরগন খাঁ উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুঙ্গেরের পথে গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। মীর কাসিম যে তাঁর প্রতি সন্দেহপরায়ন হয়ে উঠেছিলেন উপন্যাসে তার আভাস আছে।

কাসেম আলি বলিলেন, "গুরগন খাঁ কতদূর"?
অমাত্যবর্গ বলিলে, "তিন ফৌজ লইয়া উদয়নালায় আসিতেছেন, শুনিয়াছি- কিন্তু এখনও পৌছেন নাই।"
নবাব মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, ফৌজ! ফৌজ ! কাহার ফৌজ !
একজন কে চুপিচুপি বলিলেন, 'তারি'!
অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্ন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরক খচিত ইষ্ণৎ দূরে নিক্ষেপ করিলেন- মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিড়িয়া ফেলিলে- রত্নখচিত বেশ অংগ হইতে দূর করিলেন। তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া "দলনী! দলনী" বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সংসারে নবাবী এইরূপ ৪ঃ৬৩(১) উল্লিখিত উক্তি হতে বোঝা যায় যে নবাব চর্তুদিকে তাঁর প্রতিকূল অবস্থা দেখে ভেবেছিলেন গুরগন খাঁও হয়ত তাঁর শত্রু ইংরেজদের সাথে যোগ দিয়েছেন। বাস্তবে হয়েছিল ও তাই। তিনি নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। যুদ্ধে নবাব সৈন্যের পরাজয় হলেও তকীখান যে সাহস, সমরকৌশল ও ও প্রভুভক্তি দেখাইয়াছেন তাহা ঐ যুগে সত্যিই দুর্লভ ছিল। মুঙ্গের হইতে আগত সেনাদলের নায়কেরা যদি তাঁহার সহায়তা করিতেন তবে যুদ্ধের ফল অন্যরূপ হইত। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে তকী খানের বীরত্ব ও চরিত্র আরও

উজ্জ্বল হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তকী খানের একটি অতি জঘন্য চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক ও অনৈতিহাসিক।'[৬৫]

'চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মূলকাহিনী অনৈতিহাসিক হলেও ১৭৬২ থেকে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস অর্থাৎ মীর কাসিমের পতন পর্যন্ত ঘটনাধারা এতে স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে নবাবের স্বাধীনচেতা ও প্রজারঞ্জক চরিত্রটি ফুটে তুলেছেন। যিনি ইংরেজ কোম্পানীর নির্দেশে চলতে নারাজ। নবাবের প্রজারঞ্জক ও স্বাধীনচেতা মনোভাব ইংরেজদের সাথে দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ। উপন্যাসেও এর বহি:প্রকাশ ঘটেছে- "আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজরা যে আচারণ করিতেছেন, তাহাতে তাহারাই রাজ আমি রাজ নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর। কেন আমি তাহা করিব যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব- অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কর ভাগী হইব? আমি সিরাজউদৌলা নহি- বা মীর জাফরও নহি।"[৬৬]

১৭৬০ খ্রীঃ মীর কাসিম বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর ইংরেজরা মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসান। কিন্তু মীর জাফরের অযোগ্যতা ও অকর্মন্যতায় ইংরেজ কোম্পানী তাঁর (মীর কাফর) উপর অসন্তুষ্ট হন। এই ইংরেজ কোম্পানীকে বহু অর্থ প্রদান করার পরও তাদের দাবি না মিটায় তিনিও হাপিয়ে উঠেন। রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ায় নবাবের আর টাকা প্রদানের সাধ্য ছিল না। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর ক্রমাগত অযৌক্তিক দাবির সাথে মীর জাফর পেরে উঠছিলেন না। এই অবস্থায় ইংরেজদের নতুন গভর্ণর ভ্যানসিটার্ট চট্টগ্রাম জেলা কোম্পানীকে ইজারা দেয়ার প্রস্তাব করলে মীর জাফর তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এদিকে প্রাপ্য টাকা না পেয়ে নবারের সৈন্যরাও বিদ্রোহী হলে প্রচুর টাকার মালিক মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিম টাকা প্রদান করে সৈন্যদের বিদ্রোহ দমন করেন।[৬৭] এছাড়াও ওলন্দাজদের সঙ্গে মীর জাফরের মৈত্রীস্থাপন, দ্বিতীয় শাহ্ আলমও মারাঠাদের বাংলা আক্রমণ ইত্যাদি নানবিধ কারণে অসন্তুষ্ট ইংরেজরা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর মীর জাফরকে ক্ষমতা চ্যুত করেন। নবাব মীর জাফর বাংলার ক্ষমতা হারিয়ে কলিফ তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এদিকে মীর কাশিমকে বাংলার নবাব হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে তাকে নবাব বানানো হয়। শর্তমতে নবাবকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটি জেলার রাজস্ব কোম্পনিকে ছেড়ে দিতে হয়। তাছাড়াও ইংরেজ কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীদের প্রচুর টাকা প্রদান করতে হয়। রাজকোষ প্রায় শূন্য থাকায়

ইংরেজদের পাওনা পরিশোধ করার জন্য নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল, যেমন- অনেক অভিজাত শ্রেণীর কাজ থেকে জোরপূর্বক টাকা সংগ্রহ ও জমিদারদের কর বৃদ্ধি করেছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় অনেক অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় বর্জন করেন। এই জন্য তিনি অনেক সমালোচিতও হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে সৈয়দ গোলাম হোসেন খান লিখেছেন – "সিংহাসনে আরোহনের পরপরই মীর কাসিম খান রাজস্ব দফতরে অনুসন্ধান চালিয়ে রাজকোষ শূন্য এবং তার নিজের সেনাবাহিনীকে দেয় বেতন ও মীর জাফর খানের সৈন্যদের বকেয়া বেতনের বিরাট পরিমাণ দেখে হতভম্ব ও বজ্রাহতের মত হয়ে পড়েন। এর উপরে ছিল ইংরেজ সেনাবাহিনী এবং ইংরেজ কর্মকর্তাদের নিকট বিপুল পরিমাণের দেনা। সুতরাং বাঙালার যে সব জেলা তার অধিকারে এসেছে সেগুলোর উপর তিনি সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সেই সঙ্গে ইংরেজ সেনাবাহিনীর বকেয়া বেতন প্রদানের জন্য তিনি সমগ্র বর্ধমান প্রদেশ ইংরেজদের নিকট ছেড়ে দেন এবং ইংরেজদের নিকট প্রতিশ্রুতি দেনা পরিশোধের জন্য তিনি তার নিজস্ব জহরত ইংরেজদের তাতে তুলে দেন জামানত হিসাবে।"[৬৮]

মীর কাসিম অন্যায় ভাবে যারা প্রসাদ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন তাদের অর্থ বাজেয়াপ্ত করেন কেউ কেউ স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেন। জগৎসিংহ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। গোলাম হোসেন সলীমের মতে নবাব ভীতি প্রদর্শন করে মালিকদের নিকট থেকে অর্থ ফেরত নেন এবং যার উপহার হিসাবে অর্থ অলঙ্কার পেয়েছিলেন সেই সমস্ত তিনি ভয় প্রদর্শন করে ফেরত নেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি নিজের কথাও উল্লেখ করেছেন- "নবাবের (আলিবর্দী খান) প্রিয় পাত্র হওয়ার কারণে তিনি সে সময়ে কয়েক লক্ষ টাকার অধিকারী হয়েছিলেন। সেই অভিজাত কর্মকর্তাকে মুদ্রা ও জহরত মিলিয়ে তার সমুদয় সম্পদ ফিরিয়ে দিতে বলা হলেও তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়নি। সেই কর্মকর্তার নাম ছিল গোলাম হোসেন খান।"[৬৯]

উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে তিনি বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন এবং প্রাথমিক সমস্যাসমূহ কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হন। স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাশিমের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ইংরেজদের সন্ধির শর্তানুযায়ী তাদের দাবিসমূহ পূরণ করে স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করা। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হন। ইউরোপীয় দক্ষ শিল্পিগড়ণের নির্মাতাদের উপদেশ ও নির্দেশে উৎকৃষ্ট কামান, বন্দুক ও গুলি গোলাবরুদ প্রভৃতি সামরিক অস্ত্র প্রস্তুত করেন। সেনাবাহিনীকে অশ্বারোহী পদাতিক ও গোলন্দাজ এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন এবং তাদের ইউরোপীয় যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শিতার

জন্য আমানীর মার্কার এবং ফরাসীর সমরুকে নিযুক্ত করেন। কলিকাতার বিখ্যাত বণিক খোজা পিদ্রুর ভাই গ্রেগরী মীর কাশিমের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। চন্দ্র শেখর উপন্যাসে তিনি গুরগন খাঁ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

উপন্যাসে মার্কার এবং সমরুর কথাও উল্লেখ আছে। "সমরুর প্রকৃত নাম ওয়ালটার রাইন হার্ড (Walter Reinhard। তিনি ফরাসী জাহাজের নাবিক হয়ে ভারতে আসেন এবং সুমনের (Sumner) অথবা সোমার্স (Somers) নামে ফরাসী সৈন্যদলে ভর্তি হন। সেই থেকেই সমরু নামের উৎপত্তি। তিনি পূর্বে ইংরেজ, ফরাসী, অযোধ্যার সফদরজঙ্গ ও সিরাজউদ্দৌলার অধীনে সেনানায়ক ছিলেন।"[৭০] যদিও উপযুক্ত তিনজনই পরবর্তীতে নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং এদের কারণেই নবাব উধুয়ানাথার যুদধে পরাজিত হন। ইংরেজদের প্রভাব হতে মুক্ত থাকার জন্য তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ হতে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন। মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর, সৈন্যবাহিনীকে আধুনিকীকরণ। মুঙ্গেরে সমরাস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্য নীতিতে দেশীয় বণিকদের স্বার্থ রক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে ইংরেজদেব সাথে নবাব মীর কাশিমের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের মাধ্যমে যার করুন পরিসমাপ্তি ঘটে। উপন্যাসে যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকলেও উল্লিখিত কারণসমূহ ছিল অনুপস্থিত।

প্রজারঞ্জক ও স্বাধীনচেতা এই নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর বিবাদ প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণ সম্পর্কে গোলাম হোসেন লিখেছেন-

It was acknowledged on all hands, that he had admirable qulifications that balanced his bad ones. In unravelling the intricaies affairs of Government and especially the khetty mysteries of finance, in examining and determining private difference; in establishing regtular payments for his trooops and for his household. In honorung and rewarding men aof merite and men of learing in conducting his expenditure exactly between the extrimities of parsimony and prodigatity.... the poor, defenceless landholders who in the administrator of a jankiram and a Ramnarain, had been dspossessed of their violence and hereditary estates, by the rapacious violence of short-sighted zaminders found now that the day of redress was come for them."[৭১]

একটি বিষয় উল্লেখ্য যে বঙ্কিচন্দ্র যখন উপন্যাস লিখছিলেন তখন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব বিদ্যমান। কাজেই নানা ইঙ্গিতে তিনি ইংরেজদের শঠতা কাপট্য ও কুটকৌশলের কথা বললেও সরাসরি কোন মন্তব্য করেননি। তবে তিনি নবাবের স্বাধীনচেতা ও প্রজারঞ্জক চরিত্র সম্পর্কে যেমন অবহিত ছিলেন, তেমনি ইংরেজদের কূট চরিত্র সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন। তাইতো নবাব মীরকাশিমের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। তিনি তাকে বলেছেন 'বাংলার শেষ রাজা'। তাঁর চরিত্রকে এঁকেছেন উদ্যোগী কিন্তু ভাগ্যাহত রাজা হিসেবে। যিনি ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের নানা কূটকৌশল ও চুক্তিভঙ্গের কারণে যা সম্ভব হয়নি।

ঔপন্যাসিক কিছু কাল্পনিক ইংরেজ চরিত্রের অবতারণা করেছেন যার মধ্যে লরেন্স ফস্টর অন্যতম "বদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠির ছিল। লরেন্স ফস্টর তথাকার ফ্যাকটর বা কুটিয়াল। অল্প বয়সে মেরি ফস্টরের প্রণয়াকাঙ্খায় হতাশ্বাস হইয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী স্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন।

এখানকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিনলে যেমন নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণের রোগ জন্মিতা।"[৭২] কাল্পনিক হলেও বঙ্কিমচন্দ্র ফস্টরের মাধ্যমে সেই সময়ের ইংরেজদের বাস্তব চরিত্রকে ফুটে তুলেছেন। তৎকালীন হলেও বঙ্কিমচন্দ্র ফস্টরের মাধ্যমে সেই সময়ের ইংরেজদের বাস্তব চরিত্রকে ফুটে তুলেছেন। তৎকালীন ইংরেজদের অর্থলিস্পার কথা সর্বজনবিদিত। এবং মীর কাশিমও নবাব হয়েছিলেন প্রচুর অর্থ প্রদান করে। তবে বেদগ্রামের কথা ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কে ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খান সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন এ উল্লেখ করেচেন যে "মীর কাশিম বীরভূমের জমিদারের বিরুদ্ধ অভিযান চালানোর সময় তিনি বেদগ্রামে শিবির স্থাপন করেছিলেন।"[৭৩]

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী বিন্যাসের সাথে সাথে রাজনৈতিক ঘটনাধারাকে যেভাবে প্রবাহিত করেছেন তাতে করে তাঁর ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইংরেজ কর্মকর্তা এলিসের আকস্মিকভাবে পাটনা আক্রমণ ও অধিকার করে নেওয়া আবার নবাবের পুনরায় পাটনা অধিকার করে নওয়া এসবই ইতিহাস। এমিয়েট এবং হে সাথে নবাবের যে বিরোধের চিত্র উপন্যাসে বর্ণিত আছে তাও সত্য ঘটনা। দেশীয় বণিকদের বেশী শুল্ক দিত হতো ইংরেজ বণিকদের তুলনায়। এতে করে দেশীয় বণিকরা ক্ষতিগ্রস্থ হলে নবাব বিনা শুল্কে তাদের বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। সমস্ত শুল্ক তুলে দেওয়ায় বাংলার রাজস্ব অর্ধেক কমে যায়। ক্ষুদ্ধ কলিকাতা কাউন্সিল মুঙ্গেরে নবাবের

নিকট এমিয়েট এবং হে কে পাঠিয়ে প্রস্তাব দেন উক্ত শুল্করহিত করার আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য। নবাব এই শর্ত না মানায় উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আসন্ন হয়। এমিয়েটকে নবাব প্রথমে ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু উদ্ধত এলিস হঠাৎ পাটনা আক্রমণ করলে নবাব ক্রোধ সংবরণ করতে পারেননি। এমিয়েটকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলে নবাবের সৈন্যদের উপর গুলিবর্ষণ করলে নবাবের সৈন্যরাও গুলিবর্ষণ করলে এমিয়েট মৃত্যুবরণ করেন। এমিয়েটের মৃত্যুর সাথে সাথে পরিস্থিতির আরো দ্রুত অবনতি ঘটে। ইংরেজরা মীর কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পুনরায় মীর জাফরকে বাংলার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করে। ইংরেজদের সাথে মীর কাসিমের তিনটি যুদ্ধের কথা ইতিহাসে উল্লেখ আছে: (১) কাটোয় (২) সরিয়া (৩) উধুয়া নালা। উপন্যাসে উল্লিখিত তকী খান কাটোয়ার যুদ্ধে নবাবের পক্ষে বীরত্বের সাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অসীম বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিলেও ইংরেজদের গুলির আঘাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নবাব এই যুদ্ধে পরাজিত হন।

নবাবের সেনানায়কদের অদক্ষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি সবকটি যুদ্ধেই পরাজিত হন। নবাব তাঁর সেনানায়কদের বারবার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন এবং সকলের উপর তিনি সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। উল্লেখ্য যে তিনি এই সময়ে পলাশীর বিশ্বাসঘাতক জগৎশেঠ, মহারাজ্য রাজবল্লভসহ স্বরূপচাঁদ, রামনারায়ণ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সন্দিহান হয়ে বন্ধী করেন এবং গলায় বালি বা পাথর ভরা বস্তু বেঁধে গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। উপন্যাসে উল্লিখিত তিনটি যুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও যুদ্ধের কারণ ও বিবরণ বর্ণিত হয়নি। আবার অনেক চরিত্র ঐতিহাসিক হলেও ঘটনাদৃশ্য কাল্পনিক। তবে ঔপন্যাসিক আঠার শতকের বাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। চমৎকারভাবে সেখানে স্বার্থান্বেষী মহল সদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতেন এবং যুদ্ধ ও বিশৃংখলার মাধ্যমে নিজেদের ফায়দা লুটার চেষ্টা করতেন। উপন্যাসে উদযনালার যুদ্ধের পর নবাবের কি পরিণতি হলো সে সম্পর্কে আর কিছু বলা হয়নি। অর্থাৎ সেখানেই কাহিনীর সমাপ্তি টেনেছেন। কাজেই এর পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করছি।

যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় তিনি দেশত্যাগ করার মন স্থির করেন এবং অযোধ্যায় নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সুজাউদ্দৌলা তাঁকে আশ্রয়দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মীর কাসিম আশ্বস্ত হয়ে বহু ধনরত্নসহ সপরিবার এবং সুশিক্ষিত সেনাদল নিয়ে এলাহাবাদে শিবির স্থাপন করেন। এই সময় সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমও অযোধ্যায় অবস্থান করছিলেন। তিনিও মীর কাসিমকে সাহায্য করতে সম্মত হন। মীর কাসিম, সুজাউদ্দৌলা এবং সম্রাট ২য় শাহ আলমের মধ্যে ত্রিশক্তি মিত্রতা স্থাপন না হতে পারে সে জন্য মীর জাফর অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তবে ধারণা

করা হয় মীর কাসিম সুজাউদ্দৌলাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে বশীভুত করেন। যাহোক তারা উভয়ে ইংরেজদের কবল থেকে বাংলাকে উদ্ধার করবেন এই মর্মে সন্ধি করেন। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি মেজর এ্যাডামসের মৃত্যু হলে মেজর মনরো ক্যারন্যাক ঐ পদে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। মেজর মনরো কারণ্যাক সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বক্সার অভিমুখে অগ্রসর হন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে মিত্রবাহিনী ইংরেজদের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

পরবর্তী সম্রাট শাহ আলম ও সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এবং শর্ত সাপেক্ষে সুজাউদ্দৌলাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মীর কাসিম পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন এবং ১৭৭৭ খ্রী. অতি দরিদ্র অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে মৃত্যুবরণ করেন। নবাব মীর কাসিমের ব্যর্থতার মুলে ছিল মূলত তাঁর সৈন্যবাহিনী (আর্মেনিয়ান ও সমরা) ও কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা। তাছাড়া তিনি সেনাপতি হিসেবে রণনৈপুণ্য ও সংগঠন দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। সেই সাথে যোগ হয়েছিল নিয়মানুবর্তিতার অভাব প্রভৃতি কারণে তাঁর বিপর্যয় নেমে আসে।

মীর কাসিমের পতনের কিছুকাল পর গভর্ণর ভ্যানসিটার্ট তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'নবাব কোনদিন আমাদের ব্যবসায়ের কোন অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু আমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অতি সামান্য ও তুচ্ছ কারণে প্রতিদিন তাঁহার শাসনব্যবস্থায় পদাঘাত করিয়াছি এবং তাহার কর্মচারীদের যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছি। বহুদিন পর্যন্ত নবাব অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন কারণ তাঁহার আশা ছিল যে আমি এই সমূদয় দূর করিতে পারিব। তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন কিন্তু প্রতিশোধ লন নাই। যুদ্ধের জন্য যে আমরাই দায়ী এলিসের পাটনা আক্রমণই যে এই যুদ্ধের কারণ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই। যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মীর কাসিমের দিক হইতে ঘটনাগুলি বিচার করিবেন, তিনিই বলিবেন যে ইলসের পাটনা আক্রমণ বিশ্বাসঘাতকতার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে আমরা যে সব সন্ধি ও শান্তি প্রস্তাব করিয়াছি তাহা স্তোকবাক্য মাত্র এবং মীর কাসিমকে প্রতারিত করিয়া তাহার সর্বনাম সাধনের উপায় মাত্র। যখন আমাদের সহিত মীর কাসিমের যুদ্ধ বাঁধল তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল যে সাহস ও প্রভুভক্তি দেখাইয়াছেন হিন্দুস্থানে তাহার দৃষ্টান্ত খুবই বির। তাঁহার রাজ্যের দুরতম প্রদেশেতাঁহার কোনো প্রজা পাটনার যুদ্ধে পরাজয়ের পূর্বে বিদ্রোহ করে নাই বা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। প্রজারা যে তাঁহাকে ভালবাসিত ইহা তাহারাই পরিচয়।'[৭৬]

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে করুণ এবং স্মরণীয় এই ইতিহাস কাহিনীর পাশাপাশি প্রতাপ, শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের মানবীয় প্রেম কাহিনীর বিন্যাস সাধিত হয়েছে। যেখানে রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালিন বাংলার জীবনচিত্র ও ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে জমিদারদের প্রভাব। জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব মুসলমান শাসন আমলেই। তবে মুঘল আমলে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'মুসলমানদিগের সময় প্রথম জমিদারদের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্য শাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজাগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরগনায় এক এক ব্যক্তিকে কর সংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা এক প্রকার কর সংগ্রহের কনট্রাক্টর হইল। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশি যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমিদারীর সৃষ্টি।"[৭৭]

সেকালে জমিদাররা ছিল অনেক স্বনির্ভর ও সেই সাথে স্বাধীন। নবাব মুর্শিদকুরি খাঁর সময় পর্যন্ত বাংলায় আইন শৃংখলা বলবৎ ছিল। তাঁর উত্তরসূরীদের সময় কিছুটা আইন শৃংখলা থাকলেও পলাশির যুদ্ধের পর তা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। জমিদাররা রাজস্ব দিতে পারলে নবাব তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করতেন না। জমিদাররা রাজস্ব আদায়ে এবং আইন শৃংখলা রক্ষায় সরকারকে সাহায্য করতে এবং ফলস্বরূপ তারা নানারকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। রাষ্ট্রের আর্থিক সংকট দেখা দিলেও নবাবরা জমিদারদের দারস্থ হতেন। নবাব মীরকাসিম যখন অর্থ সংকটে পড়েন তিনিও তখন জমিদারদের নিকট থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে রাজকোষপূর্ণ করেছিলেন। যা দ্বারা পরবর্তীতে তিনি ইংরেজদের ঋণ পরিশোধ করেন। মোট কথা প্রজাপালনে নবাব শক্তি ছিল জমিদারগণ। সেই ধরনের একজন জমিদারের চিত্র ফুটে তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ চরিত্রের মাধ্যমে। যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবকে সহযোগিতা করে কিছু সুবিধা পেতে চান।

"যেখানে দেখিব, ইংরেজদের দ্রব্য সামগ্রী যাইতেছে, সেইখানে দস্যবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই একখানা বড় বড় পরগনা পাইতে পারিব'।"[৭৮] ক্ষমতামত্ত জমিদারদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। যারা সাধারণ জনগণের উপর অনেক জুলুম করতেন। সেই জন্যই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপকে দুস্য জমিদার বলেছেন। তবে তিনি প্রতাপকে উপন্যাসে একজন প্রেমিক পুরুষ এবং পরোপকারী জমিদার হিসাবে চিত্রিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মীরকাসিমের পরাজয়ের পর মীর জাফরকে ইংরেজরা পুনরায় নবাব করেন। তবে নবাবের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজরা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তাদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকল না। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বাংলার দেওয়ানী লাভ করে অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেই সাথে শেষ হয বাংলার নবাবী আমলেরও শেষ হয় বাংলার স্বাধীনতা। এবং ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা শাসিত হয় প্রথম ইংরেজদের পরে পাকিস্থানের দ্বারা।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহ যে অশেস সাহিত্য শিল্প গুণে ভরপুর তা আমরা সকলেই অবগত আছ। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটিও শিল্পগুণে ভূষিত ছিল। এসম্পর্কে শ্রী প্রমথনাথ বিশীর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। 'চন্দ্রশেখর উপন্যাসে গঠনার মোড়ে মোড়ে যে নাটক, গঙ্গাতরঙ্গে আন্দোলিত মানব হৃদয়ের যে তোলপাড় আত্মঘাতী লোভের আগুনে বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যের তলে যে করুণ আর্তনাদ, সাম্রাজ্যশিকারী বিদেশী বণিকগণের নীতিজ্ঞান বিবর্জিত যে লোলুপতা, প্রভু ও স্বামীর আদেশে নিরপরাধ দলনীর বিষপানে যে অসীম বিশ্বাস, জ্ঞানতপস্বী চন্দ্রশেখরের স্বহস্তে শাস্ত্ররাশিতে অগ্নিপ্রজ্বলনে যে নীরব ধিক্কার, আর সর্বোপরি দুভার্গ্য কর্তৃক পূর্বচিহ্নিত প্রতাপ ও শৈবলিনীর যুগ্ম জীবনে বাল্য প্রণয় কোন অভিসম্পত আছে মুদ্রাঙ্কনে যে অকথিত বেদনাও অন্তহীন দৈব বিড়ম্বনা- এ সমস্তর তুলনা কোথায়?

এ সমস্ত বোঝানো যাবে কেমন করে? রস সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি পাঠককে রসলোকে উত্তীর্ণ করিয়ে দেওয়া হয়, তবে ইতিহাসের উপাদানে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখে এবং অবচেতনে মনের রহস্যের সুষমে নির্মিত এই উপন্যাসখানিকে একটি অতুলীয় শিল্পকার্য বলে মনে করতে হয়।"[৭৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচেতনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের দ্বন্দ্বসঙ্কুল পথ-পরিক্রমায় মানবসত্যকেই সব চেয়ে বড় করে দেখেছেন। তাঁর তত্ত্বভাবনা, হিন্দুজাতীয়তাবোধের গভীরতল অপেক্ষা মনুষ্যত্বই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে। এই ইতিহাসবোধ তিনি পেছিলেন ইউরোপীয় রেনেসাঁর গভীর অঙ্গীকার থেকে।

ivRwmsn

রাজসিংহ উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শনে চৈত্র ১২৮৪-১২৮৫ সংখ্যায়। পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। প্রথম সংস্করণে 'রাজসিংহের' কলেবর ছিল মাত্র তিরাশি পৃষ্ঠা। দ্বিতীয়

সংস্করণে সংস্কারের পর পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় নব্বই। কিন্তু চতুর্থ সংস্করণের রাজসিংহ ছিল প্রায় নতুন করে লেখা এবং আকারও ছিল প্রায় চতুর্থগুণ। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণের রাজসিংহ বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের ইতিহাস অংশের বিষয়বস্তু মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সংগে রাজপুতদের বিরোধ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'রাজসিংহ' তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস। যেখানে রাজসিংহ তথা হিন্দুদের বাহুবল ও দীর্ঘদাঁথা রচনা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দী ছিল উপনমহাদেশে একটি জাগরণের যুগ বিশেষ করে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর থেকেই ভারতবর্ষ তথা বাংলায় স্বজাতীয় চেতনার বিশেষ মানসচাঞ্চল্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। পরবর্তীকালে যা লেখক সমাজেও এর প্রভাব পড়ে বিশেষ করে এই সময়টিতে হিন্দু মধ্যবিত্তের বিকাশ পুণজাগরণ ও জাতীয়তাবদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের লেখক কাজেই এই চেতনাকে সাহিত্যে রূপদান করার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই অনুভূতিকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য মুঘল ইতিহাস হচ্ছে উৎকৃষ্ট উপাদান যার রয়েছে ঐশ্বর্য্যবিলাস ও সম্রাজ্যবাদীতা এবং অপর দিকে তা প্রতিরোধের জন্য আছে রাজপুতগণ। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথারীতি মুঘলকে প্রতিপক্ষ করে হিন্দুদের বাহুবল ও ঐশ্বর্য্যের বিবরণ গাথাই বর্ণনা করেছেন তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাসে। উপন্যাসে বৃবহৃত ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ কতকটা বাস্তবসম্মত এবং কতকটা কাল্পনিক তা ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমরা উপন্যাসের কাহিনীর সংক্ষিপ্তরূপ আলোচনা করব।

গল্পের শুরু রাজস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চল কুমারীর আবির্ভাবের মাধ্যমে যেখানে তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছবিকে লাথি মেরে অবমাননা করছে এবং অপরদিকে উদয়পুরের রানা রাজপুত বীর রাজসিংহের ছবি দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তা ক্রয় করেছেন। চিত্র ক্রয়ের পরও সম্রাট আওরঙ্গজেবকে কেন্দ্র করে নানা রকম কটাক্ষপূর্ণ কথোপকথোন চলতে থাকে। যেমন- "নির্ম্মল! ইহার ইহার মধ্যে কাহাকেও তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে?"

নির্ম্মল বলিল, "যাহাকে আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিত্রত তুমি পা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ?

চঞ্চল। ঔরঙ্গজেবকে !

নির্ম্মল। আশ্চর্য্য হইলে যে?

চঞ্চল। বদজাতের বাড়ি যে? অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মে নাই।

নির্ম্মল। বদজাতকে বশ করিতেই আমার আনন্দ।

তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষিতাম? আমি একদিন না একদিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিব ইচ্ছা আছে।
চঞ্চল। মুসলমান যে?
নিম্মল। আমার হাতে পড়িলে ঔরঙ্গজেবও হিন্দু হবে।"

চিত্র বিক্রেতা ছিল আগ্রার বুড়ি। বুড়ি তার ছেলেকে রূপনগরের রাজকুমারীর ঘটনাটি বলে ছেলে তার স্ত্রী ফাতেমা বেগমকে এবং ফাতেমার দরিয়অ বিবির মাধ্যমে ঘটনাটি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ কন্যা জেব-উন্নিসাকে। জেব-উন্নিসা তা জানিয়ে দেন রূপবতী ও মদাসক্ত বেগম উদিপুরীকে। উদিপুরী জানিয়ে দেন আওরঙ্গজেবকে। এতে সম্রাট অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হন এবং রূপনগরের রাজকুমারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আদেশ জারি করেন। এরপর তিনি চঞ্চল কুমারীকে আনার জন্য রূপনগরে মুঘল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এই সংবাদে রূপনগরের রাজকুমারী জেনে মর্মাহত হন এবং তাকে রক্ষা করার জন্য রাজপুত কুলমান রাজসিংহের সাহায্য লাভের প্রয়োজন অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে চঞ্চলকুমারী পুরোহিত অনন্ত মিশ্রের শরণাপন্ন হন। অনন্ত মিশ্র রাজকুমারীর লিখিত পত্র নিয়ে রাজসিংহের উদ্দেশ্যে রওনা হলে তিনি পথিমধ্যে দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হন এবং পরে মানিক লালের সাহায্যে রক্ষা পান। দস্যু মানিকলাল রাজসিংহের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং চঞ্চল কুমারীর পত্রখানি তাঁকে দেন। রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পত্র পাঠ করে বিস্তারিত ঘটান জানতে পারেন এবং কূটকৌশল অবলম্বন করে চঞ্চলকুমারীকে উদ্ধারের জন্য মানিকলালকে রূপনগরে প্রেরণ করেন। এদিকে রাজসিংহ স্বপ্ল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুঘল রাজকীয় বাহিনীর রূপনগর হতে চঞ্চল কুমারীকে নিয়ে দিল্লী প্রত্যাগমনের পথ অবরোধ করেন।

মুঘল বাহিনী চঞ্চল কুমারীকে নিয়ে যখন দিল্লী অভিমুখে পার্বত্য পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল তখন রাজসিংহ পর্ব্বত শিখরে অবস্থান করছিলেন। রাজসিংহ প্রবলপরাক্রমে আক্রমণ পরিচালন করেন এবং মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করেন। অপরদিকে মুঘল সেনাপ্রধান মবারক বীর বিক্রমে রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। এতে চঞ্চলকুমারী অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং রাজসিংহকে চরম বিপদের সম্মুখীন না হতে হয় সেই জন্য তিনি সেনাপতি মবারকের নিকট আত্মসমর্পনের আগ্রহ প্রকাশ করেন অর্থাৎ স্বেচ্ছায় দিল্লীর যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন যাতে আর যুদ্ধ না হয়। কিন্তু মানিকলালের অর্তকিত আক্রমণে মবারকসহ মুঘলবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করে। রাজসিংহ ও মানিকলাল চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে উদয়পুরে ফিরে আসেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লীতে অবস্থানকালে তার সেনাবাহিনীর এই পরাজয়ের এবং রাজসিংহের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিক্ষুব্দ হন এবং শাস্তিস্বরূপ হিন্দু জাতীর উপর পুনরায় জিজিয় কর ধার্য করেন। রাজসিংহ এই অন্যায় কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিল্লীতে মানিকলালের মাধ্যমে এক পত্র প্রেরণ করেন। মানিকলালের সঙ্গে নিম্মলকুমারীও তথায় গমন করে। রাজসিংহের পত্র পাঠ করে আওরঙ্গজেব ক্রোধে জ্বলে উঠেন এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। এর মধ্যে রঙ্গমহলে নির্ম্মলকুমারীকে বশ করার জন্য সম্রাটের নানা প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। আবার জেবুন্নেসা মবারককে অকারণে বিশ্বাসঘাতক সন্দেহ করে সর্পদংশনে তাকে হত্যা করা হয়। যদিও পরবর্তীতে মানিকলালের সহযোগিতায় মবারক পূর্ণজীবন লাভ করেন।

অপরদিকে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর অধিস্তত সমস্ত প্রদেশের বাছাই করা সৈন্য সংগ্রহ করে ক্ষুদ্ররাজ্য উদয়পুরের রানা রাজসিংহের বিরুদ্ধে এক বিশাল যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। জয়সিংহ ও ভীমসিংহ পুত্রদ্বয়কে নিয়ে রাজসিংহ উদয়পুরের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চল এবং নয়ন গিরিসন্কটের রন্ধ্রপথ অবরোধ করে রাখলেন। মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলে মুঘল বাহিনী অবরূদ্ধ হয়ে পড়ে। অবরূদ্ধ আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীতে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং ক্ষুদাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে আওরঙ্গজেব আত্মরক্ষার জন্য রাজসিংহের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করলেন। এদিকে উদিপুরী বেগম ও জেব-উন্নিসা চঞ্চলকুমারীর নিকট বন্দি হলেন। একদিন উদিপুরী ও জেব-উন্নিসা চঞ্চল কুমারীকে অপমান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আজ তারাই চঞ্চল কুমারীরর নিকট অপমাণিত হলেন।

অবরূদ্ধ আওরঙ্গজেব পার্ব্বত্য রন্ধপথে পালাবার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি আবার রাজপুতদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন এবং প্রচন্ড সংঘর্ষ বাঁধে উভয় দলের মধ্যে এবারও মুঘলবাহিনী পরাস্ত হয় এবং তারা সমূলে নিঃশেষ হলেন। এবার উদয়সাগরের তীরে আওরঙ্গজেব শিবির স্থাপন করেন। সন্ধিভঙ্গ করে তিনি আবার রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন পুত্র আজমকে সঙ্গে নিয়ে। মাড়বারের দুর্গাদাসকে সঙ্গে নিয়ে রাজসিঙহ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রথমে চিতোর এবং পরে আজমীরে পালিয়ে যান। এদিকে শাহজাদা আজমীর চিতোরের নিকট যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে তিনিও পলায়ন করেন। এইভাবে চারি বৎসর যুদ্ধ চলে। লেখকের ভাষায়- "চারিবৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল। পদে পদে মোগলেরা পরাজিত হইল। শেষে আওরঙ্গজেব সত্যি সত্যিই পরাজিত হইল। শেষে ঔরঙ্গজেব সত্য সত্যই সন্ধি করিলেন। রানা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন ঔরঙ্গজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল। মোগল এমন শিক্ষা আর কখনও পায় নাই।"[৮০]

মোটামুটিভাবে এইরূপ রাজসিংহের মূলকাহিনী। এই মূলকাহিনীকে ঘিরে তিনি অনেক উপকাহিনীর সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তিনি যেমন রাজপুত জাতির বাহুবল ও বীরত্ব প্রকাশ করেছেন অণ্যদিকে তেমনি পতনম্মোখ মুঘল রাজবংশের অনেক অভ্যন্তরীন চিত্র ফুটে তুলেছেন সেখানে নর-নারীর জীবনের রন্ধ্র পথগুলির সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। উপকাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দরিয়া মবারক ও জেব-উন্নিসার প্রণয় সম্পর্ক এবং বিয়ে। মানিকলাল নির্মলকুমারীর অনুরাগ ও পরিণয় চঞ্চলকুমারীর নিকট অহঙ্কারী উদিপুরী বেগমের অপমানিত হওয়া। নির্মলকুমারীর প্রতি আওরঙ্গজেবের দুর্বলতা, মোধপুরী বেগমের হতাশা সর্বোপরি রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীর প্রণয় ও বিয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে 'রাজসিংহ' তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। যেখানে তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেব এবং রাজপুতদের মধ্যে যুদ্ধের একটি অংশ বর্ণনা করেছেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রায় বাইশ বৎসর পরের ঘটনা নিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন। তাই সিংহাসন লাভের সময়ে দিল্লী তথা ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল অথবা তাঁর শাসন আমলের শুরুর দিকের কোন ঘটনা উপন্যাসে আলোচিত হয়নি। তবে উপন্যাসে তিনি অনেক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। আবার মুঘল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যে সব প্রচলিত কাহিনী আছে তাও নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। কারণ যেহেতু তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন, ইতিহাস নয়। একজন ঔপন্যাসিকের নিকট কিংবদন্তী বা প্রচলিত কাহিনীর মূল্য অনেক বেশী যেহেতু এই সব ঘটনার দ্বারা তৎকালীন সামাজিক অবস্থার ধারণা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ শাহজাদিদের কথা বলা যেতে পারে। তখন মুঘল সম্রাটরা তাদের মেয়েদের বিয়ে দিতেন না যার ফলে তারা গোপন প্রণয়ে আবদ্ধ হতেন বলে কাহিনী প্রচলিত আছে। তেমনি ভাবনা দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি জেব-উন্নিসা ও মবারকের প্রেমকাহিনী অঙ্কন করেছেন।

সম্রাট আকবর শাহজাদিদের বিয়ে নিষিদ্ধ করেছিলেন তবে আওরঙ্গজেব পরবর্তীকালে এ নিয়ম বাতিল করেন। তবে সম্রাট আকবরের জীবনী লেখক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে বাদশাহজাদীরা অন্দর মহলে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। উচুঁপাচিলের আড়ালে বিশাল জেনানামহলে বা হারেমের ভিতর ছিল প্রচুর মূল্যবান আসবাবপত্র অলঙ্কারাদি ও খাবার সামগ্রী। সেখানে বাদশাহ এবং শাহজাদরা ছাড়া বাইরের মানুষের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। ইতিহাসে হারেমের বর্ণনায় যা পাওয়া যায়, মেঝেতে পাতা হতো নরম পুরু নকসা তোলা রঙ্গিন গালিচার উপর মখমলের মসনদ। ঝিনুক ও হাতির দাঁতের কাজ করা চন্দন বা আবলুশ কাঠের নীচু চৌকিতে খানা পিনার সামগ্রী সাজানো থাকতো। ছোট ছোট মর্মর পাথরের বাটিতে পেস্তা, কিশমিশ, মোনাক্কা ও কাজু বাদাম রাখা থাকতো। এছাড়াও সোনার পানদানে পান ও মশলা সাজানো থাকতো। পাশে থাকতো লম্বা নলযুক্ত রূপার ও রঙিন

স্বচ্ছ কাঁচের গোলাপ পাশ। দামেস্কের নীল কাঁচের শিশিতে সুগন্ধি আতর, এরূপ পরিবেশে ফুল তোলা রেশমি জুতো পরে নরম পায়ে ঘুরে বেড়াতেন শাহজাদী ও বেগমের দল। তাঁরা মাথায় পরতেন ট্যার্সেল ও পালক লাগানো উচুঁ টুপি। বাতাস আতর ও পুলের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসতো নাচের তালে যন্ত্রীর বাজনা ও গানের সুরের রেশ। এমনি মোহময় পরিবশে বাস করতেন মোগল হারেমের জেনানারা। তবে কিরখাবের পর্দা ও উচঁ পাঁচিলের বেড়াজালে ছাপিয়ে হারেমরে দুঃখ বেদনার কাহিনী ও বিরহ হতাশার দীর্ঘশ্বাস কান্নার আওয়াজ বাইরে খুব কমই ভেসে আসতো। সেসব দেওয়ালে দেওয়ালেই গুমরে মরতো। হারেমের অপরূপ রূপসীদের চোখ ধাধানো রূপের সরস আলোচনা হতো। গল্পের ও আড্ডার আলোচ্য বিষয় ছিলেন এই হারেমবাসিনীরা। কত ষড়যন্ত্রের গোপন কথার আলোচনা হতো বাজারের সরাইখানার আসরে। সেখাবে থাকতো বিদেশী পর্যটক, রাষ্ট্রদূত ও সওদাগরের দল। এই কিস্‌সা কাহিনীতে রঙ চড়িয়ে মিচ্‌মশালা মাখিয়ে মোগল জেনানা মহলের খবর ছড়িয়ে পড়তো রাজ্যের সর্বত্র। এমনিভাবে মোগল অন্তপুরের ভিত্তিহীন, অর্ধসত্য গালাগল্প এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। আসল ছবিটি ছিল সুখ দুঃখে মেশানো জীবন প্রবাহের ছবি।"[৮১]

অন্তঃপুরের এই বেগম এবং শাজাদীদের অনেকেই ছিলেন বিদুষী এবং তিক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন। এদের অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করলেও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। অনেকেই আরবী ও ফারসী ভাষায় প্রচুর কবিতা লিখেছেন। ছবি আঁকতেন এবং অনেকেই ঘোড়ায় চড়া ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তেমনি একজন শাহজাদী ছিলেন জেব-উন্নিসা। তিনি অসাধারণ দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। উপন্যাসে তার চরিত্রাঙ্কনে সুবিচার করা হয়নি। তাই সত্য ইতিহাসের আলোকে তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

জেব-উন্নিসা ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা। অনন্য সাধারণ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী এই শাহজাদী জন্ম গ্রহণ করেন ১৬৩৯ সালে। তাঁর মা ছিলেন অভিজাত বংশীয় দিলরাস বানু। শৈশবেই তার জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সাত বৎসর বয়সে তিনি পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেন। জেব-উন্নিসার জ্ঞান অর্জনের স্পৃহার কারণে তৎকালীন বিখ্যাত সব শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা লাভের সুযোগ পান তাদের মধ্যে মিয়াবাঙ্গঁ যার আরবী সাহিত্যে গভীর জ্ঞান ছিল এবং এর সংস্পর্শে এসে তিনি আরবী কবিতা লিখে প্রশংসিত হন। বিখ্যাত ফরাসী কবি মুল্লা সাঈদ আশরাফ সাজান্দ্রানী প্রভৃতি। জেব-উন্নিসা সুন্দর হাতের লেখা (ক্যালিগ্রাফী) শিক্ষাও গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে তাঁর জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি ঘটে এবং সাহিত্য চর্চা অংক শাস্ত্র ও জ্যোতিষ বিদ্যায়ও উল্লেখযোগ্য জ্ঞান অর্জন করেন। সেই সময়ে তাঁকে কেন্দ্র করে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচকদের একটি চক্র তৈরি হয়। সেই সাহিত্য চক্রে ছিলেন

তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পন্ডিত মির্জা খলিল। নাজীব আলী সাইয়াব, শামস্ ওয়ালিউল্লাহ, চান্দেরভাব ব্রাহ্মণ এবং বাহরাজ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। তিনি অনেক দুঃস্থ গুণী লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। জেব-উন্নিসা একটি লাইব্রেরী ও একটি অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই অনুবাদ বিভাগ হতে অনেক দুস্প্রাপ্য বই অনুদিত হয়েছে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফখরুদ্দীন রাজী পবিত্র কোরআন আরবী হতে ফারসীতে অনুবাদ করেছিলেন এবং জেব-উন্নিসার নামানুসারে 'জিবউল তফসির' নামকরণ করা হয়। তাছাড়াও তাঁর লিখিত চিঠি সমূহের সংকলন 'জীবউল মুন্শাত এবং 'দীযান-ই-মখফী' নামে তাঁর সাহিত্য কর্ম প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্য কর্মের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। এই জেব-উন্নিসার মাধ্যমে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় সাহিত্য ও কবিতা চর্চা অব্যাহত ছিল। কারণ আওরঙ্গজেব নিজের কবিতা ও সঙ্গীত ও সাহিত্যে কোন আগ্রহ না থাকায় তাঁর রাজত্বকালে কোন কবি বা সাহিত্যিক তাঁর দরবারে রাজানুগ্রহ লাভ করে নাই। তবে আওরঙ্গজেব তাঁর আদরের কন্যাকে সাহিত্য চর্চায় কখনও বাধা দেন নাই। জেব-উন্নিসা দুঃস্থদের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা ভাতা পেতেন। এ অর্থ দ্বারা তিনি বিধবা ও অনাথদের সাহায্য করতেন এবং প্রতি বছর কয়েকজন হজ্বযাত্রীর খরচ বহন করতেন।

ফর্সা গোলাকৃতি মুখ এবং ছিপছিপে গড়নের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর চোখ ও ঘনচুলের রং ছিল গভীর কালো। ছোট দাঁত ও ঠোঁট ছিল সুর। সে যুগে সৌন্দর্য্য প্রিয় মহিলারা চোখের পাপড়িতে কালো রং এবং দাঁতে মিশি ব্যবহার করতেন। কিন্তু জেব-উন্নিসা এসব ব্যবহার করতেন না। তিনি জমকালো পোষাক ও অলঙ্কার ব্যবহার করতেন না। শুধুমাত্র কয়েকে লর মুক্তার মালা ব্যবহার করতেন। মুঘল হারেমের মহিলারা দাবা চওপর চন্দর মন্দল ও পঁচিশি খেলতেন। জেবউন্নিসা চওপর খেলতে পছন্দ করতেন। তিনি অস্ত্র চালনা শিখেছিলেন এবং কয়েকবার মুঘল সেনাদের পক্ষে অস্ত্র ধারন করেছিলেন (সূত্র উহজডম অদি ইষ্ট, জেবউন্নিসা, মগনলাল ও জেসি ডাককান ওয়েস্টব্রুক, লাহোর ১৯১৩)।

পিতামহ সম্রাট শাহজাহানের ইচ্ছানুসারে এই রূপসী বিদূষী রাজকন্যার বিয়ে ঠিক হয়েছিল শাহজাদা দারাশিকোর পুত্র সোলায়মান শিকোর সঙ্গে। পরবর্তীতে সিংহাসন নিয়ে দারা ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে বিরোধ বাঁধলে দারা ও সোলায়মানকে হত্যা করা হয় হয়। ফলে এই বিয়ে আর হয়নি। তবে তার জন্য সুপাত্রের অভাব ছিল না। ইরানের শাহানশাহ ২য় শাহ আব্বাসের পুত্র মির্জা ফারুক তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জেবউন্নিসা এই সুপুরুষ রাজপুত্রকে পছন্দ করেননি তার চরিত্রে ব্যক্তিত্বের অভাবের কারণে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক মন্ত্রির পুত্র আকিল

খান যিনি লাহোরের গভর্ণর ছিলেন সুপুরুষ ও কবি হিসাবে খ্যাত ছিলেন; জেবউন্নিসা তাঁর প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তিনি মনে করতেন আকিল খান একজন ভীরু প্রকৃতির মানুষ। তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। পর্দা অবলম্বন করে তিনি রাজদরবারে পিতার পিছনে বসতেন এবং অনেক জটিল রাজনৈতিক বিষয়ে সম্রাটকে পরামর্শ দিতেন।"[৮২]

জ্ঞানপিপাসু জেবউন্নিসার সুফী মতবাদের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। ধর্ম সম্পর্কে তিনি অনেক সুচিন্তিত মতামত প্রদান করতেন। তৎকালীন ইরান ও তুরানে তাঁর এই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মতামতকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হতো। ভাইদের মধ্যে জেবউন্নিসা সবচেয়ে স্নেহ করতেন শাহজাদা আকবরকে আকবর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে জেবউন্নিসা তাকে প্রাসাদের খবর জানিয়ে পত্র বিনিময় করতেন। সম্রাট তা জানতে পারার পর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দিল্লীর নিকট সলীমগড় দূর্গে আজীবন বন্দী করে রাখেন। বন্দী জীবন যাপনের সময় তিনি বহু বিষাদময় কবিতা লিখেছেন যা পরবর্তীতে সংকলিত হয়ে ফার্সী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়।

১৭০২ সালে ২৬ শে মে বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন মুঘল যুগের এই অসাধারণ প্রতিভার। ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর মোগল যুগে স্ত্রী শিক্ষা নামক গ্রন্থে জেবউন্নিসা সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তাহলো- "প্রকৃতি জেবউন্নিসাকে সৌন্দর্যের ললামভূতা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। বাহিরের রূপ ও অন্তরের পান্ডিত্য তাঁহার কবি প্রতিভাদীপ্ত শুভ্র ললাটে যে যে গৌরবের মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল, তাহা রাজকিরীট অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল। মোগলের নিভৃত অন্ত:পুরে দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে থাকিয়াও জেব ঘন পত্রান্তরালে বিকশিত, সুরভী সৌন্দর্যমন্ডিত গোলাপ পুষ্পের ন্যায় আনাকে ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিতে পারেন নাই। দেশ দেশান্তরে তাঁহার যশ সৌরভ পরিব্যপ্ত হইয়াছিল।" জেবউন্নিসার শেষ ইচ্ছানুযায়ী লাহোরের নাওয়াকোটে তাঁর বাগানে সমাহিত করা হয় তাঁর মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ বছর পর তাঁর সাহিত্য কম্যের সংকলন আরম্ভ হয়। জেবউন্নিসা তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্যে বেঁচে আছেন। তাঁর সাহিত্য কর্ম একথা প্রমান করে দেয় যে মুঘল অন্ত:পুর শুধু বিলাসের জায়গা ছিল না, সেখানে বহু দুর্লভ রত্নেও জন্ম হয়েছিল, যারা কালের কষ্টিপাথরে অমরত্ব লাভ করেছেন।"[৮৩]

ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন "জেবউন্নিসা একজন প্রধান Politician মোগল সাম্রাজ্যের হাল এক প্রকার তাঁর হাতে আবার পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্ত ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।"[৮৪]

বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসের নায়িকার আসনে জেবউন্নিসাকে বসিয়েছেন নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক চরিত্রের সঠিক চিত্রায়ণ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের উপদান সংগ্রহ করেছেন-

- James Tod এর Annals and Antiquities of Rajasthan
- Robert Orme এর Historical Fragments of the Mogul Empire
- N. Manucei এর storio do Mogor প্রভৃতি গ্রন্থগুলি হতে।

টডের এবং আর্মের গ্রন্থ জেবউন্নিসার উল্লেখ নেই তবে মানুচী তাঁর গ্রন্থে দুই লাইনে লিখেছেন- 'Aurangzib had a daughter called Zebunnissa Begum. She died in 168 September 1.[৮৫]

তবে জেবউন্নিসা সম্পর্কে মানুচীর এই মৃত্যুর তারিখ সঠিক নয় যদুনাথ সরকারের Short History of Aurangzib এ জিবউন্নিসার জন্ম ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারী এবং মৃত্যু ১৭০২ খ্রী: ২৬ মে উল্লেখ আছে।[৮৬]

বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নিসার যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর উপন্যাসের প্রয়োজনে এবং খানিকট উদ্দেশ্য মূলকভাবেই মুসলিম রমনীর চরিত্রের কলঙ্কলেপন করা। কারণ মানুচী তার গ্রন্থে মানমন্দিরে প্রতিযোগীতায় রওশন আরা ও ফকরুইন্নসার কথা বলেছেন কিন্তু জেবউন্নিসার প্রতি কোন কলঙ্ক আরোপ করেননি। স্যার যদুনাথ সরকার তার Studies in Aurangzib's reign গ্রন্থে জেবউন্নিসাকে নানা যক্তিতর্কের মাধ্যমে কলঙ্কমুক্ত করেছেন এবং মানুচীর বর্ণিত রওশন আরা ও ফকরুন্নিসার মানমন্দির প্রতিযোগীতার ঐতিহাসিক ভিত্তি অস্বিকার করেছেন কারণ ইতিহাসে ফকরুন্নিসা নামে আওরঙ্গজেবের কোন কন্যা ছিল না। স্যার যদুনাথ সরকার ৫ জন কণ্যার নামের তালিক দিয়েছেন। তারা হলেন (১) জেবউন্নিসা (২) জিনাব-উননিসা (৩) জুবতাতুন নেসা (৪) বদর-উন-নিসা ও (৫) মেহের উন-নিসা।"[৮৭]

তবে বঙ্কিম, রৌশনআরা ও জেবউন্নিসার মদনমন্দির প্রতিযোগিতা এবং জেবউন্নিসার যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন তার কঠোর সমালোচনা করেছেন মুনীর চৌধুরী। তাঁর মতে- "ফখরউন্নিসা ইতিহাসে উপেক্ষিতা, লোকে জানে জেবউন্নিসাকে, জানে এবং অশেষ গুণের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাও করে। অতএব যদি কোন মুসলিম রমনীকে কলঙ্কমন্ডিত করে চিত্তানন্দ বর্ধিত করতে হয় তাহলে ফখরউন্নিসাকে বর্জন করে জেবউন্নিসাকে আশ্রয় করা বেশী যুক্তিসঙ্গঁত। বঙ্কিম তাই করেছেন।"[৮৮]

সম্রাট শাহজাহানের দুই কন্যা জাহানারা ও রওশন আরা সম্পর্কেও উপন্যাসে কটুক্তি করেছেন। "ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী, জাহানারা ও রৌশনারা। জাহানারা শাহজাহার বাদশাহীর প্রধান সহায়। শাহজাহা তাহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কায়ে সফল ও যশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমানে এসকল গুণবিশিষ্ঠ ছিলেন ততোধিক পরিমানে ইন্দ্রিয় পরায়না ছিলেন। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোকে তাঁহার অনগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না। রৌশনারা পিতৃদ্বেষিনী, ঔরঙ্গজেরবর পক্ষ পাতিনী ছিলেন। তিনিও জাহানারার মত রাজনীতি বিশারদ এবঙ সুদক্ষ ছিলেন এবং ইন্দ্রিয় সমন্ধে জাহানারার ন্যায় বিচারশূল্য বাধাশূন্য এবং তৃপ্তিশূণ্য ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া তাহার রাজ্য অপহরনে ঔরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রৌশম্বারা তাঁহার প্রধান সহায়। আওরঙ্গঁজেব ও রৌশনারার বড় বাধ্য ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশনারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন।"[৮৯]

ইতিহাসে এই দুই নারীর অবস্থান এতটা নিম্ন মানের নয়।

সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের প্রথম সন্তান হুরউন নিসার জন্ম হয় ১৬১৩ সালে এবং ১৬১৪ সালের মার্চ মাসে আজমীরে দ্বিতীয় সন্তান জাহানারার জন্ম । মোগলরীতি অনুসারে যথোপযুক্ত সমারোহে শিশুর নামকরণের জন্য তাকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে আনা হলে তিনি অসামান্য রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে নাম রাখলেন জাহানারা বা জগতের অলংকার। অনন্য সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্রের মাধুর্যের জন্য জাহানারাকে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সন্তানদের মধ্যে সর্বাধিক স্নেহ করতেন এবং তাঁকে "পাদিশাহ বেগম" উপাধি দিয়েছিলেন। অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বিদূষী শাহজাদী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। সাহিত্য রচনার পাশাপাশি তিনি পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে মুনিস-উল-আরওয়াহ ও "রিসালা-ই-সাহিবিয়া।" শেষের গ্রন্থটি ভারতরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। জাহানারা অনেক জনকল্যাণ মূলক কাজ ও করেছেন যেমন- মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানাও সরাইখানা নির্মান করেছিলেন। বাদশাজাদী জাহানারা ধর্মানুরাগী ছিলেন। ধর্মচর্চায় তিনি অনেক সময় কাটাতেন। স্বরচিত "বিসালাই সাহিবিয়া" গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে পরম করুনাময় আল্লা তার মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধান করার এক আকুল আগ্রহের সৃষ্টি করেছেন। বিদেশী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বের্নিয়ের ও নিকলো মানুচ্চি জাহান আরার চরিত্র হননের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এসব অসমর্থিত বাজার গুজব সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার তার 'হিস্টুরী অব আওরঙ্গঁজেব'

গ্রন্থে সমসাময়িক রাজকীয় কাগজপত্র ও চিঠি পরীক্ষা করে প্রমান করেছেন যে এই দুই পর্যটক শুধুমাত্র বাজারের মুখরোচক কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করেছেন। স্যার যদুনাথ জাহানারাকে দেবীরূপে দাবি করেন নাই। তিনি বলেছেন জাহানারার চরিত্রে সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্য বিরাজমান ছিল। তবে তাঁর চরিত্রে কলংকের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ১৬৮১ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর সাতষটি বছর বয়সে দিল্লীতে জাহানারার মৃত্যু হয়। দিল্লীর বিখ্যাত সাধূ পুরুষ শেষ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধির পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। অসীম পিতৃভক্তি, অতুলনীয় দান ও অপরিমেয় জ্ঞান পিপাসা চিরদিন জাহানারার স্মৃতি উজ্জল করে রাখবে।[৯০]

সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের গর্ভে সম্রাট শাহজাহানের চৌদ্দটি সন্তান জন্ম নেয়। তার মধ্যে জীবিত ছিলেন চার পুত্র ও তিন কন্যা।

১) জাহানারা (জন্ম ১৬১৪)

২) দ্বারাশিকো (১৬১৫)

৩) সুজা (১৬১৬)

৪) রওশন আরা (১৬১৭)

৫) আওরঙ্গজেব (১৬১৮)

৬) মুরাদ (১৬২৪)

৭) গওহর আরা (১৬৩১)

দ্বিতীয় কন্যা রওশন আরা জানারার মত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতি ছিলেন না। বিদূষী পাস্য শিক্ষায়িত্রী সিত্তিউননিসার কাছে উভয়ে শিক্ষালাভ করেন। তবে তিনি জাহানারার মত গভীর জ্ঞান অর্জনে সমর্থিত হননি। শিক্ষা অর্জনের চেয়ে বিলাসিতার প্রতি আগ্রহ ছিল প্রবল। রওশন আরা তুর্কী ভাষার প্রতি উৎসাহী ছিলেন এবং এই ভাষায় কিছু জ্ঞান অর্জন করেন। তবে তার সাহিত্যকর্মের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সৌন্দর্যপ্রিয় রওশনআরা সম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইমারত ও বাগান নির্মাণ করেছিলেন দিল্লীর নিকটবর্তী 'রওশন বাগ' বাগানটি তারই কীর্তি, দীন ও দরিদ্রদের দান করে তিনি তৃপ্তিবোধ করতেন। মাঝে মাঝে দিল্লীর জামে মসজিদের বাইরে জুমার নামাজের পর দরিদ্র মুসাফিরদের তার পক্ষ হতে সাহায্য বিতরণ করা হতো। তিনি খেলাধুলায় উৎসাহী ছিলেন। দাবা, চত্তপর ও চন্দলমন্দল খেলতেন। ঘুড়ি ওড়া, পায়রা খেলা ও আতসবাজী খেলা দেখতে পছন্দ

করতেন। তিনি হাতির পিঠে মহাআড়ম্বরে ভ্রমন করতেন। তাঁর জাঁকজমকপূর্ন ভ্রমন দেখে ফ্রাঁসোয়া বের্নিয়ে ও মানুচ্চি মুগদ্ধ হয়েছিলেন। ১৬৭১ সালে সামান্য জ্বরে মাদ্র চুয়ান্ন বছর বয়সে রওশন আরার মৃত্যু হয়।[৯১]

রাজসিংহ উপন্যাসকে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র দাবি করেছেন যে পরিমাণ সত্য ইতিহাস নেই। অনেক কিছুই অতিরঞ্জিত ও কল্পনাপ্রসুত। তবে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি এখানে রয়েছে তা হচ্ছে ইতিহাসরে ইতিহাস, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নবচেতনালব্ধ বাঙ্গালীর জাতীয়তার ইতিহাস। সেখানে অতীত ইতিহাস উপলক্ষ মাত্র। বাঙ্গালী খুঁজেছে তাঁর মূল শিকড় ও মুক্তিপথ।

এই উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে তিনি উলেখ করেছেন ইতিহাস কিভাবে এবং কতখানি ব্যবহার করেছেন। আমরা সেইসব সুত্রগুলি ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করব। বঙ্কিম বলেছেন "রূপনগরের রাজন্যা সম্বন্ধে যে স্থুল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহা টড়ের গ্রন্থে আছে। কিন্তু অর্মের গ্রন্থেই নাই।"[৯২] টডে আছে-

æRay Singh had signalized his accession by the revival of the war like 'Teeka-dower' and plundered Malpoora, which though on the Ajmeer frontier, Shahjehan, when advised to vengeance, replied, it was only a folly of his nephew. An appeal to his gallantry made him throw down the gauntlet to Arun gazeb in the plentifude of his power, whe the valour of the seesodies again burst forth in all the splendure of the days of pertap; nor did the contest close till after a series of brilliant victories, and with the narrow escape from captivity of the xerxes of Hindusthan. The Mogal demanded the hand of the princes of Roopnagurh, a junior branch of Marwar house and sent with the demand (a compliance with which was comtempted as certain) a 'cortage' of two thousand to escourt the fair to court. But the haughty Rajpootini, either indignant at such precipition or eharmed with the gallantry of the Rana, who had evinced his devotion to the fair by measuring his sowrd with the head of her horse rejected with disdain the proferred alliance and justified by brilliant precedents in the remantic history of her nation, she entrusted her cause to the arm of the chief of the Rajpoot race, offering herself as the reward of protection. The family priest (her

preceptor) decmed his office honoured by being the messenger of her wishes and the billet he conveyed incorporated in the memorial of his reign"[৯৩]

রূপনগরের রাজপুতনীর জন্য মুঘল বাদশা আওরঙ্গজেবের পানি প্রার্থী হওয়া এবং রাজপুতনীর পরিবারের পুরোহিতের মাধ্যমে রাজসিংহেহ নিকট পত্র প্রেরণে ঘটনা বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র টড়ের রাজস্থানকে অনুকরণ করেছেন। টড় রূপনগরের রাজপুতানী রাজসিংহের নিকট লিখিত পত্রশেষ করেছেন এইভাবে – with a threat of self-distruction if not saved from dishnour'- রাজসিংহের নিকট রাজকুমারীরর এই আবেদন কিভাবে কার্যকর হয়েছিল আরাবলী পর্বতের পাদদেশ রূপনগরের সম্মুখ সীমান্তে অবস্থান করে রাজসিংহ কিভাবে রাজন্যাকে রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তার সবকিছুই টড়ের 'রাজস্থানে বর্ণিত আছে।'[৯৪]

বঙ্কিমচন্দ্র এই ঘটনাটি উপন্যাসে মানিকলালের কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। রাজসিংহের সঙ্গেঁ মোগল বাদশাহর যে মহাযুদ্দ যুদ্ধ হয়েছিল তার পূনাঙ্গ ঐতিহাসিক তথ্য সমূহ সংগ্রহ করা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না ঐতিহাসিক উৎসের অপ্রতুলতার কারনে। বঙ্কিম তা দুঃসাধ্য বলে উলেখ করেছেন। মুসলমানদের লেখা ইতিহাস 'রাজপুত রচিত ইতিবৃত্ত মানুচী বর্ণিত অভিজ্ঞতা কোনটিই বঙ্কিম তর্কাতীত বলে ধরে নিতে পারেননি। পরস্পরের সঙ্গে অক্যে এত বেশী যে নির্ভরযোগ্য মনে হয় না।"[৯৫] যদিও স্যার যদুনাথ সরকার, কালিকা রঞ্জন কানুনগো প্রমুখ ঐতিহাসিকবৃন্দ টড-মানুচী ও অর্মের ভূলত্রটি দেখিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদান আবিস্কারের ভিত্তিতে মুঘল ও রাজপুতদের সত্য ইতিহাস উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন। তবে তাদের মধ্যে ও অনৈক্য লক্ষ্য করা গেছে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র রূপনগরের নাম রেখেছে চঞ্চলকুমারী টড়ে নাম নেই। কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেছেন রূপকুমারী'[৯৬] যদুনাথ সরকার চারুমতী[৯৭] এবং 'অঘোরনাথ বরাট বলেছেন প্রভাবতী।[৯৮] বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই টড এবং অর্মকেই অনুসরণ করেছিলেন যদিও তাদের লেখায় ঐতিহাসিক ভিত্তি খুব দুর্বল।

স্যার যদুনাথ সরকার রূপনগরের ও সেখানকার রাজকুমারীর সত্য ইতিহাস উদ্ধার করেছেন। রূপনগরের নাম ও অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেন জয়পুর যোধপুর ও আজমীরের মধ্যবর্তীস্থানে কৃষ্ণগড় নামে যে ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্য আছে যার রাজধানী কৃষ্ণনগরে শহর তারই উত্তরভাগে রূপনগর নামে একটি নগর আছে। তাঁর মতে রূপনগরের রাজকুমারী বলতে কিষণ গড়ের রাজন্যাকেই বুঝায়। এই দেশের রাজা রূপসিংহ কঠোর দারাশিকোর পক্ষে এবং আওরঙ্গজেবের বিপক্ষে সামুগড়ের যুদ্ধ ক্ষেত্রে (২৯ মে ১৬৫৮) যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন। তারপর তাঁর পুত্র

মানসিংহ রাজা হন এবং তিনি চিরজীবন মুঘলদের বাধ্য থাকেন। এই যুদ্ধে বিজয়ী আওরঙ্গজেব রূপসিংহের জ্যেষ্ঠ কণ্যা চারুমতিকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য যাতে মৃত শত্রুর বংশ যথেষ্ট লজ্জিত ও অপমানতি হয়। কিন্তু চারুমতি কুল পুরোহিতের দ্বারা রাজসিংহকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করে একটি পত্র পাঠান। রাজসিংহ পত্র পেয়ে আনন্দিত হয়ে কিষণগড়ে উপস্থিত হন এবং তাকে বিয়ে করেন এতে আওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হয়ে মহারাণার দুটি পরগনা কেড়ে নিয়ে হরিসিং দেবলিয়াকে দান করেন। এই কার্যের বিরুদ্ধে রাজসিংহ বাদশাহকে এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন যেখানে তিনি উলেখ করেন 'আমি যে বাদশার অনুমতি না লইয়া বিবাহের জন্য কিষণগড়ে গিয়াছিলাম, তাহাতে বাদশাহের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখান হইয়াছে– এরূপ আপনি লিখিয়াছেন। কিন্তু রাজুতের সঙ্গে রাজপুতের সম্বন্ধ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে যে কোন মানা হইবে, এরূপ আমি কল্পনা করি নাই এবং বাদশাহী রাজ্যে (অর্থাৎ বরাৎ যাতায়াতের পথে আজমীরে সুবাতে) কোন প্রকার উপদ্রব করি নাই।[৯৯] মৃত যশোবন্ত সিংহের পত্র, মাড়োয়ারের ভাবি রাজা অজিতসিংহ যখন মুঘল শক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মেবারে রাজসিংহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন আওরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করেন। মেবারের পতন সুসম্পন্ন ভেবে বাদশা আজমীরে ফিরে যান। এরপর রাজপুতদের হাতে মুঘল সেনাবাহিনী চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করে। এই পর্যন্ত ইতিহাস অনুমোদন করে এবং যদুনাথ সরকারেরও অভিমত এই যে, 'রাজসিংহ' উপন্যাসে এই মূল ঘটনাদি বিকৃত হয় নাই, ধর্মান্ধতার দ্বারা লেশমাত্র প্রণোদিত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের দাবিও তাই ছিল।[১০০]

রূপনগরের যুদ্ধে রন্ধ্র মধ্যে আওরঙ্গজেবের যে দূরবস্থার কথা বঙ্গিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন তা টডের লেখায় নাই, তবে অর্মের লেখায় আছে। টড বলেছেন, আওরঙ্গজেবের পুত্র আকবরের কথা যা ইতিহাসগত তথ্য দ্বারা সমর্থিত। বঙ্কিমচন্দ্র অর্মেকে অনসরণ করেছেন অর্মে লিখেছেন,

Abnir, Chitore and Joudpur are the three great Rajahships of Indostan. Jysing was Rajah of Abnir and Jesswont Sing of Joudpur, Both had served in the revolution of Aurengzebe in 1676.[১০১]

রন্ধ্রপথের যুদ্ধ বর্ণনাকালে অম্যে কোথাও রাজসিংহের নাম উলেখ করেননি। তিনি বলেছেন-

But we do not find in the contemporary accounts of that period any mention of the Raja of Chitore, although the first of the three in ancientry and respet, and styled in Ranah or Lord of the Rajahs.[১০২]

The Ranah remonstrated to gain time which Aurengzebe likewise wanted until his military preparations were ready, having two wars of equal difficulty to wage and whilst waiting came the option of a third.

১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোবন্ত সিংহ মৃত্যু বরণ করলে Leaving a high spirited widow and for sons, not yet arrived at man's estate; আওরঙ্গজেব তাদেরকে নিজ আয়ত্বে আনার জন্য দিলীতে আসার আমন্ত্রণ জানালে তারা আসে তবে- receiving some suspiction, set of hastily on their retrun the same night and were pursued by five thousand horse, whom two hundred and fifty devoted Rojpoots stopped at a pass, until the escape of the princess was served.

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্র বাংলার গভর্ণর আজিম ও সুলতানের গভর্ণর আকবরকে ডেকে পাঠান কিন্তু

Without waiting for their Junction, took the field himself in October 1678 with his to armies, the one under his own conduct against chitore and Joudpure; the other of Sultan Mauzum against Shevaji. Both held the same rout as for as the province of malve, on their approach, the Ranah and the wildow called on all the Hindoo powers for assistance.[১০২]

১৬৭৮ সালের শেষের দিকে আওরঙ্গজেব দুর্গম পার্বত্য পথ দিয়ে চিতোর ও মাড়য়ারের বিরুদ্ধে অভিযান চালান- within the mountains the army advanced ... the defiles with incredible labour, and with so little intelligence, that the division which moved with Aurengzebe himself was unexpectedly stopped by insuperable defences and precipices in front whilist the Rajpoods in one night closed the streights in his rear by Salling the overhonging trees; and from their stations above, prevented all endeavour of the Troops either within or without from removing the obstacle.[১০৩]

আওরঙ্গজেবের প্রিয় পত্নী উদিপুরী বেগম ও সহগমন করেছিলেন। তাঁর অপহরণ সম্পর্কে অর্মে উল্লেখ করেছেন-

'Undiperi the favourite and circassian wife of Aurengzebe accompanied him in this arduous ware and with her retinue and escourt was enclosed in another part of the mountains' her conductor dreading to expose here person to danger or public view surrendered.[১০৩]

উদিপুরী বেগমকে অপহরনে করে রাণার নিকট নিয়ে যাওয়া হলে রানা তাঁকে যথাযথ মর্যদা প্রদান করেন। 'Meanwhile the emperor himself might have perished by famine of which the Ranah let him see the resque by a confinement of two days; when he ordered his Rajpoots to withdraw from their statuns, and suffer the way to be cleared.[১০৩]

সে রাজসিংহের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের রন্দ্রপথের যুদ্ধে দুর্ভোগের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র এখান থেকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন- বড় ছুটাছুটি করিয়া মোগল সেনা রন্ধ্রমুখে উপস্থিত হইল। উপস্তিত হইয়া দেকিল, মোগলের সর্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া আছে। রন্ধ্রমুখ বন্ধ। রাত্রিতে রাজপুতেরা সংখ্যাতীতি মহামহীরুহ সকল ছেদন করিয়া পর্ব্বত শিখর হইতে রন্দ্রমুখে ফেলিয়া দিয়াছে পর্ব্বতাকার সপল্লিব ছিন্ন বৃক্ষরাশি রন্ধ্রশুখ একেবারে বন্ধ করিয়অছে। মোগল সেনামধ্যে ঘারতর আর্তনাদ উঠিল- স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শুনিয়া ঔরঙ্গজেবের পাষাননির্মত তৃদয়ও কম্পিত হইল। রাজসিংহের কামান জাকিল। বৃক্ষপ্রাকার লজ্ঘিত করিয়া রাজসিংহের গোলা ছুটিল- হস্তী অশ্ব, পত্তি, সেনাপতি সব চূর্ণ হইয়া গেল। মোগল সেনা রন্ধ্রমধ্যে হটিয়া গিয়া এর সর্প যেমন অীগ্নভয়ে কুন্ডলী করিয়অ বিবরে লুকায়, মোগল সেনা রন্ধ্রবিবরে সেইরূপ লুকাইল। শাহানশাহ বাদশাহ হীরকমন্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ মস্তক হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়অ জানু পাতিয়া পর্ব্বতের কাঁকর তুলিয়া আপনার মাথায় দিলেন। দিল্লীর বাদশা রাজপুত ভুঁইয়ার নিকট সসৈন্য পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিক।[১০৪]

'যদুনাথ সরকার রন্ধ্রপথের যুদ্ধের সত্য ইতিহাস আবিস্কার যেয়ে বঙ্কিম, টড, ও অর্মের লিখিত ইতিহাসের উ॥সের সন্ধান পেয়েছেন। উৎসটি হচ্ছে ভিনিশীয় ভ্রমনকারী নিকোলা মানুচীর লেখা Storio do Mogor অর্থাৎ মুঘলদের ইতিহাস গন্থ। কক্রু (Catrou) নামক একজন জেসুয়িট পাদ্রী চরি করিয়া ফরাসী ভাষায় সংক্ষিপ্ত অথচ অন্য উপাদানের সঙ্গেঁ মিশ্রত এক ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন দুই খন্ডে যথাক্রমে ১৭০৫ ও ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু আসল

গ্রন্থের বিশুদ্ধ ও অগাধ পান্ডিত্যপূর্ণ টাকা সংবলিত ইংরেজী অনুবাদ করেন William Irvine যা ১৯০৭ খ্রীঃ চার খন্ডে প্রাশিত হয়।[১০৫]

রন্ধ্রপথের যুদ্ধ সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের অভিমত বাদশাহী সৈন্যদল মেবারে অনেকবার ঘেরাও হয় এবং আহারের অভাবে এবং রাজপুতদের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে একথা সত্য, এবং ফারসী ইতিহাসে ইহাতে প্রমান হইয়াছে। কিন্তু স্বয়ং বাদশাহ কখনো সেখানে এরূপ বিপন্ন হন নাই। তবে, কুচ করিবার সময় কখন কখন তাঁহার নিজ রক্ষিদলের মধ্যেও রসদ আনা রাজপুতরা বন্ধ করিয়া দেয়। ফলতঃ হুসন আলী খাঁর নিযুক্ত দলের (detachment) এবং শাহজাদা আকবরের নিজ সৈন্য বিভাগের বিপদ ও ভয়-ভীতিকেও টড বাদশাহহের নিজদলের উপর চাপাইয়াছেন।[১০৬] আসলে এই ঘটনাটি টড়ে নয় অর্মের গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তবে মুনির চৌধুরী এই সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন- 'বঙ্কিমের ইতিহাস গুরু টড রাজপুত মোগলের যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে আওরঙ্গজীব অনুপস্থিত। মোগল সেনা পরিচালনা করেছেন আওরঙ্গজেবের পুত্র আকবর।[১০৭]

পরাজয় বরণ করে গ্লানি অপমান সহ্য করতে হলে তাও আকবরই করেছেন। কিন্তু আকবর আওরঙ্গজীবের সমকক্ষ নন। আকবরের চেয়ে আওরঙ্গজীবের অপমান বেশী আনন্দদায়ক। তাই সেই লক্ষ করলেন যে অর্ম ভ্রমক্রমে এই যুদ্ধের বর্ণনায় আকবরের পরিবর্তে আওরঙ্গজীবকে অধিনায়করূপে কল্পনা করেছেন তৎক্ষনাৎ বঙ্কিম তাঁর আনুগত্য টড থেকে স্থানান্তরিত করে অর্মে অর্পন করলেন।[১০৮] এইভাবে তিনি উপন্যাসের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক সত্য থেকে সরে এসেছেন।

উপন্যাসে বর্ণিত আওরঙ্গজেবের প্রধান মহিষী যোধপুর রাজকন্যা যোধপুরী বেগমের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। Prof. S. Lane Poole আওরঙ্গজেবের স্ত্রীা পরিচয় প্রদানকালে মানুচীর মতাবলম্বনে রাজপুর রাজকন্যাকে আওরঙ্গজেবের প্রধান মহিষী হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

'According to Manucei the cheif was a Rajput Princes and became the mother of Muhammad and Muzzam besides a daughter. A persian Lady was the mother of Azam and Akbar and two daughters. The nationaltity of the third by whom the Emperor had one daughter is not recorded. Udaipuri, the mother of Kam-Bakhsh was Christian from Georgia and had been purchased by Dara, on whose execution she

passed to the harim of Aurangzib. Udairpuri Bai was the only woman for whom the Emperor enteretained anything approaching to passionate love.[১০৯]

যদুনাথ সরকারও যোধপুরী বেগম কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নয় বলে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে এই বাদশাহ কোন যোধপুর রাজন্যাকে বিবাহ করেন নাই। তাহার একমাত্র হিন্দু পত্নির নাম 'নবাব বাঈ কাশমীর প্রদেশের রাজাউর শহরের ক্ষুদ্র রাজার কন্যা। ইহারই পুত্র শাহ আলম পরে বাহাদুর শাহ নাম লইয়া দিল্লীর সম্রাট হন।

তিনি তাঁর 'A short History of Aurangzib' গ্রন্থে সম্রাট আওরঙ্গজেবের স্ত্রীর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে Aurangzib had four wives, namely:

(1) Dilras Banu Begum, a daughter of Shah Nawaz Khan (whose great-grandfather was a younger son of the persian king Shaha Ismail I Safari). She was married to Aurangzib at agra on 8th May 1637 with the most gorgeous ceremonies. She died at Aurangabad on 8th October 1657 from illness following the birth of her son Muhammad Akbar.

(2) Rahmat-un-nisa Surnamed Nawb Bai was the daughter of Rajah Raju of the Rajauri state in Kashmir and came of the hill Rajput blood. But on her son Bahadur Shah's occassions to the throne of Delhi.

(3) Aurangabadi Mahal, so named beasue she entered the princes's harem in the city Aurangabad.

(4) Udipuri Mahal. The mother of Kam Bakhsh. the contemporary vennitian traveller Manuccl speaks of her as a Georgian slae-girl of Dara Shukoh's harem who on the down fall of her first master became the concubine of his victorious reval. She seems to have been a very young woman at the time as she first became a mother in 1667.

Beside the above four there was another woman whose supple grace musical skill and mastery blandishments. made her the heroine of the only romance in the puritan Emperor's life. Her named Hira Bai surnamed Zainabadi.[১১০]

এখানে যোধপুর নামে কোন প্রধান মহিষীর কথা উল্লেখ নেই।

'রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেবের চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেননি। তিনি তাঁকে দেখেছেন একজন র্ধান্ত, প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী ও হিন্দু বিদ্বেষী শাসসক হিসাবে। যিনি জোর করে হিন্দুদের মুসলমান বানিয়েছেন। অমুসলমানদের উপর জিজিয়া কর বসিয়েছেন। হিন্দু দেব-দবীর মন্দির ভেঙ্গেছেন এবং সুযোগ পেলেই কপোটচারী হয়ে উঠেন। এছাড়াও স্বার্থের জন্য তিনি পিতা ও ভইতে হত্যা করার মত অপকর্ম ও করতে পারেন। আওরঙ্গজেবের প্রতি বঙ্কিমের এইরূপ ধারনার জন্য পরোক্ষভাবে ইংরেজ ঐতিহাসিকবৃন্দ ও বিদেশী পর্যটকদের দায়ী করা হয় যারা ভারত বষীয় ইতিহাসে আওরঙ্গজেবের চরিত্রে শুধু দোষই দেখেছেন, কোন গুণ দেখতে পাননি। হিন্দু পুনজাগরনের যুগে বঙ্কিমের ইতিহাস চেতনার স্বরূপ ও প্রকৃতি ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানের ধারাকে গতিশীল করা। আর এই মুহূর্তেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মুঘলদের বিতর্কিত বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে। তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি কতটা অসহিষ্ণু ছিলেন তার বহি:প্রকাশ ঘটেছে ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। দিল্লীর তসবীরওয়ালী যখন রূপনগরের চঞ্চলকুমারীকে বিভি্নন জনের তসবির দেখাচ্ছিলেন তখন একে একে আকবর। জাহাঙ্গীর শাহজাহান, নূরজাহান, নুরমহল সবার চিত্র দেখে রাজকুমারী ফিরিয়ে দিয়ে হেসে বলেছেন এরা আমাদের কুটুম্ব খবে টের তসবির আছে। কেবলমাত্র আওরঙ্গজেবের ছবি ক্রয় করে তিনি তার সখিদের বলেছেন "আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাকভাঙ্গে দেখি"[১১১] এখানে শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা স্পষ্ট। রাজকুমারী হিন্দু রাজাদের তসবির দেখেছেন সেখানে যারা মুঘলদের অধীনে চাকুরী করেছেন তাদের ছবি ফিরিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে এরা মুসলমানদের চাকর। এদের মধ্যে মানসিংহ বীলবল ও জয়সিং অন্যতম। অরপদিকে যারা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন রাজকুমারী পছন্দ করে ক্রয় করেছেন যেমন: রানা প্রতাপসংহি, রানা অমরসিংহ ও যশোবন্তসিংহ প্রমূখ। আসলে স্বাধীনতাকামী বঙ্কিম যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন তারা তার প্রিয় অরপদিকে যারা স্বাধীনতাকে হরণ করেছেন তারা তার কাছে অপ্রিয়। সুতরাং মুঘলরা দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ শাসন করেছেন। যতদিন তারা হিন্দুদের সাথে সহাবস্থানের নীতিতে বসবাস করেছেন ততদিন জাতি-ধর্ম নির্বশেষে সবার কাছে এই রাজবংশের গ্রহণযোগ্যতা ছিল সমান। এইজন্যই আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহাজাহানের প্রতি বঙ্কিম ততটা অসহিষ্ণু নন। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে আওরঙ্গজেব মহাপাপিষ্ট

ধুর্ত, কপটচারী পরপীড়ক প্রজাপীড়ক ও স্বার্থপর। তাছাড়া তিনি উদার বাদশা আকবর কর্তৃক বাতিলকৃত জিজিয়া কর আবার অমুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেন, মন্দির ধ্বংস করেন। এই সমস্ত পরধর্মবিদ্বেষী মনোভাবের কারনে আওরঙ্গজেব ও তার সম্রাজ্যের পতনের কারনে বলে মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র। অনেক ঐতিহাসিক তা মনে করতেন কারণ হিসাবে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে কিছু ইংরেজ লেখকের নাম যারা সমস্বরে আওরঙ্গঁজেবের নিন্দা করেছেন। তবে সম্ভবত স্যার যদুনাথ সরকার সর্বপ্রথম ফারসী কিতাব, দলিল দস্তাবেজ, চিঠি-পত্র ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রকৃত জীবন ইতিহাস সংকলন করেন। ইসলাম ধর্ম এবং আওরঙ্গজেব সম্পর্কে তাঁর লেখা সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষ না থাকলেও তিনি আওরঙ্গজেব ও তাঁর সমসাময়িক মুঘল রাজত্বের ইতিহাস রচনা করেছেন তা অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি রাখে।

অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার আওরঙ্গজেবের চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন- 'The ruler was free from vice stupidity and sloth. His intellectual keenness was proverbial, and at the same time he took to the business of governing with all the ordeour which nen usually display in the pursuit of pleasure. In industry and attention to public affairs he could not be surpassed by any clerk. His patience and perseverance were as remarkable as his love of discipline and order. Private life he was simple and obstemious like a hermit. He faced the privations of campaign or a forced march as uncomplainingly as the most seasoned privat. No terror could daunt his hearts, no weakness or pity melt it. of the wisdom of the ancients which can be gathered from ethical books, he was a master. He had, besides, undergone a long and successful probation in war and diplomacy in his fathers reign."[১১২]

শাসন-শৃংখলা রক্ষায় দক্ষ ও কঠোর পরিশ্রমী ও জন কল্যাণে অবিচল একজন শাসকের নামে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে সত্য মিথ্যার বিষদাগার করেছেন পরবর্তী ঐতিহাসিকদের লেখায় তা প্রমাণিত হয়েছে। টডের 'রাজস্থান' এক সময় ইতিহাস বলে গণ্য করা হতো- পরবর্তীতে জানা যায় যে এর ঐতিহাসিক সততা খুব কমই আছে। এ সম্পর্কে কালিকরঞ্জণ কানুনগো বলেছেন টড সাহেব ভাই ও কবিদের মনগড়া কথায় তাহার ইতিহাস ভর্তি করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হারাচাঁদ ওঝা মহাশয় চল্লিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজপুতনার ইতিহাস অধ্যায়ন করিয়া টডের রাজস্থানের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ

করিয়াছেন। এ কাজে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি সম্প্রতি ছাড়িয়ে দিয়াছিলেন। কারন, তিনি দেখিলেন, শুদ্ধ করিতে গেলে খোল ও নলিচা দুইই বদলাইতে হয়। সেই জন্য তিনি হিন্দিতে রাজপুতনার ইতিহাস লিখিয়া তাহা মহামতি টডকে উৎসর্গ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর, ইহার তিন খন্ড ছাড়া হইয়া গিয়াছে। গৌরী শ্বঙ্করজীর মতে "কর্ণেল টড প্রভৃতি পন্ডিতেরা গুছিল হইতে সমরসিংহ কিংবা রত্নসিংহ পর্যন্ত যে কিছু বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, উহা প্রায় না লেখার মত।"[১১৩]

টডের রাজস্থান পাঠ করিয়া আমরা অনেকে সাতিশয় উপকৃত হইয়াছি এবং ভবিষ্যতেও অনেকে উপকৃত হইবেন; কিন্তু ইহা দ্বারা অনিষ্টও হইয়াছে। হিন্দু-মুসলম,ানের পরস্পরের বৈরীভাব জন্মাইবার বা জাগাইয়া রাখিবার একটি প্রধান কারণ এই গ্রন্থখানি। আমরা যেমন করিয়া এই গ্রন্থ পড়িয়া এবং এই গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বহু কাব্য উপন্যাস ও নাটক পড়িয়া হিন্দু-মুসলমানের অতীত-ঝগড়া জাগাইয়া রাখি। ইংরাজেরা তেমন করিযা কোন গ্রন্থের সাহায্যে এংলো স্যাকশন ও নর্মানের ইংরাজ সংকচের এবং রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টের ঝগড়া জাগাইয়া রাখে না।[১১৪]

তিনি শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিলেন তেমনি ভদ্রতা ও কোমল ব্যবহারে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রন ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ঠ। আওরঙ্গজেব কতটা বিনয়ী ছিলেন তা বুঝা যায় পিতার (শাহজাহান) চিঠির উত্তরে লেখা তাঁর চিঠি হতে তিনি লেখেন- æWhat your Mayesty has out of favour kindness, written what your gracious pen concerning this humble slave has come down like revelation from the Heaven Hail true saint and spiritual guide! æ Thou givest honour to whosever Thou wishest and disgrace to whom Thou desirest. (The Quarn). ... I consider wounding the heart of others is the worst of sins and the most shameful of vices.[১১৫]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আওরঙ্গজেবের মত রাজর্ষি প্রকৃতির অসাধারণ শক্তিশালী শাসক বিরল। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল নির্মল ও নিষ্কলুষ। তিনি ছিলেন পরধর্ম সহিষ্ণু ও গৌড়া সুন্নি মুসলমান। ব্যক্তি জীবনে ইসলামে আইন-কানুন পরিপূর্ণভাবে পালন করতেন। সাম্রাজ্যের সেবায় তিনি আজীবন প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু রাজকোষ হতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি। যে টুকু সময় অবসর পেতেন তখন টুপি সেলাই ও পবিত্র কুরআন নিজ হাতে লিখে তা বিক্রি করে সেই অর্থে তিনি নিজের ব্যকতিগত ব্যয় নির্বাহ করতেন। বিশাল সম্রাজ্যও ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্যার জীবন যাপন করতেন। এইসব কারণে তিনি ইতিহাসে 'জিন্দাপীর'[১১৬] বলে খ্যাতি লাভ করেন।

তিনি কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রাজ্য শাসন ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মানুমোদিত কয়েকটি বিধান জারি করেন। দর্নীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন, ধর্মহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা হতে তিনি সম্রাজ্যকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন। সমাজে সকল লোকের নৈতিক উন্নতির জন্য সম্রাট মদ পান ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করেন। তিনি হিন্দুদের সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা ও রহিত করেন। ইসলাম ধর্মানুমোদিত কিছু বিধি বিধান সম্রাজ্যে জারিক করার জন্যই হয়ত সকল মুঘল সম্রাট অপেক্ষা আওরঙ্গজেব সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন; এমনি যুদ্ধক্ষেত্রে ও তিনি নামাজ আদায় করেছেন। তিনি অত্যান্ত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন শাসক ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে যদুনাথ সরকার লিখেছেন- That Aurangzib had a natural keenness of mind and quackly learnt what he read we can readily believe. His correspondence proves that he had thoroughly matered the Quran and the Traditional sayings of Muhammad (Hadis) and was ever ready with apt quotations from them. He spoke and wrote Arabic and persian like a scholar. Aurangzib wrote Arabic in givorous and Masterly naskh hand. In this he used to copy the Quran. Tow such manuscripts of his transcription he presented to Mecca and Medina after richly binding and illumination then ..... His favourite study was theological works. commentaries on the Quran, the Traditions of Muhammad. Canon law, the works of Imam Muhammad Ghazzali selections from the letters of Shaikh Sharf Yahea of Munis and Shaikh Zain-ud-din Qutle Muhi Shirazi and other works of that class.[১১৭]

এই সমস্ত কারণে ভারতীয় মুসলমানদের নিকট তিনি অত্যন্ত পূজণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন সিন্দেহে। এহেন সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট বদ্‌জাতের ধাড়ি, মহাপাপিষ্ঠ ধূর্ত্ত, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক ইত্যাদি। যিনি সদা সর্বদা কৃষক প্রজা ও জন সাধারণের কল্যাণে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন এবং কৃষকদের কল্যানে নানা ফরমান জারি করেছেন। এতে প্রজাদের প্রতি আওরঙ্গজেবের মনোভাব বুঝতে পারা যায়। রসিকদার ক্রোরী নামক জনৈক উচ্চপদস্থ রাজস্বসংগ্রাহক কর্মচারীর প্রতি তিনি যে ফরমান জারি করেছিলেন, সেই ফরমানের ভূমিকা ছিল- That all the desires and aims of the Emperor are directed to the increase of cultivation, and the welfare of the peasantry and the people at large, who are the marvellous creation of and a finest from the creator.[১১৮] কৃষকরা পতিত জমি ভালভাবে চাষ করতে পারে কৃষিক্ষেত্রে জল সেচের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগীতার কথা বলেছেন। অন্য এক ফরমানে বলেছেন, Assess their revenue in

such a way that the ryots at large may get their dues and the Government money may be collected at the right time and no ryout may be oppressed.[১১৯]

তিনি ফরমান জারি করেই ক্ষ্যন্ত হন নাই, কোন রকম অনিয়ম না হয় সে জন্য তিনি রসিকলালকে সর্তক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন- You yourself should constantly get information, andif you find any one doing so and not heeding your probibition and threat, report the fact to the Emperor, that he may be dismissed from the service and another appointed in his place.[১২০]

উল্লিখিত ফরমানসমূহ হতে বুঝা যায় যে আওরঙ্গজেব প্রজাদের প্রতি কতকটা আন্তরিক দরদী এবং দায়িত্বশীল ছিল। হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করার যে অভিযোগ তিনি তুলেছেন তারও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। পবিত্র কুরআনের বিধান অনুসারে কোন ধর্মপরায়ণ মুসলমান কখনোই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন অমুসলমানকে মুসলমান করতে পারেন না। হযরত মুহাম্মদ (স:) ও তাঁর খলিফাদের শাসনামলেও এমন ঘটনা কখোনো ঘটেনি। আর আওরঙ্গজেবের মত ধর্মপরায়ণ শাসক ইসলাম ধর্মের নীতি বিরুদ্ধে পদ্ধতিতে অমুসলমানদের নির্যাতিত করে মুসলমান করবেন তা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব, হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা জিজিয়া প্রবর্তন ইত্যাদি অভিযোগ সমূহের সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি।

আওরঙ্গজেব তাঁর সাম্রাজ্যের সকল প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি বাস্তবিকই হিন্দু-বিদ্বেষী হলে তাঁর দরবারে ও রাজ্যে হিন্দুদের কখনো উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন না। হিন্দু মন্দিরের জন্য কখনো দেবোত্তর ব্যবস্থাপূর্বক সনদ প্রদান করতেন না। হিন্দু পন্ডিত মন্ডলীর জন্য জায়গীর ও বৃক্তি প্রদান করনে না। আওরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বকালে ২৭ জন হিন্দুকে খুব বড় বড় রাজ পদে নিযুক্ত করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ সুবাদার কেহ কেহ বা অন্যান্য বিভাগে নিযুক্ত হন। [১২১]

'নদওয়াতল-ওলামা' নামক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষাবিস্তারনী সভার বেনারসস্থ অধিবেশনে কর্তৃপক্ষ পুরাতন হস্তলিপির একটি প্রদর্শনী বিভাগ খুলিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে যে সকল পুরাতন হস্তলিপি প্রদর্শিত হইয়াছিল তম্মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় মুসলমান বাদশাহগনের সনন্দপত্র। উল্লিখিত সভার সেক্রেটারী মৌলভী শিবলা নোমানী তৎপ্রণীত "আওরঙ্গজেব আলমগীর" পুস্তকে লিখিয়াছেন প্রদর্শনীর সংগৃহীত সনন্দপত্রসমূহের মধ্যে অধিকাংশ সম্রাট

আওরঙ্গজেব প্রদত্ত। আবার যে সকলের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু-রাজা মহারাজা ও জমিদারগনের জায়গীর সম্বন্ধীয় সনন্দপত্র। [১২২]

সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি পূর্বের বাদশাহদের প্রবর্তিত যে ৮০ প্রকারের কর বাতিল করেছিলেন তার মধ্যে অনেকগুলো কর শুধু হিন্দুদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হত। যদুনাথ সরকার লিখিত Mughal Administration এ পঞ্চম অধ্যায়ে ৬৫টি কর বাতিলের উল্লেখ আছে। শেষের দুইটি হলো, প্রায়াগে যে সমস্ত হিন্দু তীর্থযাত্রী গঙ্গাস্থান করতে যেতেন তাদের চার আনা ট্যাক্স দিতে হতো। হিন্দুর চিতাভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপের জন্য ও ট্যাক্স আদায় করা হতো। আওরঙ্গজেব উভয় কর বাতিল করে সহৃয়তা ও হিন্দু প্রীতির পরিচয় দেন তাতে সন্দেহ নেই।

এ সম্পর্কে Dr. Sadeque Ali লিখেছে when Aurangzib abolished about eighty taxes no thanked him for his generosity but when inposed only one tax (gigia) not heavy at all, people began to show their displeasure.[১২৩]

রাজকার্যের বিভিন্ন স্তরে হিন্দুদের নিযুক্ত করা হতো। বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগে, কেরানী ও মুনশীদের অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন- 'From the middle of the 17th centruy onwards most of the Munshis were Hindus and their propartion repidly increased. The Hindus had made a monopoly of the lower ranks of the Revenue Department... [১২৪]

অধিকাংশ যুদ্ধেই মুসলমান সেনাপতিদের সাথে হিন্দু সেনাপতিরা সমবেতভাবে এবং বিশ্বস্ততার সাথে আওরঙ্গজেবের স্বপক্ষে যুদ্ধ করেছেন। সোমগড়ের যুদ্ধে দারা শিকোর বিরুদ্ধে মুসলমান সেনাপতিদের সঙ্গে চম্পত, রাও, ভগবান সিং, সুজার বিরুদ্ধে খাজোয়ার যুদ্ধে সেনাপতি রাজা সুজানসিংহ এবং রামসিংহসহ আরো অনেকে আওরঙ্জজেবের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া রাজা জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ সেনাপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন। আওরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার পর নিজ সেনাদলের অন্যতম প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। যশোবন্ত সিংহকে কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করলে ধর্মাতের যুদ্ধে সম্রাট সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়ে রাজপুতনায় পলায়ন করেন। এইরূপ ব্যবহার সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব তাঁকে পুনরায় রাজ কার্যে নিযুক্ত করেন।

ঐতিহাসিক এলফিনষ্ট সাহেব বলেন- আওরঙ্গজেবের হস্তে একটি হিন্দু ও নিহত হন নাই; কিংবা ধর্মের জন্য কেহ বন্দ্রী বা সম্পত্তিচ্যুত হয় নাই; অথবা কোন হিন্দু পূর্ব পুরুষ প্রচলিত পূজাদি হতেই কখোনই বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই।[১২৫]

আওরঙ্গজেব নিজেও এরূপ ঘোষনা প্রচার করেন- "ইসলামের শরীয়ত অনুযায়ী আমরা আদেশ দিতেছি যে, হিন্দুগণের মন্দির ও প্রতিমা পূজার অধিকার থাকিবে এবং আমাদের আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। আমরা আদেশ করিতেছে যে, এই আদেশ বাণী প্রচারের তারিখ হইতে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মনের প্রতি কোন পূজা বিষয়ে অত্যাচার করিতে পারিবে না। আমাদের প্রজাগণ সুখ শান্তিতে বাস করুক এবং আমাদের মঙ্গল কামনা করুক।[১২৬]

মন্দির ধ্বংসের বিষয়গুলি রাজনৈতিক ধর্ম নয় যেসব মন্দিরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে সেইসব মন্দির ধ্বংস করেছেন? অন্য অনেক মুসলমান বাদশাহ ও রাজনৈতিক কারণে অনেক হিন্দু রাজাও মুসলমানদের মসজিদ ধ্বংস করেছেন। আওরঙ্গজেব পঁচিশ বৎসর বৎসরের অধিক সময় বাস করেছেন। তাঁর বাসস্থানের দুই তিন মাইলের মধ্যে হিন্দু সভ্যতার সব উচ্চতর নিদর্শন, দেবদেবীর বিচিত্র মূর্তিশোভিত প্রসিদ্ধ এলোরার একটি মূর্তিও তিনি ধ্বংস বা বিকৃত করেননি। এগুলি এখনও পূর্বের গৌরব বহন করছে।

আওরঙ্গজেব সিংহাসনারোহনের পরবৎসরই বেনারসের হিন্দুদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বিশেষভাবে নিষেধ করে ফরমান জারি করেছিলেন "ভবিষ্যতে যেন কোন তথাকার বেনারসের হিন্দু অধিবাসীদিগকে ধর্ম বিষয়ে কোনরূপ অন্যায় উৎপীড়ন না করেন। তাহারা যেন নিজ নিজ ব্যবসায়ে রত থাকিয়া নিশ্চিত মনে উপসান করিতে পারে।" বেনারসী ফর্মান R.F.R.A.S 1911 'আওরঙ্গজজেব সিংহাসনারোহনের পর দীর্ঘ বার বৎসর হিন্দুদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে কোনরূপ বিরোধ হয়নি। যখন রাজপুত জাতির সাথে তার রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও যুদ্দবিগ্রহ উপস্থিত হয় সেই সময় তিনি কয়েকটি মন্দির ধ্বংস করেন। অর্থাৎ তিনি হিন্দুদের বিগ্রহ দমন ও অন্যায় কার্যের প্রতিকার কল্পেই একান্ত সামরিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে কয়েকটি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। ধর্মীয় গোড়ামীর কারণে মন্দির ধ্বংস করেছেন এমন ঘটনার কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নাই। সম্রাট শাহজাহান এইরূপ প্রয়োজনে একমাত্র বেনারসেই ছিয়াত্তরটি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও প্রসি্দ্ধ জ্বালামুখি মন্দ্রির ধ্বংস করতে বাধ্য হন। কিন্তু সে জন্য তারা আওরঙ্গজেবের মত এত সমালোচিত হন নাই। অনেক মুসলমান নৃপতি বাধ্য হয়ে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। সেইরূপ অনেক হিন্দু নৃপতিও মুসলমানদের মসজিদ ধ্বংস করেছেন। তা ঐতিহাসিক সত্য।'[১২৭]

জিজিয়া করের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আওরঙ্গজেব সিংহাসনারোহনের পর ৮০ প্রকারের কর তুলে দেওয়া এবং বছরের পর বছর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ পরিচালনার ফলে রাকোষে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে তিনি জিজিয়া কর পুনরায় প্রবর্তন করেন ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা গ্রহণের একুশ বৎসর পর। যদি তিনি ধর্মান্ধতাবশত এ কাজ করতেন তাহলে দীর্ঘ একুশ বছর অপেক্ষার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে আওরঙ্গজেব কোন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারনে নয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই জিজিয়া কর পূন:প্রবর্তন করেন। এটি ছিল সামরিক কর। এই কর প্রদানের মাধ্যমে অমুসলমানরা সামরিক কার্যে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন।

সম্রাট আকবর এই কর উঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সামরিক কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট তা আইন সংগত মনে হয়নি। তিনি মনে করতেন কোন অমুসলমান তার নিজ ইচ্ছায় সামরিক কার্যে যোগ দিবেন অথবা জিজিয়া কর দিয়ে অব্যাহতি পাবেন। এজন্য তিনি এই কর পূণ:প্রবর্তন করেন। তবে ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, শিশু, উম্মাদ ও বৃদ্ধদের এই কর দিতে হতো না।

আওরঙ্গজেব সম্পূর্ণ দোষ ত্রটিমুক্ত ছিলেন তা প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এইটুকু বলা যায় যে তিনি সম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার অনেক উর্দ্ধে ছিলেন। এবং নিঃসন্দেহে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহৎ এবং শান্তি সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তারপরও তিনি নিজের জীবিকার্জনের জন্য রাজকোষ হতে কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। পবিত্র কুরআন নকল ও টুপি সেলাই করে বিক্রিত অর্থ দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহ করতেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী সম্রাট হয়েও তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। যেখানে তার পূর্ব পরবর্তী সম্রাটরা যা কল্পনাও করতে পারেননি। তাঁরা অতি জাকজমকও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন।

অপরদিকে 'রাজসিংহ' উপন্যাপসে রাজসিংহের চরিত্রে ছিল নানা গুনের সমাহার। তিনি ছিলেন বীরযোদ্ধা। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছেন। হিন্দুদের উপর অর্পিত জিজিয়া কর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। রাজপুতদের কুলমান রক্ষা কল্পে নারীর সতীত্ব রক্ষা করেছেন। জয়সিংহ মানবিক তাঁর চরম শ্রতু আওরঙ্গঁজেবকে রন্ধ্রমধে হাতের মুঠোয় পেয়েও ক্ষমা করেছেন। উদিপুরী জেবউন্নিসাকে বন্দী করেও আতিথিয়তাপূর্ণ ব্যবহারে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাছাড়াও হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ধ্বংস, লুটতরাপজ হিন্দু রাজ্যে গো-হত্যার নির্দেশ

প্রভৃতির বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করেছেন ও রুখে দাড়িয়েছেন। তাই তো বঙ্কিমচন্দ্রের দুঃখ- রাজসিংহ এতবড় বীর, এতবড় বিদ্রোহী, আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়অ মরি-রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানিনা।[১২৮]

শ্রী শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত বঙ্কিম-জীবনীতে লিখেছেন- বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়েছিলেন শুধু হিন্দুই নয়, হিন্দু ধর্মের নেতা ছিলেন।[১২৯] দেশের রাজনীতি তখন পরিপূর্ণভাবে হিন্দুত্বের দিকে ঝুকে পড়েছে। হিন্দুধর্ম প্রীতি ও দেশভক্তি প্রতিশব্দের মত গৃহীত হতে লাগল। বাল গঙ্গাঁধর তিলক তখন উদয়ের পথে। কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের মুক্তি কামনা, সার্বজনিক গণপতির পূজা এবং শিবাজী উৎসবের রূপকে প্রবল প্রানোম্মাদনা সৃষ্টি করে।[১৩০]

এইরূপ অবস্থায় দীর্ঘকাল পরে ১৮৯৩ সালে 'রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণ করতে বসে এর আমূল পরিবর্তন সাধন করে। এতে পঞ্চম থেকে নবম খণ্ড পর্যন্ত রাপুতের সঙ্গে মুঘলের যে যুদ্ধ বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে আওরঙ্গজেবের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাধি পুনর্লিখিত। যাকে মুনির চৌধুরী বলেছেন- 'এক কথায় সম্প্রদায়িক অসূয়া-উদ্দীপক যে একাদশ উদ্ধৃতি আমরা সংকলিত করেছি, তার প্রথমটি ছাড়া অন্যগুলো প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত। যদি প্রমান করা যেত যে রাজসিংহ পুণ:প্রণীত হয়েছে ইতিহাসকে মর্যাদা দান করবার জন্য, তাহলে হয়ত সংযোজিত অংশসমূহের অপ্রীতিকরতা নিয়ে চিন্তার্ন্বিত হওয়ার কারণ ছিল না।[১৩১] এরপর তিনি প্রশ্ন করেছেন রাজসিংহের কথা ও ভাব সত্যিই ঐতিহাসিক কিনা। এক্ষেত্রে তিনি সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের সমর্থনে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে ব্যর্ত হয়েছে বলে মনে করেন। কোন একজন হিন্দুকে বড় করিতে যাইয়া তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন। যুদ্ধের ফল যাতা লিখিয়াছেন তাও অসত্য ও অবিশ্বাস্য এবং এই জাতীয় বর্ণনায় রাজপুতের গৌরব বেড়েছে মনে হয় না।

'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা যে আওরঙ্গজেবকে দেখিতে পাই তিনি অসর্তক ও অক্ষম এবং তাঁহাকে হতবুদ্ধি করিয়া পরাস্ত করা খুব সহজ। রন্ধ্রপথে ঔরংজেবকে আবদ্ধ করার কথা বঙ্কিমচন্দ্র অর্ম ও মনুষীর প্রন্থে পাইয়াছিলেন এবং তিনি ইহাকে তাঁহার উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু ঔরংজেব চরিত্র ও যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে যে ধারণা আমরা ইতিহাসে পাই তাহার সঙ্গেঁ এই পরাভবের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বেমানান হইয়া পড়ে। প্রায় সকল দিক বিচার করিলেই দেখা যায় যে, ঔরংজেবের চিত্র এবং রাজপুত যুদ্ধের কাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের দাবি মিটাইতে পারেন নাই; ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশ রূপকথার মত মনে হয়। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখিতে পাই যে, গ্রন্থকার কল্পনার সাহায্যে সত্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন; কাল্পনিক চরিত্র ও কাল্পনিক ঘটনার

সাহায্যে অথীতকালের যে চিত্র আঁকা হয় ইতিহাস তাহার মধ্যে সজীব হইয়া উঠে। এইখানে সেই উচ্চাঙ্গেঁর ঐতিহাসিক কাব্যের পরিচয় াওয়া যায়না। সুবোধচন্দ্র আরো বলেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য আধুনিক ইতিহাসের সঙ্গেঁ পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের নিকট হইতে আমরা উচ্চাঙ্গেঁর কল্পনা দাবি করিতে পারি। তিনি যদি ঔরংজেবের চরিত্রের যথাযথ পরিকল্পনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি এইসকল রাজপুত কাহিনীর অসম্ভাব্যতা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিতেন।[১৩২]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও 'রাজসিংহের' সমালোচকগণ যেমন ড: শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, স্যার যদুনাথ সরকার ব্রজেন্দনাথ বন্দোপাধ্যায়, মোহিত লাল মজুমদার, ড: সুকুমার সেন, ড: অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, ড: আশুতোশ ভট্টাচার্য, ড: দ্রবীপদ ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ বিশী, ড: বিজিত কুমার দত্ত, ড: অপর্ণা প্রাসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ মনে করেন রাজসিংহ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সেইরূপ দাবী করেছেন- এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এই পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস পণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকায্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারিনাই তাহা বলা বাহুল্য। রবিন্দ্রনাথ রাজসিংহ' উপন্যাস নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেছেন- 'রাজসিংহ' প্রথম হতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে কোন ঘটনা কোন পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপন করিতেছেন। সকলেই অবশ্রাম চালিয়াছে। এবং সেই অগ্রগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিনামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিযাছে। মুনীর চৌধুরী এই আলোচনার সমালোচনা করেছেন তাঁর মতে এই সিদ্ধান্ত পুন:পরীক্ষার যোগ্য অন্তত:পক্ষে কাহিনীর একাদশ স্থলে যে মুসলিম পাঠকের মনোযোগ কাহিনীর গতিপথ থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়তে পারে যেস আশঙ্কা অমুলক নয়।[১৩৩]

তিনি যদুনাথ সরকারের সঙ্গেও ভিন্নমত পোষণ করেছেন- যদুনাথ সরকার রাজসিংহের ঐতিহাসিক বিচ্যুতিগুলি সামান্য বিষয়ের, গৌণ্য মূল্যের বলে অভিহিত করেছেন যা ঐতিহাসিক উপন্যঅসের রসতত্ত্বগত মানদন্ডে উতরে যাবে। মুনীর চৌধুরীর মতে যদুনাথ সরকারের অভিমত দ্বন্দ্বপূর্ণ। মূখ্য গৌণের এই ভেদতত্ত্বের মধ্যে যে একটা সুক্ষ্ম স্থুল বঞ্চনা আছে তা অমুসলমান পাঠক সমালোচকরা কেবল নিজেদের বদ্ধমূল সংস্কারের জন্যই দেখেও দেখতে পাননি। নইলে সহজেই ল্কষ করতেন যে ইতিহাসের সম্পদ কখনই সরল অনুপাতে সাহিত্যে পরাক্রমশীল থাকেনা। সাহিত্যের প্রবল অভিঘাতময় পরিস্থিতিও ইতিহাসের নিজস্ব মানদন্ডে নিত্যান্ত তুচ্ছ বলে বিবেচিত হতে পারে। দৃষ্টি ভঙ্গির সামান্য হেরফেরের জন্য এককালে একগোষ্ঠার কাছে ইতিহাসের কোন বিশেষ অংশ র্ঘণ্য বা বরেণ্য বলে অনুভূত হয়, প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিল্পী সাহিত্যিকরা তার হেয়তা বিধানে বা গৌরব বর্ধনে তৎপর হয়ে উঠে। কুশলী শিল্পী

লাঠি না ভেঙ্গে সাপ মারতে পারেন। ইতিহাসের ঘাড় না মটকেও বৃহ॥কে ক্ষুদ্র এবং অপরিজ্ঞাতকে মহাবিখ্যাত রূপে উপস্থাপিত করা সম্ভব। 'রাজসিংহ মুসলিম পাঠকের মনে যে যে কারণে তিক্ততা সৃষ্টি করে সে গুলো তার মত অবহেলা করবার মত নয়। যদি সে অবহেলা করতে পারত তবে তার মনে তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারত না। তখন ঐ সামানী বস্তুসমূহ ঐতিহাসিক না অনৈতিহাসিক সে প্রশ্নও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হত না।'[১৩৪]

বাঙালী জাতয়তাবাদী চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশ কাল ও সমাজ চেতনায় যে পরিবর্তন এসেছিল সেই পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্রের ভিন্নরূপ লেখকগণ বিভিন্নভাবে চিত্রিত করেছেন। এর প্রমান আমরা পাই ভুদেবের আওরঙ্গজেব এবং বঙ্কিমের আওরঙ্গবেকে পাশাপাশি দাড় করালেই তার অবয়ব বুঝা যায়। ভুদেব আওরঙ্গবে সম্পর্কে নিস্পৃহ, শিবাজীর সাহসে দীপ্টতীমান। বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেব সম্পর্কে সচেতন রাজসিংহের সংগ্রামে কৌশলী। 'উনিশ শতকের অব্যবহিত দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের ইতিহাসবোধ, স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় চেতনা ছিল অনবলম্বিত বিষয়ের বিক্ষিপ্ত বর্ণনা। আর উনিশ শতকের দূর দ্বিতীয়ার্ধে তাই হয়ে উঠেছিল এক অবলম্বিত তৃদয়াকাঙ্কার অন্তরঙ্গ উচ্চারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের আওরঙ্গজেব অন্তরঙ্গ আলোকে চিহ্নিত হয়েছে, ভূদেবে হয়েছে তা আলো-আঁধারের দ্বিধা-দ্বন্ধে। আওরঙ্গজেবে প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিরূপ মনোভাব, তা স্বাধীনতাকামী স্বজাতিভক্ত বঙ্কিমের প্রতিপক্ষকে ছলেবলে কৌশলে পরাভুত করার মানসিকতা থেকে ব্যাখেয়।'[১৩৫]

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে- 'রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ মূল ঘটনাও প্রধান চরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা তাঁহাকে পদে পদে ঐতিহাসিক সত্য হইতে বিচ্যুতি করিয়াছে। ঔরঙ্গজেব অনুদার, "ধর্মশূণ্য" হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধি সাহস ও ক্ষমতার অভাব ছিল না, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী খুব কমই দখো যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন এক স্ত্রীবুদ্ধিচালিত, শিথিলশাসন, অক্ষম কামুক কাপুরষের চরিত্র।[১৩৬] তবে এত কিছুর পরে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস শেষে উপসংহারে একটি নিবেদন পেশ করেছেন- 'গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, তিন্দু-মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য দির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্ধেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালনন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুনে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অফেক্ষা রাজকীয় গুনে শ্রেষ্ঠ; অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা

রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। পরিশেষে এই বিতর্কের অবসান প্রয়োজন। তা হলো 'রাজসিংহ' কি কেবল জাতিবৈরিতা উৎপাদক পাক-ভারতের এক ঐতিহাসিক বিষবৃক্ষ মাত্র? আমরা সেরকম মনে করি না। 'রাজসিংহ' বঙ্কিমের এবং বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁর সামাজিক সত্তার অনুদার মনোভাবের জন্য নয়, তাঁর শিল্পী সত্তা অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে- অনুপ্রাণিত সৃজন কর্মের মুহূর্তে সকল সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছিল বলে। বঙ্কিম-মানসের এই দ্বন্দ্ব তাঁর প্রায় প্রত্যেক সার্থক উপন্যাসের মধ্যেই লক্ষনীয়। কিন্তু একবার তাঁর কল্পনা যখন নিজের সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি ধমনীতে উষ্ণ রক্তের মত সবেগে প্রবাহিত থাকে তখন তাঁর চিত্ত আর নিম্মমার্গীয় চিন্তার বশ থাকে না। জীবনের মহত্তম আবেগ, তার গূঢ়তম সত্য তার সহস্র জটিলতার মেহানীয় লীলা ক্রমশ: উম্মেচিত হয়ে এক বিস্ময়কর মহামূল্যবা জগৎ সৃষ্টি করে। জেবউন্নিসা যখন থেকে প্রবেহ্নিতে দগ্ধ হতে শুরু করেছে সেই মুহূর্ত থেকে বঙ্কিম তার যবনী নাম ভূলে গেনে, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে এই রমনীরত্নের সঙ্গেঁ নিজেও উচ্চস্বরে রোদন করেছেন। মবারককে সেই হৈ বহ্নিশিখা স্পর্শ করল অমনি সেও প্রদীপ্ত হয়ে রাজসিংহকে নিস্প্রভ করে দিল। তখন মোগল বীর হল 'রণপন্ডিত' আর রাজপুত বীর 'হরণ ও অপহরণে দক্ষ।'[১৩৭]

A\b›'gV

বঙ্গঁদর্শনে 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে চৈত্র ১২৮৭- জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯। বঙ্কিমের জীবিতকালে অর্থাৎ ১৮৮২ সালে 'আনন্দমঠ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই বইটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালী হিন্দু জাতির জাতীয় জীবন হাঠন ও দেশের যব সম্প্রদায়কে স্বদেশভক্তি ত্যাগ ও সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষে 'আনন্দমঠ' রচিত হয়। যদিও পরবর্তীতে উপন্যাসটি উদ্দেশ্যমূলক দোষে দুষ্ট বলে সমালোচিত হয়। বিখ্যাত 'বৃন্দ মাতরম' গানটিও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্ভূক্ত। গানটি হিন্দু জাতির জাতীয় জীবনে এতটাই আলোড়ন তুলেছিল যে ১৮৯৬ সালের জাতীয় কংগ্রেসের অীধবেশনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গানটি গেয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ' এর বিষয়বস্তু ১৭৬৫ এর পরবর্তী আঠার শতকের বাংলার সাধারণ জনসমাজের দারিদ্র্য দস্যূভীতি দুর্ভিক্ষ ও অনটন এর চিত্র। এর ফলে জনগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল উপন্যাসের মধ্যে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'আনন্দমঠ' এর গল্প শুরু হয়েছে ১৭৬৯ইং (১১৭৬ বাংলা) সালের পটভূমিকায় যা ছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বছর। সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন সন্নাসী বিদ্রোহের মাধ্যমে সন্তানদের অভ্যূদয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ-আলমের এক লপমানের মাধ্যমে ইংরেজ কোম্পানী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ান লাভ করে। অর্থাৎ সমগ্র দেশের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পায়। মূলত দেশে অরাজকতা এবং শোষণের শুরু তখন থেকেই। এ সম্পর্কে ১৭৬৫ এর সিলেকট কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

Presidency divided, headstrong and licentions, a Government without nerves, a treasury without money and service without subordination, disciptione and public spirit .... amidst a general stagnation, of useful industry and of licensed commerce, individuals were accumulating immense reiches, which they have revished from the insulted prince and helpless people, who groaned under the united pressure of discontent, poverty and appression.

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার রবার্ট ক্লাইভ বাংলার গভর্ণর হয়ে আসেন এবং দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে নবারের দায়িত্ব ছিল কিন্তু কোন ক্ষমতা ছিল না। অর্থের জন্য তাঁকে কোম্পানীর দয়ার উপর নির্ভর করতে হতো। অপরপক্ষে কোম্পানীর অর্থের কোন অভাব ছিল না, কোম্পানীর স্বার্থপরতা ও দুর্নীতি পরায়ণতার ফলে বাংলার শাসনকার্যে এক চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব মীরজাফর মৃর্ত্যুবরণ করলে তাঁর নাবালক পুত্র নাজিমউদ্দৌলাকে ইংরেজরা এই শর্তে নবাব করেন যে তিনি নামমাত্র নবাব থাকবেন, কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা একজন নায়েব-নাজিম বা নায়েব সুবাদারের হাতে থাকবে। বাংলা ও বিহারের জন্য ক্লাইভ নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করেন যথাক্রমে মুহাম্মদ রেজাঝান ও সীতার রায়কে। যারা রাজস্ব আদায় ও কোম্পানীর স্বার্থ দেখা শুনা করত।

লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা এদেশ বাসীর জন্য ছিল এক চরম অভিশাপ স্বরূপ। কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তাদের দুনীতির ফলে বাঙালিদের দুঃখ দুর্দশা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'নায়েব-নাজিম মুহম্মদ রেজা খান কলকাতার সিলেক্ট কমিটিকে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করলেও তারা এতে কোন গুরুত্বই দেননি। কোম্পানির কর্মচারিদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, অত্যাচার ও রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে দেশের সম্পদ হ্রাস পেতে থাকে কিন্তু রাজস্বের হার প্রতি বছর বাড়তেই থাকে। এ সম্পর্কে রেজা খান অভিযোগ করেন যে নবাব আলীবর্দী খানের আমলে পুর্নিয়া জেলার বাৎসরিক রাজস্ব যেখানে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা ছিল সেখানে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তা বৃদ্ধি করে ২৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। অন্যান্য জেলাতেও একইভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। এই অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে রেজা খানের উপর চাপ দেয়া হয় এবং তিনি রাজস্ব আদায়ে কঠোর ব্যবস্থা নেন। ফলে প্রজাদের সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা পোহাতে হয়। কোম্পানির উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী রিচার্ড বেচার ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে বিলেতের কর্তৃপক্ষের নিকট মন্তব্য করেন। কোম্পানির দেওয়ান লাভের

ফলে প্রজাদের যে দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে ইতিপূর্বে তা কখোনও দেখা হয়নি। পূর্বের অনেক স্বেচ্ছাচারী নবাবের শাসনামলেও দেশের যে অতুল সুখ ও সম্পদ ছিল তা এখন ধ্বংসের সীমানায় এসে দাড়িয়েছে।"[১৩৯]

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ দেশে ফিরে গেলে তার পরবর্তী দুজন গভর্ণর ভেরেলেষ্ট (verelst) ও কার্টিয়ার (cartier) এর সময়ে বাঙ্গালীর দুর্দশা আরও চরমে উঠে। এই সময় কোম্পানির কর্মচারী ও বণিক এবং নীলকরদের অর্থ লালসার দরুন ঐশ্বর্যশালী বাংলাদেশ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। দ্বৈত শাসনের ফলে বাংলায় অরাজকতা ও দুর্নীতি চরমভাবে আত্ম প্রকাশ করে যা মোকাবেলা করার মত ক্ষমতা বা সামর্থ নবারের ছিল না। বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৬৯-৭০ খ্রী:) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় এক কোটি অর্থাৎ মোট অদিবাসীর এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে ও পীড়ায় মৃর্তুমুখে পতিত হয় এবং কৃষিযোগ্য জমির এক তৃতীয়াংশ বঙ্গলে পরিনত হয়। এই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে এক ইংরেজ কর্মচারী ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে লেখেন 'বাংলার দুরাবস্থা কল্পনা ও বর্ণনার অতীত- এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, বহুস্থানে মৃতের মাংস খেয়ে মানুষ জীবন ধারনের চেষ্টা করেছে। কলকাতা কান্সিল বিলেতের কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে লিখে জানান যে, দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা নিরূপন করা কঠিন। সুফলা পূর্ণিয়া প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশের ও বেশী লোক মারা গেছে। অন্যান্য অঞ্চলের জনগন ও একই দুর্দশার শিকার হয়েছে। কোম্পানীর অর্থলোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা এই দুর্দশা লাঘবের কোন চেষ্টাই করে নাই বরং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়া সত্ত্বেও জনগনের নিকট থেকে জোর করে খাজনা আদায় করা হয়। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাধরন গৃহস্থ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়। পরবর্তী বিশ ত্রিশ বছর পর্যন্ত বাংলার এই দুর্ভিক্ষের চিহ্ন লোপ পায়নি। এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষের দৃশ্য বর্ণনা করে চর্লিস গ্রান্ট বলেন, 'আমি নিজ চোখে যা দেখলাম, মুশিদাবাদে ৭৭ হাজার লোককে অনেক মাস ধরে খাওয়ানোর পরও প্রত্যেক দিন সেখানে প্রায় পাঁচশ লোক মৃত্যুর কোলে ঢ়লে পড়ে। রাস্তাঘাট ও ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা মৃ দেহ শৃগাল কুকুর শকুনি খেতে থাকে। পঁচাদেহের পুঁতিগন্ধ অর্ধজীবিতের কান্না-কাতবানির জন্য রাস্তায় বের হওয়া যায় না। পরিস্থিতি এমই পাশবিক যে শিশু মৃত পিতামাতাকে খায়, মা তার মৃত বাচ্চাকে খায়।"[১৪০]

এই দুর্ভিক্ষের দু'বছর পরে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর গভর্ণর নিযুক্ত হন। দীর্ঘ দিনের দুর্ভিক্ষ, ইংরেজদের শোষণমূলক রাজস্ব-নীতি চিরাচরিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, দেশীয় বিচার ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ, দেশয়ি রীতিনীতি বিরোধী কার্যকলাপ, রাজনৈতিক বশৃঙ্খলা প্রভৃতি কারনে এদেশর জনগণ অতিষ্ট হয়ে

উঠে। এবং এরই প্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এগুলির মধ্যে ফকির সন্নাসী বিদ্রোহ অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় ও ছিয়াত্তরের মন্বান্তর ও সন্নাসী বিদ্রোহ। তবে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত কোন চরিত্র কেন্দ্রিক নয়। এটি রাজনৈতিক বিষয় ভিত্তিক একটি উপন্যাস। সেখানে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কিভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলেছিল তাঁর চিত্র ফুটে তুলেছেন। যদিও তিনি কল্পনার রং দিয়ে অতিরঞ্জিত করেছেন, তবুও এর এতিহাসিক ভিত্তি গ্রহণযোগ্য। আনন্দমঠ এ যে সন্নাসীদলের কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে সেই সন্নাসীও ফকিরের দল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করে। উত্তরবঙ্গে এদের অনেক প্রভাব ছিল। ফকিরগণ উরস বা বাৎসরিক উৎসবের সময় পান্ডুয়া দিনাজপুর ও মাস্থান গড়ের দরগার মিলিত হতো। এই সকল ফকিরগণ ভিক্ষা করে বেড়াত। ক্রমেই তারা শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক নযরানা আদায় করা শুরু করে। অপরদিকে সন্নাসীগনও আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে বিচ্যুত হয়ে জাগতিক সুখভোগের জন্য তৎপর হয়ে উঠে। ইংরেজগণ ফকির সন্নাসীদের অবাধ চলাফেরায় বাধা প্রদান করে, ভিক্ষা ও মষ্টি সংগ্রহকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে, দস্যু বলে আখ্যায়িত করে এবং দমন করার জন্য সরকার জমিদারদের সাহায্য কামনা করে। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফকির সন্নাসীরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

উল্লেখ্য দরিদ্র কৃষক 'সম্পত্তি-ভ্রষ্ট জমিদারও বেকার সৈন্যদল ফকির সন্নাসীদের দলে যোগ দিত। ফকির দলের নেতৃত্ব দেন মজনু শাহ বুরহান ও সন্নাসী দলের নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক। ফকির সন্নাসীদের বহুবার ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষ বাধে। ফকির ও সন্নাসীরা পৃথক পৃথকভাবে তাদের অভিযান চালাত। তাঁরা যেমন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত আবার প্রায় তারা পারস্পারিক সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। ফকির ও সন্নাসীরা নিজ নিজ স্বার্থের জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। দেশ রক্ষা বা জাতীয়তাবাদ তাদের লক্ষ ছিলনা। তারা বন জঙ্গঁলে আস্তানা গড়তো, তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গেঁ তাদের অবাধে মিলামিশার সুযোগ চিলনা। দেশের সাধারন মানুষ ফকির সন্নাসীদের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপে কখনও যোগ দেয়নি।'[১৪১]

তবে বঙ্কিমচন্দ্র সন্নাসীদের এই অরাজকতাকে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান হিসাবেই দেখাতে চেয়েছেন এবং তিনি উপন্যাসে তাদের উপস্থাপন করেছেন আদর্শবাদে উদবুদ্ধ সন্তানদল হিসাবে। যারা দশে মার্তৃকা পুনরুদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গ

করেছিল তিনি এই সন্তানদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বন্দে-মাতরম গানটি রচনা করেছিলেন যা পরবর্তীকালে দেশ মাতৃকার গান হিসাবে খ্যাতি লাভ করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে নানাকারণে 'আনন্দমঠ' ব্যাতিক্রমধর্মী উপন্যঅস। পূর্বের উপন্যাসগুলি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু 'আনন্দমঠ' এ কোন একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ঘটনাারার আবর্তিত হয়নি। একটি সংঘ, বহু সন্তানের কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে। যারা সন্নাসী এবং একটি বিশেষ আদর্শ ব্রতে ল্লি। তবে, 'আনন্দমঠ' কে অনেকে রাজপ্রশস্তি-সূচক বলেও মনে করেছেন; কেউ এতে বঙ্কিমের হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আছে বলৌ মনে করেছেন। 'আনন্দমঠ' আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছে, বঙ্টিকমকে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে জাতীয়তাবাদের ঋষি হিসাবে।[১৪২]

সন্নাসীবিদ্রোহ হয়েছিল বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে তা বীরভূম অঞ্চলে স্থাপন করেছেন। 'আনন্দমঠ' উপন্যাস লেখার সময়কার একটি ঘটনার কথা অক্ষয়চন্দ্র সরকার উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠের শেসে যুদ্ধের ভাগ তাঁহার হাতের লেখা খাতায় আমাকে পড়িতে দিলেন। আমি দেখিলাম, আমি দেখিলাম অজয় নদের উত্তর পাশ্বে স্থান আমি সন্তান শব্দ বুঝিতে না পারিয়া 'সন্তাল' পড়িতেছিলাম- মনে মনে। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, এবার Santal Insurrection theme কি হইল বাকি। তিনি বলিলেন, না Sannyasi Insurrection. আমি বলিলাম এই যে আপনি লিখিয়াছেন অজয়ের ধারে আর বার বার বলিতেছেন 'সন্তাল' সন্তালগণ; তিনি তখন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, একটা তোমার অনিচ্ছাকৃত ভূল সন্তাল নয়, সন্তান। আর একটা আমার নিজের ইচ্ছাকৃত ভুল- অজয়নদ ও বীর ভূমি।"[১৪৩]

অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি উত্তরবঙ্গের ঘটনাকে বীরভূমে স্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৮৩) পর্যন্ত তিনি কিছু বলেননি। তৃতীয় সংস্করনের (১৮৮৬ খ্রী:) ভূমিকায় ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করে হেস্টিংসের চিঠি থেকে প্রাসঙ্গিঁক অংশ সংকলণ করে সন্নাসী বিদ্রোহের বর্ণনা দিয়েছেন। পঞ্চম সংস্করণে (১৮৯২) বীরভূমের ভৌগলিক অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে ঘটনাস্থলের ঐতিহাসিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে বীরভূমের নদী অরণ্য ও পর্বত এমনভাবে মিশিয়াছিল যে সামান্য কয়েকটি নাম তুলিয়া অথবা বদলাইয়া বীরভূমকে বরেন্দ্রভূম করা সম্ভব হয় নাই। বরেন্দভূমিকে ছাপাইয়া বীরভূমিই ফুটিয়া উঠে।[১৪৪]

আনন্দমঠের সন্নাসী বিদ্রোহ এবং দেবী চৌধুরানীর দস্যুবৃত্তি দুটিও উত্তরবঙ্গে সংঘটিত হয়। দুটি ঘটনাই বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন হান্টারের Statistical Accounts of Bengal Ges The Annals of Rural Bengal থেকে। তবে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে তিনি আনন্দমঠের ঘটনাস্থলের পরিবর্তন করলেও দেবী চৌধুরানীর ক্ষেত্রে তা করেননি। 'আনন্দমঠ' এর সংস্করণ সম্পর্কে শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন- 'বঙ্গদর্শন' পত্রিয়ায় 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। সেইসময় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রমোশন হয়; তিনি অর্থ বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েন। যে কোন ভাবেই হউক উল্লিখিত উপন্যাসের কথা বড় সাহেবদের কানে যায় এবং তদানীন্তন ছোটলাট পত্রিকায় মুদ্রিত উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত কতি অনুমতি নাও দিতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্র এই আভাস পান। ছোট লাটের সঙ্গেঁ দেখা করিলে তিনি বলেন ব্রাহ্মনন্দ কেশবচন্দ সেন অনুমোদন করিলে তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশনে আপত্তি করিবেন না। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্র নানারুপ সংযোজন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন কতি থাকেন এবং এইভাবে পর পর পাঁটি সংস্করণ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় বাহির হয়। পরাধীণ দেশের লোক হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র উপরওয়ালাদের চোখে ধুলি দিতে পারিলেন। বন্দেমাতরম সঙ্গীত মুখে মুখে গীত হইত। এমন সময় আসিল যখন 'আনন্দমঠ' বাজেয়াপ্ত না হইলেও পূর্ববঙ্গেঁ বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়া বে-আইনী বলিয়া ঘোষনা করা হইল।[১৪৫]

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'রাজসিংহ' লেখার পর বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর পশ্চিম ভারতে মুঘল রাজপুত সংগ্রাম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে। রাজসিংহ উপন্যাসে তিনি মোহাল আক্রমণ থেকে রাজপুত রাজার দেশ রক্ষার উদ্দীপনাময় দেশপ্রেমের ছবি এঁকেছেন। এই সময়ই তাঁর বাংলাদেশের পটভূমিতে দেশপ্রেমের এমনি এক সংগ্রামের ছবি আঁকার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তবে তৎকালীন রাজসিংহের মত একক বীর ব্যক্তিত্ব বাংলায় না থাকায় তিনি মোগল রাজত্বের সময় বাংলায় যে বারো ভূঁইয়াদের উত্থান ঘটেছিল সেই বারো ভূঁইয়াদের একজন সীতারামকে নিয়ে তিনি একটি উপন্যাস রচনা করেছেন পরবর্তীতে। তিনি রাজসিংহের মত বীর এদেশে পাননি তবে প্রজা অভ্যুত্থানের কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন।

ইংরেজ কোম্পানীর পুরাতন ইতিহাস পড়তে গিয়ে তিনি দেখলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ছিয়াত্তরে মন্বতরের ইতিহাস যা এই জাতির জীবনে এনেছিল চরম দুর্ভোগ সেই সাথে যোগ হয়েছিল ইংরেজদের পীড়ন ও অত্যাচার এবং রাজনৈতিক বিশৃংখলা। এই রাজনৈতিক বিশৃংখলার সুযোগে এক শ্রেণীর নিরীহ সাধক সম্পদায় তাদের পার্থিব আকাঙ্খা মিটানোর জন্য এবং নিজদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ইংরেজদের ভাষায় যারা ডাকাত দল এবং লণ্ঠনকারী সন্নাসী। এদের মধ্যেই বঙ্কিম কল্পনা করলেন এমন এক উদ্যেঅগী দল যারা অরাজকতা

ও বিশৃংখলা দুর করতে চেয়েছিল। একটি বিষয় লক্ষনীয় যেসব সন্নাসীর কথা তিনি উপন্যাসে আলোচনা করেছেন তারা কখোনো মালদহর দক্ষিনে আসেনি। তাদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল রংপুর কোবিহার অঞ্চলে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যঅসে তাদের বিচরণক্ষেত্রকে সরিয়ে বীরভূমে এনেছে যেখানে আদৌ কোন দিন সন্নাসীর আক্রমন ঘটেনি। তবে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে বীরভুমে বর্গির হাঙ্গামা বঙ্কিম ঘটনার সময়সীমা উল্লেখ করেছেন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়। তবে ইতিহাসে দেখা যায় সন্নাসী ফকিরদের আর্বিভাব ঘটেছিল আরও পূর্বে। বাংলার নবাব মীর কাশিম উধুয়ানালাম এবং বকসারে যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রী:) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফকির সন্নাসীদের সাহায্য পেয়েছিলেন। তবে বীরভূমে এমন ঘটনা ঘটেনি তবে সেখানে ছিয়াত্তরের মন্বান্তরের পর দীর্ঘকাল ডাকাতর উপদ্রম ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বহু কালপর সেখানে সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। যা ছিল বীরভূমের বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা। কানু ও সিধু দুই যাঁওতাল ভাইয়ের নেতৃত্বে যে বিদ্রাহ ধুমায়িত হয়েছিল, সে ছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধেই অভ্যুত্থান এবং সম্ভবত আর একটি উপন্যঅসের বিষয় হবারই উপযুক্ত। কিন্তু বঙ্কিম প্রায় সমকালীন সদ্য অতীত কোন বিদ্রোহ কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লেখার কল্পনা করেননি বিশেষত ইংরেজ রাজত্বের পূর্ণ প্রতাপের কালে। তিনি এক কাল্পনিক কাহিনীর অবতারনা করলেন যার নির্মানে সাহায্য পেয়েছিলেন উত্তরবঙ্গে অনুষ্ঠিত সন্নাসী বিদ্রোহের।[১৪৬]

বীরভূমকে সন্নাসী বিদ্রোহের ঘটনাস্থল হিসাবে কল্পনা কেন করেছিলেন বা অীভপ্রায় কি ছিল তাঁর সমকালীন লেখা বা চিঠিপত্র থেকে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে বীরভূমের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে তাঁর ভাল ধারনা ছিল বলে মনে হয়। বীরভুম অঞ্চলে যাওয়ার কোন লিখিত প্রমাণ না থাকলেও তিনি মালদহে ১৮৭৪ সালে কিছুদিন ছিলেন। ১৮৮৩ সালের শেষ দিকে বর্ধমান ডিভিসন কমিশনারের পারসোনাল অ্যাসিষ্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করেছেন। বহরমপুর মুর্শিদাবাদে তিনি যে ছিলেন চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি রংপুর জলপাইগুড়িতে কখোনও না থাকলে দেবী চৌধুরানীর কাহিনী গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। তবে আনন্দমঠের আঞ্চলিক প্রকৃতি আরো স্পষ্ট। আনন্দমঠে আছে জঙ্গল, পর্বত দীঘি। বীরভূমের লালমাটির উল্লেখ না থাকলেও ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা যথাযথ বিশেষ করে অজয় নদ।

Thoughout almost the entire southeast delfa scattered area of the district the surface is broken by a succession of undulations, the general frend of which is from northwest to southest.... To the southeast there upland ridges and their ramifications, fadeout. The valleys becomes shallow and gradually merge into the broad alluvial plains of the Gangetic delfa.[১৪৭]

আনন্দমঠের সমগ্র কাহিনীই আবর্তিত হয়েছে নিবিড় অরণ্যের অন্ধকারে। বংলার অন্যান্য অঞ্চলেও অরন্য আছে; তবে অজয়ের ধারে যে অরণ্য ভূমি যা আনন্দমঠে বর্ণিত হয়েছে তা কল্পিত নয়, বাস্তব। The forests are usually distributed in scattered pateches in between the stretches of barren wastelands or fallow fields along the western fringes of the district. The are located in Nalhati, Rampurhat, Muhammad Bazar, Suri Rajnagar, Khayrasal, Dubrajpur, Hambaz and Bolpur Police Stations.[১৪৮]

এই সব মিলের কারণে বলা যেতে পারে, আনন্দমঠের ঘটনা যেখানে ঘটেছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনা করেছেন তা বীরভূমের দক্ষিণ দিকে বর্ধমানের প্রত্যন্ত অঞ্চল। এখানে অজয় নদ প্রবাহিত এবং অজয়ের তীরে পদ্মাবতী চরণচারণচক্রবর্তী জয়দেবের কেন্দুবিল্ব গ্রাম। কেঁদুলী মেলায় সন্ন্যাসী বাউলদের সমাবেশ হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। বৈরাগী বাউলদের প্রতি বৃহত্তর মেলা আর কোথাও নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যঅসে, লিখেছেন মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব গোস্বামীর মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগত হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে সংকল্প করিয়াছে।'[১৪৯]

পৌষ সংক্রান্তির বৈষ্ণমস সমাবেশকে বঙ্কিমচন্দ্র মাঘী পূর্ণিমার সমাবেশ হিসাবে রূপান্তরিত করেছেন। সেই সাথে কোঁলী মেলার বৈষ্ণব বাউলদেরই তিনি তাঁর উপন্যাসের সন্তান দলরূপে কল্পনা করে থাকবেন। যে বীবভূমকে তিনি 'আনন্দমঠে'র ঘটনাস্থল বলে উল্লেখ করেছেন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সেই বীরভূমের রানৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তা জানার প্রয়োজন আছে বৈকি। প্রথম খন্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন- ১১৭৬ সালে বাঙ্গাঁলা প্রদেশ ইংরেজদের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গাঁলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজানার টাকা আদায় করিয়া লন; কিন্তু তখনও বাঙ্গাঁলীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষনাবেক্ষনের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষনের ভার পাপিষ্ঠ নরাধশ বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীর জাপর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গাঁলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে। বাঙ্গাঁলী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।'[১৫০]

পঞ্চম সংস্করণের পূর্বের পাঠে বাঙ্গালা প্রদেশ, কথাটির জায়গায় বীরভূম প্রদেশ লেখা ছিল। তাঁর এ বর্ণনাটি পুরোপুরি ইতিহাস সম্মত ছিল না কারণ তখন মীরকাফর বাংলার নবাব ছিলেন না। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হওয়ার পর ২য় বার মীরজাফর ক্ষমতায় এসেছিলেন মাত্র এক বছরের জন্য।

১৭৬৫ সালে ক্লাইভ বাংলার দেওয়ানী লাভ করেন তখন বাংলার নবাব ছিলেন মীর জাফরের নাবালক পুত্র নাজমুদ্দৌলা। অন্যান্য বর্ণনা ছিল যথার্থ। রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল মহম্মদ রেজা খানের উপর। আদায়কৃত রাজস্ব থেকে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে হতো দিল্লীর বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমকে আর ৩২ লক্ষ টাকা যেত নবাবের শাসন ব্যয় নির্বাহের কাজে; বাকি টাকা ইংরেজদের মধ্যে ভাগাভাগি হতো। এই ব্যবস্থা দ্বৈত শাসন নামে অভিহিত ছিল এর প্রবর্তক ছিল লর্ড ক্লাইভ। এই বন্দোবস্ত ছিল মুর্শিদাবাদের নবারের সাথে।

যে বীরভূমকে কেন্দ্র করে তিনি সন্তান বিদ্রোহকে আবর্তিত করেছেন সেখানে বর্গীর আক্রমণের সময় (১৭৪২) থেকে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত আফগান জমিদার বংশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ছিলেন আসাদুল্লা খান। এরপর বিলাসপ্রিয় বদিউজ্জামান খান। তিনি রাজ্যের দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র আলি নকি খানকে। আলী নকি খান অকালে মারা গেলে রাজ্যের দায়িত্ব পান তাঁর আর এর ছেলে আসাদ জামান খান। এদের রাজধানি ছিল রাজনগরে। রাজনগর বর্তমান সিউড়ীর ১৫ মাইল পশ্চিমে আনন্দমঠের ঘটনাস্থলের উত্তরে।

'আনন্দমঠের প্রথম খন্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদের বর্জিত অংশে এই 'রাজনগর' এবং আলি নকি খানের কথা ছিল এবং র্ততীয় খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ছিল আসাদ জামানের কথা। সেখানে বলা হয়েছে আসাদ জামান খান বিপন্ন হয়েং ইংরেজদের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন সন্তান বিদ্রোহের সময় অর্থঅৎ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় আসাদ জামান খান ইংরেজদের মুখাপেক্ষী হলেও প্রথমদিকে তিনি এমন ছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে থাকতে চেয়ে ইংরেজ ও মুরশিদাবাদের নবারের বিরুদ্ধে কিছু ফরাসী পলাতক সৈন্যদের আশ্রং দিয়েছিলেন। শাহ্ আরম এবং মীরজাফরের পুত্র মীরনের সাহায্যে ইংরেজ সৈন্য আসাদ জামান খানকে পর্যুদস্ত করেন। তখন থেকেই বীরভূমের রাজা দুর্বল ও পরাশ্রিত হয়ে পড়েন। ১৭৬৫ সালের পর হতে মুর্শিদাবাদের নবাবাই বীরভুম শাসন করতেন। ১৭৮৫ সালে অর্থাৎ মন্বন্তরের প্রায় ১৫ বৎসর পর মুর্শিদাবাদের কালেকটর বীরভূম প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের বিশৃংখলার জন্য কোম্পানীর কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠান।[১৫১]

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন। বঙ্গিম তাঁর প্রশস্তি গেয়েছেন। হেস্টিংস সন্নাসী বিদ্রোহের যে সংবাদ দিয়েছেন তাঁর চিঠিতে, সেটির ঐতিহাসিক সত্য এই এয তা ঘটেছিল উত্তরবঙ্গে রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলে। সেখানেই ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস একটা নালা দখল করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম সেই ঘটনাটিকে টমাস ধিন হিসাবে বসিয়েছেন বীরভুমে সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে।

বীরভুমে বিরাজমান রাজনৈতিক বিশৃংখলা এবং আসাদ জামানের মত স্বাতন্ত্র্যাভিলাসী স্বাধীন রাজার রাজত্বকে তিনি সন্তান বিদ্রোহ দেখানোর উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেছেন। যদিও সে দেশের দুরাবস্থার ও বিশৃংখলার নেপথ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দায়ী ছিলেন। কিন্তু সে সময়ের বীরভুমবাসীর নিকট প্রত্যক্ষরূপে দায়ী ছিলেন বীরভূমের রাজা। প্রজারা বুঝতে সক্ষম ছিলেন না যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটতে ছলছে এবং এর জন্য নেপথ্যে থেকে ইংরেজ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী নেপথ্যে থেকে জাল বিস্তার করছে তার ফলে দেশে যে বিশৃংখলা, অবিচার পীড়ন অর্থ কষ্ট ও দুঃখ দেখা দিয়েছে তার জন্য দায়ী তাদের দুর্বল ও অকর্মন্য রাজা আসাদ জামান খান বা জমা খান। এর ফলে তাদের অসন্তোষ জমে উঠেছিল বীরভুমের রাজার বিরুদ্ধে। এভাবেই তারা দেশের জনগণকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল এবং এখানেই ইংরেজদের কূটনৈতিক সাফল্য। এই কূটনীতি দিয়েই তারা প্রথমে বাংলা এবং পরিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেছিল। আসাদুজামান খান এক সময় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করতে চেয়েছেন কিন্তু ইংরেজ ও মুরশিদাবাদের নবাবের বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের পুত্র নাজমুদ্দৌলার কারণে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হন। বঙ্কিম তাঁর প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ থেকেই হয়ত ইতিহাস কুখ্যাত মীরজাফরকে অনৈতিহাসিকভাবে আন্নদমঠে উপস্থাপন করেছেন। মীরজাফর তখন না থাকলেও তার কুকীর্তির দুর্ভোগ করছিল বাঙ্গালীরা। ঘটনার একশত বছর পর বঙ্কিম যখন উপন্যাস লিখছেন তখন তিনি ইতিহাসের দ্বৈত শাসনের কুফল ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন। উপন্যঅসে সে বিষয়ে জোরালো ভাষ্যতে মন্তব্য করেছেন।

তাঁর লিখিত প্রবন্ধ বঙ্গঁদেশের কৃষক প্রবন্ধেও ইংরেজদের দুরভিসন্ধি প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন 'জমিদার চিরকজালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরেজরা প্রথমে সেই দস্যুবৃত্তিকে আইন সঙ্গত করিলেন। এই দস্যুবৃত্তি আইন সঙ্গত। তবে তিনি বীরভূমের রাজা সম্পর্কে যতটা কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, ইংরেজদের সম্পর্কে তা করেননি। উপন্যাসে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পর্কে তৃতীয় খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন। 'এই সময়ে প্রথিতনামা, ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাত:সূর্য ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনলেল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার

শিকল গড়িয়া তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই শিকলে আমি সন্ধীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব। একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহে বলিয়াছিলেন তথাস্ত। কিন্তু সে দিন এখন দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষন হরিধ্বনিতে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রকম্পিত হইলেন'। অষ্টাদশ শতাব্দিতে এই ছিল ইংরেজদের অভিসন্ধি। কেন্দুলী মেলার বৈষ্ণব বাউলদের নিয়েই হোক অথবা উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী ফকিরদের নিয়েই হোক ঔপন্যাসিক দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জাগ্রত এক সংঘবদ্ধ শক্তির কল্পনা করেছেন দেশাত্মবোধের প্রেরণা হতে। তবে একথা ঠিক যে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর মত দেশাত্মবোধ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিল না। তাইতো সন্তানদের বিদ্রোহ আধুনিক দেশাত্ববোধের রূপ নেয়নি। জাগরনের সঙ্গী হিসাবে মুসলমান সমাজকেও সঙ্গে নিতে পারেনি। হয়ত তাদের মধ্যেও দেশাত্ববোধ না থাকার কারণে। তবে তাদের স্বজাতি রাজার প্রতি ছিল স্বাভাবিক একাত্মতাবোধ। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্তান বিদ্রোহ রূপ নিয়ে হতভাগ্য মুসলমান রাজা ও অবস্থাগতিতে মুসলমান প্রজার বিরুদ্ধে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি লেখার সময় বঙ্কিমচন্দ্র কোম্পানীর রেকর্ড ভালো করেই পড়েছিলেন এবং সেখানে সন্নাসী ফকিরদের ডাকাত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমের কেনইবা মনে হলো যে এদের কার্যকলাপকে মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত আচরণ হিসাবে উপন্যাসে চিত্রিত করা যেতে পারে? তবে কি তিনি ইংরেজদের এই বর্ণনাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেননি?

'যদুনাথ' সরকার ও এই সন্নাসীদের বলেছেন দস্যু লণ্ঠনকারী। এরা ধর্মে বৈষ্ণব ছিল না ছিল শৈব। এরা বংলার বাইরে থেকে প্রতি বৎসর দলে দলে আসত, লুটপাট করত, কখনও বালক অপহরণ করে দল ভারী করত যদুনাথ তাদের নেতা রাজেন্দগিরি গোঁসাই এবং তার শিষ্য হিম্মৎ বাহাদুরের কাথও বলেছেন। ফারসি গ্রন্থে এদের বিবরণ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে সন্তান দলের যে কল্পনা করেছেন তার অঙ্কুর এসেছিল বীরভূমের বৈষ্ণমদের থেকে কিন্তু তাতে জরসেক করেছে এই সন্নাসীদের কীর্তিকলাম, নৈতিকবুদ্ধিতে যার সমর্থন হয়তো চলেনা, কিন্তু কোথায় যেন এর একটা উপযোগিত তিনি অনুভব করেছিলেন। এই সন্ন্যাসীদের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অনেক আগে থেকেই। অন্ততপক্ষে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে থেকে এদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। ১৭৬৪তে মীরকাশিমের পক্ষে এরা বকসারে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। সিয়র-উল-মুতাখরীনেও এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে হিম্মৎগিরির উল্লেখ আছে। এই সৈন্যরা গুরু হিম্মৎগিরির মেতাই থাকত অর্ধনগ্ন। ১৭২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরের বছরই হেস্টিংস কোলব্রুককে একটি চিঠিতে জানান এদের উপদ্রবের কথা। সেই চিঠির কিছু অংশের উদ্ধৃতি-

You will hear of great disturbances committed by the Sanngusies, or wandering Fakeers who annually infest the province about this time of the year in piegrimages to Jaggernaut,

going in bodies of 1000 and sometimes even 1000 men. An officer of reputation (Captain Thomas) lost his life in an unequal attack upon a party of these banditee about 3000 of them, near Rangpore with a small party of perguna 'Sepoys' which has made them mre talked of than they deserve.

হেস্টিংস এই চিঠি লিখেছিলেন ২রা ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ১৭৭৩ অর্থাৎ মাঘ মাসে। ইংরেজদের সঙ্গে সন্তান-সৈন্যের সংঘর্ষ ও মাঘ মাসে।[১৫২]

ঊনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র সন্নাসী ফকিরদের এই বিদ্রোহকে কোম্পানীর রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রজা-অভ্যুত্থান বলে মনে করেন। তবে অসিতনাথ চন্দ্র এযব 'Sannagasi Rebellion' বইতে এই বিদ্রোহকে প্রজা-অসন্তোষজাত বলে অভিহিত করেছেন। আবার এইটিও সত্য যে, খাদ্যের প্রাদুর্ভাব স্বাধীনভাবে চলার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল এবং ওই বিশৃংখলার সময় ব্যবসায়ী; ও ডাকাতরাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তবে সে সময়ে কোন পরিকল্পনা বা লক্ষ্য স্থির না থাকায় ফলে শক্তি ও সংঘবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সন্নাসী ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কারণ তারা উপদ্রব অত্যাচার, লণ্ঠনে তাদের শক্তি ব্যয় করেন। আনন্দমঠের সন্তানরাও দেশমাতৃকার ভাবনায় উদ্বৃদ্ধ হলেও লক্ষ স্থির করতে পারেনি। এই জন্যই মহাপুরুষ সত্যানন্দকে জ্ঞানের সাধনার কথা বলেছিলেন। তবে দেশ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ এই সন্নাসী দলের সংঘর্ষ ও বাহুবল বঙ্কিমকে আকৃষ্ট করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

তবে একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় তিনি উদ্যম, ঐক্য সাহস কি শুধু সন্ন্যঅসীদের মধ্যেই দেখেছিলেন, একই সময় সংঘটিত ফকির বিদ্রোহের ফকিরদের মধ্যে দেখেননি? উপন্যাসে ফকিরদের বাদ দেওয়ার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে আনন্দমঠকে তিনি যেভাবে সাজিয়েছেন যেমন দেবদেবীর প্রতিমা আবার বীরভূমের মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজার বিদ্রোহ কল্পনাও করাও কঠিন ব্যাপার। তবে কি তিনি হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। মুসলমানদের বাদ দিয়ে হিন্দু বিদ্রোহীদের সাহায্যে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে সে হবে হিন্দু রাজ্য। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন 'হিন্দু জাতিকে স্বাধীন দেখিবার আকাঙ্খা বঙ্কিমের মনে কখনও নির্বাপিত হয় নাই; যদিচ পরিনত বুদ্ধি সহায়তায় তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, বর্তমান অবস্থায় এই স্বাধীনতা হিন্দুর লক্ষ নয়।[১৫৩] অবশ্য সন্তানদের কারো কারো মাঝে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার অবাস্তব স্বপ্ন ও দেখা গেছে। এবং

এই অর্থহীন উৎসাহে তারা মুসলমান পীড়ন করেছেন। আবার বীরভূমের রাজাকে তাদের অবস্তানের জন্য দায়ী করে নানা কটুক্তি ও করেছেন।

পরপীড়ন ও লুণ্ঠনের প্রণোদিত হয়ে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যে ভূল তা বঙ্কিমচন্দ্র ও উপলব্দি করেছেন, তাইতো চিকিৎসক বলেছিলেন, - 'তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়অ বণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিব না।'[১৫৪]

আসলে যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকার নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন, তিনি তাতে স্থীর থাকেননি। মাঝ পথে তিনি লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছেন এবং সন্তানদের ও লক্ষভ্রষ্ট করেছেন। শত্রু ইংরেজদের বানিয়েছে মিত্র ও ত্রানকর্তঅ। এক্ষেত্রে অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে।

"সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই- শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোক শিক্ষায় পটু নহি। অতএব বিভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপন্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুপটু। সতরাং ইংরেজকে রাজা কবির। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অঅন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইডবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয় তত দিন না হিন্দু আবার জ্হানবা, গুনবান, আর বলবান হয়, তত দিনি ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।"[১৫৫]

'মুঘলকে বিতাড়িত করে ইংরেজকে রাজাসনে বসিয়ে তার দাসত্ববরণকে যিনি হিন্দুর পক্ষে শ্রেয় বলে প্রচার করলেন, তিনিই হলেন বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘেঅষ প্রমুখ সব শিক্ষিত হিন্দুর স্বাধীনতার মন্ত্রের উদগাতারূপে মহান আধুনকি ঋষি। কিমাশ্চর্য অত:পরম। এ-ও বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি রাখার প্রয়াস প্রসূন কি না জানি না।'[১৫৬]

†'ex †PŠaivYx

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ সালের আগষ্ট মাসে যাজপুরে (কটক) বদলি হয়ে যান। সেখানেই তিনি 'দেবী চৌধুরাণী' লেখা শুরু করেন। সঞ্জীব চন্দ্র সম্পদিত বঙ্গঁদর্শনের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী প্রকাশিত হতে থাকে। চৈত্র ১২৮৯ সংখ্যা প্রকাশের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। তখন

'দেবী চৌধুরাণী' মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত অবস্থায় এর ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি এই বইট তিনি তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন "যাহার কাছে প্রথম নিস্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিস্কাম ধর্ম্মই ব্রত করিয়অছিলেন, যিনি এখন পূণ্যফলে স্বর্গরুঢ় তাঁহার পবিত্র পাদাপদ্মে এই গ্রন্থ ভক্তিবারে উৎসর্গ করিলঅম।"[১৫৭]

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসিট ইতিহাসের পটভূমিতে জাহতীয়তাবাদ ও ব্যক্তিগত নৈতিকতার স্বমন্বয়ে রচিত। আনন্দমঠেরমত এটির বিষয়বস্তুও অষ্টাদশ শতকে বাংলার রাজনৈতি প্রেক্ষাপট। বঙ্কিমচন্দ্র ঔই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার উপর লিখিত হান্টারের Statistical Account of Bengal ও স্টুয়ার্টের 'History of Bengal' প্রভৃতি গ্রন্থও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনেক অপ্রকাশিত রিপোর্ট ও তথ্যাদি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানে কোম্পানির নথিতে দস্যু দেবধী চৌধুরাণীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। আবার উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার প্রচলিত লোক কাহিনীতেও দেবী চৌধুরাণী উল্লেখ আছে। তখনকার রাজ কর্মচারী ও ঐতিহাসিকরা দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠকে কিভাবে দেখতেন তা হান্টার উল্লেখ করেছেন :

In 18 1787 lieutenant Brenan was employed in the quarter against a notorious leader of dacoits (gang robbers) named Bhawani Pathak. He despathched a native officer with twenty four sepoys in search of the reobbers, who surprised pathak with sixty of his flowers in their boats. A fight took place, in which Pathak him-self and three of his Lieutenants were killed and eight wounded besides forty two taken prisoners Pathak was a native Bajpur.

We catch a glimpse from the Lieutenant's report of a female dacoit by name Debi Choudhurani, also in League with Pathak. She lived in boats, head a large force of barkandajs in her pay and committed dacoites on her own account, besides receiving a large share of her boaty obtained by Pathak. Her title Debi Choudhurani would imply that she was a Zemindar – probably a petty one else should not have lived in boats for fear of capture.[১৫৮]

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীকে দেখিয়েছেন নিপীড়িত ও নির্যাতিতদের রক্ষক হিসাবে যিনি সেই সময়ের কোম্পানীর দেওয়ান অত্যাচারী দেবী সিং এর প্রজাশোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলেন। এটি নিছকই লেখকের কল্পনা ছিলনা। তৎকালে উত্তর বঙ্গে দেবী চৌধুরাণীর গুণের কথা জনগণের মুখে-মুখে প্রচলিত ছিল। সেই সময়ের সামাজিক অবস্থা ও বাস্তব পরিবেশ চিত্র তুলে ধরেছেন প্রফুল্লের দরিদ্র সংসারের বর্ণনা সেকালের জমিদার বাড়ীর অন্দরমহলের নিত্যদিনের চিত্র, তাদের প্রতাম প্রতিপত্তি, উক্ত অঞ্চলের অরণ্য-নদীর বর্ণনা- এ সবকিছুই ছবির মত। তবে এসব কিছুর সাথে তিনি যোগ করেছেন দেবী চৌধুরাণীর নিস্কাম ধর্মের প্রতিমূর্তী। বাস্তবচিত্রের সাথে নিস্কাম কর্মের তত্ত্ব মিলিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার উল্লেখ করেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্র পত্যক্ষ বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করিয়া বাস্তব কাহিনী রচনা করিতেছিলেন, কিন্তু এই কাহিনীর নায়িকার চরিত্রের মাধ্যমে অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করার সংকল্প অনুসারে তিনি এই কাহিনীর মধ্যে ব্যক্তিগত সাধন প্রকরণ এমনভাবে সংগ্রথিত করিয়া দিয়াছেন যে, এই উপাদান দুইটির মধ্যে অর্থাৎ কাহিনী ও সাধন-প্রকরণের মধ্যে কোনরূপ রাসায়নিক মিশ্রণ সংঘটিত হয় নাই। নিছক বাহ্যপ্রলেপের মত একে অন্যের পাশাপাশি মিশিয়া রহিয়াছে মাত্র। প্রফুল্লর ব্রহ্মচর্য, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদিতে উপন্যাসের কাহিনী বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয় নাই; আবার কাহিনীও প্রফুল্লের শিক্ষা পর্বের প্রতি চক্ষু বুজিয়াই ছিল। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এক্ষেত্রে শিল্পি এমন দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন যাহা তাঁর সৃজনীক্রিয়াকে কোনভাবেই বিকশিত করে নাই। সেই শিক্ষা ছাড়াও দেবীর পক্ষে দস্যুদলের নেতৃত্ব করা অসম্ভব হইত না। দেবীর শিক্ষা পর্ব যেন প্রেক্ষাগৃহের বিশ্রাম অবকাশের মত মূল কাহিনীর সাথে সম্পর্কহীন।[১৫৯]

তথ্যনির্দেশ

১. ভবতোষ দত্ত, ‘e¼gP‡›‘i Dcb¨vm, ১৯৯৫, সাহিত্যালোক, কলিকাতা, পৃ. ৩১

২. e¼gP‡›‘i Dcb¨vm, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২

৩. দিলওয়ার হোসেন, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, ১৯৮৪, বা!লা একাডেমী, ঢাকা পৃ: ১৪৪

৪. e¼gP‡›‘i BwZnvm, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩০

৫. শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, e¼gP›‘, পৃ: ৪৪

৬. সুকুমার সেন, evsjv mvwn‡Z¨ M‘¨, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৭৭, পৃ: ৮২

৭. সুকুমার সেন, evsjv mvwn‡Z¨i BwZnvm, ২য় খন্ড ৩য় সংস্করণ, ১৩৬২, পৃ: ১৭০-১৭১

৮. Jogesh Chandra Bagla, *Bankim Rachanavali,* Edited Sahitya Samsal, 1969, Calcutta-9 P. 9 (92)

৯. যোগেশচন্দ্র বাগল, e¼g iPbvejx, ১ম খন্ড ৫ম সংস্করণ, ১৩৭৬, পৃ: ৪১

১০. e¼giPbvejx, ২য় খন্ড বাঙ্গালার ইতিহাস, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭৬, পৃ: ৩৩০

১১. e¼giPbvejx, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩৬-৩৩৭

১২. বঙ্কিমরচনা সমগ্রহ, পৃ: ৫

১৩. প্রভাভাংশু মাইতি, fviZ BwZnvm cwiµgv, পৃ: ১৮১

১৪. কে আলী, evsjv‡‘‡ki BwZnvm, পৃ: ৩৪৬

১৫. fviZ BwZnvm cwiµgv, পূর্বোক্ত, পৃ:১৮১

১৬. যদুনাথ সরকার, ‘‡Mkb»‘bxi fwgKv

১৭. আব্দুল করিম, evifBqv cwiwPZ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১ মার্চ ১৯৯২

১৮. evifBqv cwiwPZ, পূর্বোক্ত, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১ মার্চ ১৯৯২

১৯. ‘‡Mkb»‘bxi fwgKv, পূর্বোক্ত, ১৯৩৮ প্রকাশিত ২য় সংস্কার, পৃ: ৩৫৬

২০. ‘‡Mkb»‘bxi fwgKv, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৫৬

২১. Edward Gibbon, *Dectine and Fall of the Roman Empire,* Bury’s ed. vi, p. 230 (দে: ১৬৭) উদ্ধৃত দুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকা

২২. Wraxall, *History of my own times,* উদ্ধৃত সরকার (দে: ১৬৮)

২৩. Alexander Dow, (the History of Hindostan Vol.-1)

২৪. দুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকা, পূর্বোক্ত

২৫. আকবরনামা, (৩য় খন্ড) মূলের পৃ: ৫৮০ বেভারিজ কর্তৃক অনুবাদের পৃ: ৮৮৯ উদ্ধৃত- যদুনাথ সরকার

২৬. দর্গেশনন্দিনীর ভূমিকা, পূর্বোক্ত

২৭. Professor Macmillan's, Magazine, Vol. xxvc, P.-455- উদ্ধুত শশীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী- পৃ: ৩৩৬-৩৩৭

২৮. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, evsjv mwn‡Z¨i m¤úY BwZeË, ৩য় সংস্করণ ১৩৭৮ পৃ: ৫৩৭-৫৪২

২৯. আনিসুজ্জামান, '‡Mkbw›'bx, (প্রবন্ধ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী ১৯৭৬, পৃ: ১৮-১৯

৩০. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ew¼g cm½, পৃ: ৭৩-৭৮ উদ্ধৃত, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড) সাহিত্য সংসদ ১৩৭৬

৩১. সুধাবসু, তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী-অনুবাদ, পৃ: ১৫

৩২. আহমেদ শরিফ, ew¼g exÿv Ab¨ wbwi‡L, পৃ: ১৯

৩৩. ew¼gexÿ Ab¨ wbwi‡L, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮

৩৪. ew¼gexÿ Ab¨ wbwi‡L, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭-১৮

৩৫. ew¼gexÿ Ab¨ wbwi‡L, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮

৩৬. ew¼gexÿv, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮

৩৭. ew¼g iPbv mgM, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৮

৩৮. ew¼g iPbvmgM, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৮-৮৯

৩৯. ZRK-B-Rvnv½xix, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৯-৭০

৪০. ew¼g iPbvmgM, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯২-৯৩

৪১. মোহিতলাল মজুমদার, ew¼g eiY, পৃ: ৬৫

৪২. ew¼g iPbv mgM, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৩-৯৪

৪৩. De Late, *India of Jahangir,* c,,: 182, `ªóe¨ Advance History

৪৪. ৬০ শ্রেণী প্রসাদ, *History of Jahangir* (আলীম), পৃ: ১৭৪, ১৭৮-১৮৩

৪৫. Charles Stewart, *History of Bengal,* 1st edition 1813

৪৬. *History of Bengal,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

৪৭. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, ev½v‡jvi BwZnvm, (প্রথম ভাগ), ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃ: ১৩২১

৪৮. ew¼g eiY, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৬-৬৭

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, mwnZ¨ HwZnwmK Dcb¨vm, পৃ: ৬৬ (মোহিতলাল)

৫০. ew¼g eiY, পূর্বোক্ত, পৃ:

৫১. ew¼g iPbvejx, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৪

৫২. Jadunath Sarker, *The History of Bengal,* Vo. 4, P-6

৫৩. শ্রী প্রথমনাথ বিশী, বঙ্কিম

৫৪. (Jurnal of Numismatci Society of India Vol. xxxv, 19073, pp 197-201 plate xv No.1) উদ্ধৃতি সুখময়-১১

৫৫. বঙ্গদর্শন- ১৮৮০, অগ্রহায়ণ, উদ্ধৃতি- শ্রী প্রথমনাথ বীশি- বঙ্কিমসরনী

৫৬. ৫০ নীহারঞ্জন রায়- বাঙ্গালীর ইতিহাস (রইস)

৫৭. বঙ্গদর্শন- ১৮৮৪ শ্রাবণ

৫৮. শ্রী প্রথমনাথ বিশী- পূর্বোক্ত পৃ: ৪২

৫৯. পূর্বোক্ত .....পৃ: ৪৩-৪৪

৬০. বঙ্কিম রচনা সমগ্র..... পৃ: ১৪৬

৬১. ভবতোষ দত্ত- বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস..... পৃ: ১০২

৬২. কে. আলী- বাংলাদেশের ইতিহাস,..... পৃ: ৫২৩

৬৩. গোলাম হোসেন সলীম রিয়াজ- উসসালাতিন অনুবাদ- (শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত) পৃ: ২৩৩

৬৪. বঙ্কিম চন্দ্র- পৃ: ৩৩৮

৬৫. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার- বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, প্রকাশক- শ্রী সুবজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১১৯ লেনিন সরণী,কলকাতা-৭০০০১৩ পৃ: ১৯৭

৬৬. বঙ্কিম রচনাসমগ্র- .....পৃ: ১৮২-২৮৩

৬৭. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ..... পৃ: ১৮২

৬৮. সৈয়দ গোলাম হোসেন খান- সিয়ার-উল-মতাখখিরিন- বাংলা অনুবাদ মূল পারসী থেকে আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া- পৃ: ৬৭০

৬৯. সৈয়দ গোলাম হোসেন খান- পূর্বোক্ত ..... পৃঃ ৬৭২

৭০. ডঃ রমেশচন্দ্র ..... পৃঃ ১৮৭

৭১. Seir Mutaquorin. Vol. 11, PP.- 432-433 বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ভবতোষ, পৃঃ ১০৪

৭২. বঙ্কিমচন্দ্র ..... পৃঃ ২৮৫

৭৩. সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবাযি- সিয়ার-উল-মুতাখখিলিন ..... পৃঃ ৬৭৯

৭৪. ডঃ রমেশচন্দ্র... পৃঃ ১৯৯

৭৫. বিস্তারিত জানার জন্য ১) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস ২য় খন্ড, ২) ..... ৩) কে. আলী..... ৪.....

৭৬. ডঃ রমেশচন্দ্র- পুঃ ২০১, ২০২

৭৭. বঙ্কিমচন্দের উপন্যাস, ভবতোষ দত্ত..... পৃঃ ১০৯

৭৮. বঙ্কিমচন্দ- পৃঃ ৩১৪-৩১৫

৭৯. শ্রী প্রমথনাথ বিশী- বঙ্কিম সরণী পৃঃ ৮৫

৮০. বঙ্কিম রচনা সমগ্র- পৃঃ ৫৩২

৮১. মোগল সমাজ ও রাজনীতে নারী- শাহরিয়ার ইকবাল- পৃঃ প্রারম্ভিক পরিচয়ে- ২০.২১

৮২. উইমেন ইন মোগল ইন্ডিয়া- রেখা মিশ্র. পৃঃ ৫০

৮৩. মোঘল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী- শাহরিয়ার ইকবাল

৮৪. বঙ্কিমরচনা সমগ্র- পৃঃ ৪৫৬

৮৫. N. Manucei- Storio do Mogor- Vol. 11, P.52

৮৬. Sir S Judunath Sarkar- Short history of Aurangzib.... P.15

৮৭. Sir S Judunath Sarkar- Short history of Aurangzib.... P.16

৮৮. (মুনীর চৌধুরী রচনাবলী) তুলনামূলক সমালোচনা পৃঃ ২১৭

৮৯. রচনাসমগ্র- পৃঃ ৪৫৬

৯০. মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী শাহরিয়ার ইকবাল পৃঃ ৮০-৮৯

৯১. শাহরিয়ার ইকবাল- প্রাগুক্ত- পৃঃ

৯২. যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্কিমরচনাবলী উপন্যাস প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ, ১৩৭৬, পৃঃ ৪০-৪১

৯৩. James Tod (Lieutenant Colonel)- Annals and Antiquities of Rajasthan or the central and western Rajpoot States of India. Vol-1, Rev. Edn Calcutta C.S.K. Lahari and Co. SA College Street 1894. PP. 351-352

৯৪. Ibid, P:- 252

৯৫. দিলওয়ার হোসেন পূবোক্ত- পৃঃ ২১১

৯৬. কালিকারঞ্জন কাননুগো 'রাজস্থান কাহিনী' ৩য় সংস্করণ ১৩৮৪, পৃঃ ৭৪

৯৭. যদুনাথ সরকার, ভূমিকা পৃঃ ৯ (ব্রজেন্দনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পদিত রাজসিংহ- ১৩৫৯, কলিকাতা

৯৮. অঘোরনাথ বরোটে- রাজস্থান ১২৮৯, পৃঃ ৩৭৫

৯৯. যদুনাথ সরকার- রাজসিংহের ভূমিকা পৃঃ ১০

১০০. বঙ্কিমচন্দ্র- রাজসিংহ উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন দ্রঃ

১০১. Robert Orme (F.A.S) – Historical Fragment of the Mongul Empire of the morattoes, and of the English concern indostan from the year M.DC. LIX, London: printed for F. Wingrave, in the strand successor to Mr. Nourse M. DCCC,V (1805) P-74

১০২. Ibid, Pp. 75-76

১০৩. Ibid, P. 85

১০৪. রাজসিংহ ৮ম খন্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- পৃঃ ৫১৫-৫১৬

১০৫. দিলওয়ার হোসেন- পৃঃ ২১৮

১০৬. যদুনাথ সরকার, রাজসিংহের ভূমিকা ব.শ.বা.স-১৩৫৯

১০৭. James Tod- Annals and Antiquities of Rajasthan or the central and western Rajput states, crooke, W Ed O.V.P 1920 Vol.-1, P-440

১০৮. মুনীর চৌধুরী- তুলনামূলক সমালোচনা- পৃঃ ২৯-৩০

১০৯. S. Lane Poole- Aurangzib (And the Deacay of the Mughal Empire) 1893, P.-201

১১০. Sir, Jadunath Sarker- A short History of Auranazib P.13-14

১১১. 'রাজসিংহ' ১ম খন্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- পৃঃ ৪৫১

১১২. Sir Jadunath Sarker- A short history of Aurangzib, P.2-3

১১৩. কালিকারঞ্জন কানুন গো এম. এ প্রবাসী বৈশাখ,১৩৩৯, পৃ: ৮৭-৮৮ (আলমগীর (শেখ হাবিবর রহমান)

১১৪. ১৩২৮ সালের মাঘ মাসের প্রবাসী প্রসঙ্গ সম্পাদকীয় বিবিধ আলমগীর- পৃ:৩৪৩

১১৫. J.N. Sarkar Anecdotes of Aurangzib

১১৬. J..N Sarkar- Mughal Administration

১১৭. Judunat Sarkar- A short Histo of Aurangzib, P.7-8

১১৮. Jadunat Sarkar- AMughal Administration

১১৯. পূর্বোক্ত

১২০. পূর্বোক্ত

১২১. শেখ হাবিবর রহমান, আলমগীর .....পৃ: ২৪৯

১২২. ভারতে মুসলমান সভ্যতা- অষ্টম অধ্যায় (হাবিবর ২৪৯)

১২৩. Dr. Sadque- A Vindication of Auranzib , Page-130

১২৪. Jadunat Sarkar- Mughal Administration

১২৫. খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ, ভারতের ইতিহাস M.A.IE.S

১২৬. Islamic Review (April-May 1925- Page-125)

১২৭. শেখ হাবিবর রহমান পূর্বোক্ত- পৃ: ১৭৪-১৭৬

১২৮. রাজসিংহ- ৫ম খন্ড- ৬ষ্ঠ পরি:

১২৯. শ্রী শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- বঙ্কিম জীবনী, ৩য় সং ১৩৩৮- পৃ: ৪৪৩

১৩০. প্রভাতকুমার মখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, কলিকাতা ১৯২৫, পৃ: ৩১

১৩১. মুনীর চৌধুরী, তুলনামূলক সমালোচনা- পৃ: ২১৫

১৩২. শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত- বঙ্কিমচন্দ্র- পৃ: ৯৭-৯৮

১৩৩. মুনীর চৌধুরী- পূর্বোক্ত - পৃ: ২১৯

১৩৪. মুনীর চৌধুরী- পূর্বোক্ত- পৃ: ২১৬

১৩৫. দিলওয়ার হোসেন পূর্বোক্ত - পৃ: ২৩১

১৩৬. শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত - পূর্বোক্ত-পৃ: ৯৬

১৩৭. মুনীর চৌধুরী- পূর্বোক্ত- পৃ: ২১৯, রমেশ চন্দ্র মজুমদার:

১৩৮. Advanced History of India 3rd ed. 1967, P-570

১৩৯. কে.এম.রাইছউদ্দিন খান- বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা

১৪০. রাইছউদ্দিন- পূর্বোক্ত- পৃ: ৫৪২-৫৪৪

১৪১. রাইছউদ্দিন- পূর্বোক্ত- পৃ: ৫৫৮-৫৫৯

১৪২. ভবতোষ দত্ত- বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস- পৃ: ৫৭

১৪৩. আনন্দমঠ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং) ভূমিকা

১৪৪. দেবী (চৌধুরাণী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং) ভূমিকা

১৪৫. শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত- বঙ্কিমচন্দ্র- পৃ: ১০৮

১৪৬. ভবতোষ দত্ত- পূর্বোক্ত - পৃ: ৬০

১৪৭. West Bengal District Gazetter Birbhum. 1925. P-8

১৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৪

১৪৯. বঙ্কিমচন্দ্র- 'আনন্দমঠ'- পৃ:

১৫০. বঙ্কিমচন্দ্র- 'আনন্দমঠ'- পৃ: ৫৩৮

১৫১. গৌরীহর মিত্র বীরভূমের ইতিহাস'- পৃথম খন্ড ১৯৪৩, দ্বিতয়ি খন্ড ১৯৪৫।

১৫২. ভবতোষ দত্ত- পূর্বোক্ত- পৃ: ৬৭-৬৮

১৫৩. ভবতোষ দত্ত- পূর্বোক্ত- পৃ: ৭১-৭২

১৫৪. বঙ্কিমচন্দ্র- আনন্দমঠ- পৃ: ৫৯১

১৫৫. বঙ্কিমচন্দ্র- আনন্দমঠ- পৃ: ৫৯১

১৫৬. আহমদ শরীফ, বঙ্কিমবীক্ষা অন্য নিরিখে পৃ: ৮৬-৮৭

১৫৭. বঙ্কিমরচনাবলী, প্রফুল্লকুমার

১৫৮. Hunter- Statistical Accountant of Bengal Vo.-VII

১৫৯. অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম-মানস- পৃ: ৮৩-৮৪

cÂg Aa¨vq

gxi gkviid †nv‡m‡bi BwZnvm‡PZbv

'বিষাদ-সিন্ধু' মীর মশাররফ হোসেনের কালজয়ী সৃষ্টিকর্ম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শতবর্ষের অধিককাল যাবৎ বাঙালী পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে কয়টি উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু' তার মধ্যে অন্যতম। 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। 'মহরম পর্ব' ১৮৮৫ সালে, 'উদ্ধার পর্ব' ১৮৮৭ ও 'এজিদ বদ পর্ব' ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। তবে সমগ্র পর্ব একত্রিত করে অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে।[১] শতবর্ষ পূর্বে লিখিত এই উপন্যাসটি সাহিত্য সমালোচকবৃন্দেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তাঁরা কখনো বিষাদ-সিন্ধুর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এর সৃষ্টিশীল রচনার জন্য, আবার কঠোর সমালোচনাও করেছেন এর ঐতিহাসিক সত্যের অবমাননার জন্য। ইতিহাসের ঘটনাংশ ও কাঠামোকে ব্যবহার করে তিনি রচনা করেছেন এই ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাসটি। এতে তিনি কতটুকু ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করেছেন তা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়। তবে এর পূর্বে মীর মানসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যক মনে করছি।

১৮৪৭ সালে মীর মশাররফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, বাঙালী মুসলিম সমাজ যখন ছিল কুসংস্কার ও অশিক্ষায় গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তৎকালীন মুসলিম সমাজের গ্লানিময় জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন তার লেখায় "৬০ বৎসর পূর্বে বঙ্গে মুসলমানের কিরূপ শোচনীয় দশা ছিল, তাহা ভাবিলে অঙ্গ শিহরিয়া ওঠে। আমি সেই দুর্ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি..... ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠে অনিচ্ছা। জাতীয় বিদ্যাশিক্ষার শৈথিল্য। জাতীয় ভাব রক্ষায় অমনোযোগী। বিধর্মী দিগের প্রবল পরাক্রম, ধন-গৌরব শাসন, বিচার রাজ্য বিভাগ, সমগ্র বিভাগই মুসলমান শুন্য।"[২] এইরূপ পরিস্থিতিতেও যে কয়জন মুসলিম বিত্তশালী জমিদার ছিলেন, মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজেজ্‌ম হোসেন তাঁদের অন্যতম। মোয়াজ্জেম হোসেনের জমিদারীসুলভ ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও তার আচার আচরণে উদার মানসিকতার ছাপ ছিল। মশাররফ হোসেন একই সাথে শৈশবে পেয়েছেন পারিবারিক পরিমণ্ডলে রক্ষণশীল ও তার আধুনিকতার স্পর্শ। সে সময় ইংরেজী শিক্ষাকে অত্যন্ত দোষণীয় মনে করা হতো। তিনি আত্মজাবনীতে লিখেছেন "কুমারখালিতে ইংরেজী স্কুল হইয়াছে, বাটী হইতে ছয় মাইল ব্যবধান। তাহার পর ইংরেজী পড়িলে পাপ তো আছেই। আর মরিবার সময় গিডীমিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ রসুলের নাম মুখে আসিবে না। তাহার পরেও আত্মীয়-স্বজন গুরুজনগণের ধারনা যে ইংরেজী পড়িলে একরূপ ছোট-খাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে সরাব খায় .... হালাল হারামের প্রভেদ নাই। পাক নাপাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাট করিয়া

নানাভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ..... নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।"[৩] এতদ্সত্ত্বেও পিতার ইংরেজী শিক্ষার প্রতি উদার চিন্তার কারণে তিনি এই শিক্ষা লাভে সুযোগ পেয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৪৭ খ্রী:) মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। তৎকালীন সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাঙালী মুসলিম সমাজের গ্লানিময় জীবনের যে ছবি মীর মানসে প্রস্ফুটিত হয়েছিল তা তার বিভিন্ন লেখার মধ্যে প্রভাব পড়েছে। মুসলমানদের এ পরিস্থিতি শুরু হয়েছিল পলাশির যুদ্ধের বিপর্যয়ের মাধ্যমে। পরবর্তীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩), সিপাহী বিপ্লব (১৮৫৭) প্রভৃতি মুসলমান সমাজের অগ্রগতিকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ করে। একদিকে রাজ্যচ্যুতিজনিত হতাশা অপরদিকে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে[৪] মুসলমানদের অংশগ্রহণের অক্ষমতার কারণে তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে অবদাসগ্রস্থতা, পরাভবচেতনা ও অতীতপ্রীতি। মুসলমান সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে তার স্থানে হিন্দুসম্প্রদায়ের সম্প্রসারণের দিকে ইংরেজ শাসকবৃন্দ যে দৃষ্টি দিয়েছিল তারই তিনটি স্তর ছিল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৮২০ সালের লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ এবং ১৮৩৫ সালে আকস্মিকভাবে রাজভাষার পরিবর্তন।[৫] ইংরেজ শাসকগণের প্রবর্তিত এই তিনটি নীতি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের পাশ্চাৎপদতাকে ত্বরান্বিত করে। এদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় এবং সংস্কৃতিক চেতনায় এগিয়ে যায় হিন্দুমধ্যবিত্ত শ্রেণী। "পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনচেতনায় পরিপুষ্ট এই শ্রেণী সৃষ্টির পিছনে হিন্দু কলেজ (১৮৭১), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮৭১), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে এই শ্রেণীর জন্য উচ্চশিক্ষার পথও উন্মুক্ত হয়। নবলব্ধ শিক্ষা ও সাংস্কৃতি ভাবধারার ইতিবাচক আলোড়নের ফলে বাংলার সমাজ জীবন থেকে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখের মতো ব্যক্তিত্বের জন্ম সম্ভব হয়। এভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-মনীষার যে বিচিত্রমুখী প্রকাশ সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ও বিজ্ঞানচিন্তার মধ্য দিয়ে ক্রম পরিণতি লাভ করে, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্বই চলে যায় বাঙালী শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রনে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধব্যাপী বিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুক্তিদূত হিসেবে গণ্য হিয়েছিল।[৬] অপরদিকে বাঙালী মুসলিম-শ্রেণী-মুসলিম শাসনের পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় হিসেবে ভুল করল। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতি-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে সময় লেগেছে গোটা ঊনিশ শতক। কিন্তু যুক্ত প্রদেশীয় মুসলিম পুঁজিপতিদের শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল বেশ

কিছুকাল আগে থেকেই। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকবর্গ, দুই ধর্মাবলম্বী বাঙালী জাতির অসমবিকাশকে ব্যবহার করল বিভক্ত কর এবং শাসন কর নীতি হিসেবে।[৭] বাংলায় ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার পর বাঙালী মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি যে অনিহা দেখা দেয় তা তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি শিল্প-দর্শন ও বিজ্ঞানকে বাঙালী হিন্দু সমাজ জাগতিক-মানসিক মুক্তির অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করল। এক ধরনের অহংবোধ, অভিমান ও ইংরেজদের প্রতি অসহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শনের মাধ্যমে বাঙালী মুসলমান তা থেকে বিরত থাকল। ফলে তাদের ভাব-জগতের বিমুখতা, দীনতা পশ্চাৎমুখীতার সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক অগ্রগতি ও চরমভাবে ব্যাহত হলো। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ও তার পরিণতি মুসলমানদের নতুন করে ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ও উদ্যম লক্ষ করা যায়, ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার মুসলমানগণ একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করলেও ব্যর্থ হয়। এ সময় মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইংরেজী শিক্ষার, সামান্য সুযোগ ছিল কলকাতা মাদ্রাসায়। ঢাকায় প্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে।[৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দু সমাজের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলমান সমাজেও ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলন প্রবলরূপ ধারণ করে।[৯] উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ পূর্ব-বাংলার ফরাজী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) এবং পশ্চিম বাংলার ফরাজী নেতা হাজী নিসার আলী (তিতুমীর) (১৭৮২-১৮৩১) হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় গিয়ে ওহাবিদের সংস্পর্শে আসেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করে সংস্কার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।[১০] বাংলাদেশে এই সংস্কার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহসীন আলদীন আহমেদ ওরফে দুদু মিঞা (১৮১৯-১৮৬০) এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। দুদু মিয়ার প্রচেষ্টায় ফরাজী আন্দোলন ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের এক মিশ্রিতরূপ ধারণ করে।[১১] পশ্চিম বঙ্গেও এই সময় তিতুমীরের নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ফরাজী আন্দোলনকারীরা তৎকালীন প্রশাসনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও এ সংঘাতের কোনো ব্যাপক রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না। তবে এ আন্দোলন বাংলার মুসলিম মানসে সংগ্রামের যে প্রেরণা সৃষ্টি করে তা সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের সর্বভারতীয় ওহাবি আন্দোলনের মানস ক্ষেত্র তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[১২] ওহাবি আন্দোলন প্রথমত ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে।[১৩] ওহাবি আন্দোলনের প্রভাব যেমন একদিকে মুসলমানদের মধ্যে প্রবল অসহযোগিতার জন্ম দেয় অন্যদিকে তেমন ইংরেজদের সহচর্য ইংরেজী শিক্ষা বর্জনেও উদ্বুদ্ধ করে। ইংরেজ নীলকর ও ইংরেজ অনুচর দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধেও ওহাবিরা

সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করে। ওহাবিদের আন্তরিকতা ও আবেগ নি:সন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু অশিক্ষা ও আবেগ-প্রবণতাই তাদের অনগ্রসরতার কারণ হয়ে দাড়ায়। রাজশক্তি বঞ্চিত মুসলমান জনগোষ্ঠী এভাবেই তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য হারিয়ে অন্ধ আবেগ ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়। ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনও সে কারণে প্রতিক্রিয়াশীলতায় পর্যবসিত হয়।[১৪] ভারতীয় মুসলমানদের কাছে সিপাহী বিপ্লব ছিল আত্মসমীক্ষার এক রক্তাক্ত সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। সিপাহী বিপ্লবের সমস্ত দায় মুসলমানদের উপর আসায় এবং ফরাজি ও ওহাবি আন্দোলনের কারণে ইংরেজদের বিরূপ মনোভাব দূর করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মুসলমানরা। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রাজভক্ত ভারতীয় মুসলমান গ্রন্থে সৈয়দ আহম্মদ খান মুসলমানদের রাজভক্তির ধরন বিশ্লেষণ করেন। বাঙালী মুসলিম চিন্তাবিদ আবদুল লতিফ খান বাহাদুর (১৮২৮-১৮৯৩) এবং সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ইংরেজদের প্রতি মুসলমানের ইতিবাচক মনোভাব সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণে বহুলাংশে সক্ষম হন। ১৮৭১ সাল থেকেই মূলত: বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা ও মননচর্চার পথ সুপ্রশস্ত হয়।[১৫] ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা ও তাদের আনুকূল্য লাভই কেবল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের উন্নয়ন সম্ভব এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সিপাহী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে। তবে মুসলিম সমাজের অগ্রগতির পেছনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন নবাব আবদুল লতিফের ইংরেজী শিক্ষার মনোভাব, সৈয়দ আমীর আলীর সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা (১৮৭৭), মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির (১৮৬৬) কার্যক্রম সৈয়দ আহমেদের আলীগড় আন্দোলন প্রভৃতি।[১৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে সার্বিক অবস্থার অগ্রগতি ঘটে। স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মসজাগতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রেই ও স্বতন্ত্র পথের অনুসন্ধান করে। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল হিন্দুদের তুলনায়। তবে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিভিন্ন কারণে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে এই প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মুসলমান জনগোষ্ঠী আত্মসচেতন হয়ে উঠে, আত্মবিশ্বাস তাদের অনুপ্রাণিত করে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এ সময় মুসলমানদের জন্য স্বাবলম্বনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।[১৭]

নিম্নবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসার পর তাদের সন্তানদের শিক্ষা বিষয়েও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা-দীক্ষা ও সরকারী চাকুরীতে অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের সচেতনতা এবং এ বিষয়ে ইংরেজদের সহযোগিতা অর্জনের জন্য শিক্ষিত ও বিত্তবান মুসলমানদের প্রচেষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে গতিশীল রূপ লাভ করে।

হিন্দু মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে মুসলমানদেরকে স্থাপন করার সুবিধাজনক নীতি ইংরেজ রাজশক্তি সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনেই গ্রহণ করে। পূর্ব বঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গীর রূপান্তর এই সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের বহি:প্রকাশ। দৃষ্টিভঙ্গীর এই রূপান্তরের ইঙ্গিত প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে। এই সময় চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ওল্ডহ্যাম রাজনীতি ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু-সম্প্রদায়ের আশঙ্কাজনক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রেক্ষাপটে মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গকে আলাদা প্রদেশে পরিণত করার সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন।[১৮] ইংরেজদের আনুকূল্যে যে হিন্দু-মধ্যবিত্তের উদ্ভব বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও সাধনায় তা সাংগঠনিক চরিত্র অর্জনে সমর্থ হয়। গণতন্ত্রমনা ও সাতন্ত্র্যকামী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতি চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গই ছিল কংগ্রেসের চালিকা শক্তি।[১৯] প্রথমদিকে কংগ্রেস বৃটিশ রাজশক্তির আনুকূল্য লাভ করলেও পরবর্তীতে যখন এই সংগঠনে ক্রমাগত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও ১৮৮৫-১৯০৫ তে উদারনৈতিক ও নরমপন্থী ব্যক্তিবর্গ কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসায় এর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সচেতন জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ সময় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে মুসলমান সমাজের মধ্যে দ্বিধা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। রাজনীতির প্রশ্নে বাঙালী মুসলমান কংগ্রেসকে নি:সংশয় ও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (১৮৮৫) ৭২ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন মুসলমান। দ্বিতীয় অধিবেশনে ৪৩১ জনের মধ্যে ৩৩ জন এবং ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের অধিবেশনে ১৮৮৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২৫৮ জন ছিল মুসলমান। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল শতকরা দশ ভাগ।[২০] কম সংখ্যক উদারপন্থী মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের কথা বললেও প্রভাবশালী মুসলমান নেতা ও সাংবাদিকরা এর বিরোধীতা করে। মুসলমানদের এই মনোভঙ্গির পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী মুলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ।

১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ হয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয় অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা হিন্দু সমাজে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিছু সংখ্যক মুসলমান যেমন অক্সফোর্ড পাস ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল (১৮৭২-১৯১৫) বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করলেও পূর্ববাংলার ব্যাপক মুসলমান সমাজ তা মেনে নেয়। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৬৬-১৯১৫) ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে জনমত সংগঠিত হতে থাকে। এবং হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী অত্যন্ত সক্রিয়ও উচ্চকণ্ঠে বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করে। তারা বাঙালির জাতিসত্তা, বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আবেদন

জানায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালির প্রতি। এই আবেদনের প্রচণ্ড প্রভাব কেবল হিন্দু জনগোষ্ঠীকেই অভিভূত করলো না, কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হলো। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা ব্যাপক গণআন্দোলনে পরিণত হয়। স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বঙ্গভঙ্গ – বিরোধীতার সূত্র ধরেই ব্যাপকতা লাভ করে।[২১] বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু হিন্দু শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ মনে করেন যে, পূর্ব বাংলায় ক্রম-উন্নতিশীল শিক্ষিত ও রাজনৈতিক উচ্চভিলাসী – হিন্দু সমাজের বিকাশ রোধের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবেই ব্রিটিশ সরকার পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণে ব্রতীন হয়েছেন। তবে মুসলমানগণ মনে-প্রাণে এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিল। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিনে মুন্সিগঞ্জে এক ভাষণে বলেছিলেন "বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। এটা আমাদের উদ্দীপ্ত করেছে কর্ম-সাধনায় এবং সংগ্রামে।"[২২] পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় হিন্দুরা ছিল সংখ্যাই বেশী। তাই মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গভঙ্গ প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করাটাই ছিল স্বাভাবিক।[২৩] কিন্তু কলকাতার শিক্ষিত হিন্দু সমাজের বিরোধীতা এবং তীব্র আন্দোলনের মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় (১৯১১)। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ব-বাংলার মুসলমানগণ হতাশ হয়ে পড়েন সেই সাথে উপলব্ধি করেন যে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে স্বাধীন ও আত্ম-নির্ভরশীল হতে হলে তাদের আরও অধিক পরিমাণে সংগঠিত হতে হবে তাহলেই কেবল তারা বৃটিশ সরকার এবং হিন্দু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের দাবি-দাওয়া সুদৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। আর এরজন্য প্রয়োজন এমন একটি রাজনৈতিক প্লাটফরম যাতে শুধুমাত্র মুসলমানদের সদস্যপদ থাকবে। এ ধারনার থেকেই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪]

বঙ্গভঙ্গের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের অগ্রযাত্রা ছিল আশাব্যঞ্জক। শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও নতুন প্রাণচাঞ্চল্য এসেছিল। তাই বঙ্গভঙ্গ রদ সঙ্গত কারণেই মুসলমানদের অত্যন্ত মর্মাহত করে এবং তারা বৃটিশ রাজশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।[২৫] তবে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তাদের সেই ক্ষোভ খানিকটা প্রশমিত হয়। এর ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানরা ঘরের কাছাকাছি উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এ ভূখণ্ডের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র কার্যক্রম। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের আদর্শ ছিল চিন্তাচর্চা, জ্ঞানের সমন্বয়সাধন এবং সংযোগ সাধন। এটি প্রকাশ করেন মুখপাত্র 'শিখা'। সমকালীন মুসলিম তরুনমানসকে মুক্ত চেতনায় উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।[২৬]

মীর মশার্‌রফ হোসেনের জন্ম ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ও মৃত্যু ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ উল্লিখিত উদীয়মান ও মুক্তচিন্তায় উদ্দীপ্ত মুসলিম সমাজ থেকে নয় অপেক্ষাকৃত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত মুসলিম সমাজ হতে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। তা সত্ত্বেও তিনি প্রথম থেকে সৃজনশীল সাহিত্যের মানবতাবাদী মৌল ধারাটির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পচারিত্র্য পর্যালোচনা শেষে এ-সত্যই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। 'বিষাদ-সিন্ধু' যথার্থ অর্থেই, বাংলা উপন্যাসের ধারায় এক স্বতন্ত্র ও অনুপম ও অনতিক্রান্ত উপন্যাস।[২৭]

মুন্সি জমির উদ্দিনের কাছে যেমন কোরান হাদিসের তত্ত্বকথা জেনেছেন শিখেছেন আরবি-ফারসি শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ, তেমনি আবার জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় শিখেছেন সরস্বতীর স্তর, গ্রহণ করেছেন বাংলা ভাষার পাঠ। ভিন্ন প্রকৃতির এই দুই বিদ্যা মীর মানসে কোন অসঙ্গতির বীজ বপন করেনি, বরং দুটিকে একাধারে গ্রহণ করে শৈশব কৈশরেই তিনি পেয়েছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার বীজমন্ত্র। এভাবেই রক্ষণশীলতা আর কূপমন্ডক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠলেও উত্তরকালে তিনি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন সমর্থক জীবনচেতনায়।[২৮] তাঁর ব্যক্তিজীবনেও সাহিত্যকর্মে দ্বন্দ্বময় মানস প্রবণতার ছায়া লক্ষ করা যায়। মীরমানসের এই দ্বান্দ্বিক পরিচয় প্রদান সম্পর্কে মুনীর চৌধুরীর অভিমত উল্লেখযোগ্য বিপরীতধর্মী, সরলতা ও জটিলতা, গতানুগতিকতা ও মৌলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা, গ্রাম্যতা ও নাগরিকতা, মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা সকলই মীরের স্বভাব। বিগতকালের রসবোধ ও জীবনচেতনার যে প্রকাশ পুঁথি সাহিত্যে লক্ষ্য করি, মীর-মানস তার সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি।[২৯] তাঁরমধ্যে একই সঙ্গে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। যার প্রভাব পড়েছে তাঁর জীবনাচরণে ও সাহিত্যকর্মে। আবার তাঁর পূর্বসুরি সাহিত্যিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ খ্যাতিমান সাহিত্যিক বৃন্দের সাহিত্যকর্ম দ্বারাও তিঁনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তবে তাঁর এই ধারা শেষ দিকে এসে খানিকটা ম্লান ও বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল। এই ক্রমবিবর্ণতা সম্পর্কে মুনীর চৌধুরীর বক্তব্য প্রাণিধানযোগ, "মীর-মানসের ক্রম-বিকাশের প্রথম অধ্যায় দীনবন্ধু মাইকেল বঙ্কিমের সাহিত্যাদর্শের প্রভাব পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামী চেতনার গৌবরবোধে সমুজ্জল। শেখ আব্দুর রহিমের

'হাফেজ' (১৮৮৭) পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখা দিয়েছেন। স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি-প্রকাশে অকুণ্ঠ হয়েও এঁরা তখন আজকালকার উপদ্রবী অর্থে সাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাছাড়া এই পর্বে এখনও মীর সাহেবের প্রধান উৎসাহ সাহিত্যসৃজনে, সাধ্যমত মুসলমানী উপাদানে শিল্পগত রূপায়ণে। তৃতীয় পর্বে, মীরের বৃহত্তম সংখ্যক রচনা শিল্পানুপ্রেরণাহীন। ধর্ম বিষয়ক বাহ্য ও গৌন ধারনা দিতে আকীর্ণ মীর-মানস। এই পর্বে কেবল উপ-পুথি সাহিত্য সৃষ্টি করেই তুষ্ট ছিল।[৩০]

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে সামাজিক নানা প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়ায় মীরমানসও হয়ে পড়েছিল দ্বন্দ্বক্ষত, অমীমাংসিত এবং স্ববিরোধে আকীর্ণ। ফলে মশাররফের চিত্ত জাগতিক সত্তায় আমরা সর্বদা দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা লক্ষ করি। তাঁর ব্যক্তি জীবনে যেমন, তেমনি সাহিত্য কর্মে এই দ্বন্দ্বময় অমীমাংসিত মানস প্রবণতার ছায়াপাত ঘটেছে।[৩১]

মীর মশাররফ হোসেনের বহুল আলোচিত ও জনপ্রিয় উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু' ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে, হিজরি ৬১ সালের মহররম মাসে সংঘটিত কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেছেন। কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্বে বহু কাব্য রচিত হয়েছে কিন্তু তিনিই প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। তবে উপন্যাসের উৎস সম্পর্কে তিনি উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন। "পারস্য ও আরব্য ঘটনা হতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত হইল। প্রাচীন কাব্য গ্রন্থের অবিকল অনুষাদ করিয়া, প্রাচীন কবিগণের রচনাকৌশল এবং শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। তবে মহররমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষাপ্রিয় প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য।" পরবর্তীতে অনেক সমালোচকই মীর মশাররফ হোসেনের এই বক্তব্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। মুনীর চৌধুরীর মতে পারস্য বা আরব্য গ্রন্থ নয়, এই বিষয়ক বাংলা পুথি থেকে সংগ্রহ করেছেন। "মীর-মানস যে প্রধানত বাংলা পুঁথির দুনিয়াতেই লালিত ও বর্ধিত হয়েছে তার অনেক প্রমান উল্লেখ করা যায়। স্বভাবতই পুঁথির বিশ্বস্ত সূত্রতায় প্রাপ্ত 'বিষাদ-সিন্ধু' অনেক ঘটনাই অলিক।[৩২] তবে উপন্যাসটির কাহিনী উৎস যা-ই-হোক না কেন তিঁনি 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসটি রচনা করেছেন ইতিহাসের ঘটনাংশ ও কাঠামোকে ব্যবহার করে। ইতিহাসের কঙ্কালের উপর তিনি কল্পনার নান্দনিক সৌধ নির্মাণ করেছেন। ইতিহাস ও ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ সম্পর্কে এরিষ্টটল বলেছেন, ইতিহাস হচ্ছে সত্য ঘটনার বিবরণ আর ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্য হচ্ছে ইতিহাসের কঙ্কালের উপর কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য।[৩৩] বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসে যার যথার্থতা খুজে পাওয়া যায়। মীর মশররফ হোসেন ইতিহাসের সত্যকে শিল্পসত্যে রূপান্তরের কারণে কালোত্তীর্ণ হয়েছেন। কারবালার

ঘটনা প্রবাহের সাহিত্যিক-সম্ভাবনা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য লেখকের মত মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও মুগ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – æWe have just got over the noise of a Mohurrum I tell you what: If a great poet were to rise among the Musulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. We could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject."[৩৪] কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহারাজ্য রচনার যে সম্ভাবনা কল্পনা করেছিল মশাররফ হোসেন সেই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করেছেন। ক্ষেত্র গুপ্তের অভিমত এখানে প্রনিধানযোগ্য "বাংলায় মহাকাব্যিক উপন্যাস কিছু অবশ্যই আছে। কিন্তু খাটি মহাকাব্যের কাছাকাছি উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু'। বিষাদ-সিন্ধু গদ্যে লেখা মহাকাব্য এবং বিষাদ-সিন্ধু একটি ইতিহাসশ্রয়ী রোমান্স।"[৩৫] উপন্যাসের কতখানি ঐতিহাসিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা সত্যিকার ঐতিহাসিক ঘটনাটি আলোচনা করব।

ইমাম হাসানের সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে মুযাবিয়ার পর ইমাম হুসাইনের খিলাফত লাভের শর্ত সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হলেও মুযাবিয়া এর অবমাননা করে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে ৬৭৯ খিস্টাব্দে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। ৬১ হিজরির শাবান ও ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর পিতার উইল অনুসারে ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহন করেন। ইয়াজিদ ছিলেন যেমন নিষ্ঠুর তেমনি বিশ্বাসঘাতক। তার সময়কালে কারবালার এই হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়। নিষ্টুরতা, অধার্মিকতা, মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়পরায়নতা ছিল ইয়াজিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে হযরত আলী (রাঃ) এর দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ) বংশানুক্রমিকভাবেই পিতার গুনাবলী ও বীরোচিত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। সিডিলট বলেন, তাঁর মধ্যে একটি গুণের অভাব ছিল, তা হল ষড়যন্ত্রের মানসিকতা, যা উমাইয়া বংশীয়দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মহানবী (স:) এর দৌহিত্র এবং হযরত আলীর কনিষ্ট পুত্র ইমাম হুসাইন ছিলেন ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, উদার, নম্র, সৎ ও অকপট। অপরদিকে মোয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ ছিলেন, পাপাসক্ত, অত্যাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নীতিজ্ঞানহীন, মদ্যপায়ী ও হৃদয়হীন। ভনক্রেমারের মতে, "মুয়াবিয়ার মত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ পিতার পক্ষে তাঁর অযোগ্য ও পাপাসক্ত পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ঐতিহাসিকদের নিকট সত্যই দুর্বোধ্য।"[৩৬] ইয়াজিদের উত্তরাধিকারকে আরব গোত্র এবং ইমাম হুসাইন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অন্যায় বলে মনে করেন। তাঁরা দামেস্কে প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুয়াবিয়ার চুক্তি ভঙ্গ এবং ইয়াজিদের উত্তরাধিকারকে মানবতা বিরোধী ও নীতিজ্ঞানহীন পদক্ষেপ বলে প্রতিবাদ করেন। কারবালার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি যে কারণে সংঘটিত হয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন, তা হলো:

প্রথমত, মুয়াবিয়ার শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা কারবালা যুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইমাম হাসানের সঙ্গে সন্ধিতে স্বাক্ষর করে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমাম হুসাইন খলিফা হবেন। কিন্তু ৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর এক বছর পূর্বে মুয়াবিয়া এই সন্ধিচুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তার অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, মদিনার পরিবর্তে দামেস্কে রাজধানী স্থাপনে সিরিয়ার গুরুত্ব মদিনা অপেক্ষা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে মৌলিক ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী কার্যকলাপে মক্কা ও মদিনার ধর্মভীরু, সৎ ও নিষ্ঠাবান সাহাবিগণ উমাইয়াদের অনাচার ও অনুদার মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। সিংহাসন, নপুংসকদের দ্বারা রক্ষীবাহিনী, গঠন, হারেম প্রথা, মদ্যপান, বিলাস বাসন এবং ব্যাভিচারে আদর্শ মুসলমানগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ইয়াজিদ তার পিতা মুয়াবিয়ার মত সুদক্ষ শাসক ছিলেন না। কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নৃশংসতা তার চরিত্রকে কুলষিত করে। তিনি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানেন। এ কারণে মক্কা ও মদিনার লোকেরা ইমাম হুসাইনকে সমর্থন করেন।

তৃতীয়ত, বার্নাড লুইস বলেন, জিয়াদ এবং বিশ্বেষ করে তার পুত্র ওবায়দুল্লাহর কুশাসনে ইরাকি আরবদের সিরিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে এবং হযরত আলীর পুত্র হোসাইনের পক্ষে আন্দোলন পরিচালিত করে।

চতুর্থত, কারবালার যুদ্ধের অপর একটি কারণ কুফাবাসীদের কপোটতা, অস্থিরমতিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যাবলী। ইমাম হুসাইন স্বীয় চাচাত ভাই মুসলিমকে কুফার পরিস্থিতি যাচাই করবার জন্য কুফায় প্রেরণ করলে ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক তিনি নিহত হন। কুফাবাসিগণ ইমাম হুসাইনকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ইয়াজিদের পক্ষ অবলম্বন করলে ইমাম হোসেন পরাজিত ও শাহদত বরণ করেন।[৩৭]

Kvievjvi nZ¨vKvD

ইয়াজিদ ছিলেন যেমন নিষ্ঠুর তেমনি বিশ্বাসঘাতক। তার কুলষিত মনে দয়া বা সুবিচারের কোন স্থান ছিল না। মুআবিয়া ও ইমাম হাসানের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি অনুযায়ী দামাস্কাসের বৈধ শাসক ছিলেন ইমাম হুসাইন (রাঃ)। তাই কখনই তিনি ইয়াজিদের স্বেচ্ছাচারী শাসকের দাবি স্বীকার করেননি। তাঁর পাপাচারকে তিনি ঘৃনা করতেন এবং তাঁর চরিত্রকে তিনি দেখতেন পরম বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে। কিন্তু কুফার মুসলমানরা যখন উমাইয়া শাসনের

অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য তাঁর সাহায্য চাইল। তাদের আবেদনে সাড়া দেওয়া তিনি কর্তব্য বলে মনে করলেন। জুবাইর পুত্র আবদুল্লাহ ইমাম হুসাইন (রাঃ) কে তাঁর পথ থেকে সরাতে চেয়েছিলেন। অতএব তিনি তাঁকে উৎসাহিত করলেন। আব্দুল্লাহ ছাড়া তার সব বন্ধুই কুফাবাসীদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিলেন। কারণ তারা ইরাকীদের চরিত্র জানতেন। দুরাকাংক্ষী, হিংস্র ও উদ্যমী কুফাবাসীদের চরিত্রে অধ্যবসায় ও স্থিরতার চূড়ান্ত অভাব ছিল। তারা দিন থেকে দিনান্তরে নিজেদের মনের খবরই জানত না। কিছু কারণ বা ব্যক্তি বিশেষের জন্য তারা এই মুহূর্তে আগুনের মত প্রজ্বলিত তো পর মুহূর্তে আবার বরফের শীতল এবং মরার মত উদাসীন। কিন্তু দৃশ্যপটে উপনীত হওয়ামাত্র সমগ্র ইরাক তাঁর পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তত। এই প্রতিশ্রুতিতে তিনি কুফা অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। বিভিন্ন আত্মীয়, পরিজন, দুই সাবালক পুত্র কয়েকজন ভক্ত অনুগামী এবং ভীর্তি বিহ্বল মহিলা ও শিশুদের নিয়ে তিনি আরবের দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম করলেন। কিন্তু ইরাক সীমান্ত পৌছে কুফার সেনাবাহিনীর কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। তার সঙ্গে যাদের মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। দেশের নির্জন ও প্রতিকুল পরিবেশে বিপদ সংকেত শুনতে পেলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও উমাইয়াদের মারণাস্ত্রের প্রতি সন্ধিগ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র দল নিয়ে শিবির স্থাপন করলেন ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে।

বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পরিত্যাগ সম্পর্কে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর আশংকা রূঢ় সত্যবলে প্রমাণিত হল। নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রকৃতির ওবায়দুল্লাহর পাঠানো উমাইয়া সৈন্যরা তাকে অবরুদ্ধ করল। কয়েকদিন ধরে তাবু ঘেরাও অবস্থায় রইল। যেহেতু ইমাম হুসাইন(রাঃ) এর তরবারীর আওতায় আসতে সাহস করল না। তাই তারা তাঁকে বিছিন্ন করে দিল ইউফ্রেটিসের থেকে। রক্তপাত বন্ধের জন্য ইমাম হুসাইন (রাঃ) তিনটি প্রস্তাব করেন, হয় তাঁকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া হউক, নতুবা দ্বিতীয়ত, তূর্কী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেওয়া হউক, অথবা তৃতীয়ত, ইয়াজিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁকে দামেস্কে প্রেরণ করা হউক। কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকার করলে, শেষ উপায় হিসাবে ইমাম হুসাইন (রাঃ) তাদের কাছে আবেদন করলেন। অসহায় মহিলা ও শিশুদের প্রতি যেন যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া না হয়, পরিবর্তে তাঁর প্রাণনাশ করা থেকে এবং অবসান ঘটুক এই অসম দ্বন্দ্বের। কিন্তু সেই প্রস্তাবও প্রত্যাখাত হয়। এদিকে ইমাম হুসাইনের (রাঃ) শিবিরে পানির জন্য হাহাকার পড়ে গেলে ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ হিজরীর ১০ই মহরম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথমে ভ্রাতুসপুত্র কাশেম শাহাদত বরণ করেন। এরপর তাঁর পিপাসার্ত পুত্র আসগর এভাবেই একে একে ইমাম হুসাইন (রাঃ) অন্যান্য পুত্র ও ভাইপোরা তাঁর কোলেই নিহত হয়। নির্দয় শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত আর কোন সমর্থ লোক নেই দেখে তিনি একাকী অবসন্ন অবস্থায় বসে পড়লেন শিবিরের প্রবেশ পথে। তিনি পিপাসা উপশমের জন্য সেই না পানির পাত্র ওষ্ঠে ধারণ করেছেন অমনি একটি শর এসে বিঁধল তাঁর মুখে। আকাশের দিকে

হাত তুলে তিনি জীবিত ও মৃতদের জন্য অন্তিম প্রার্থনা করলেন। তারপর মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন উমাইয়াদের উপর যারা সবদিকেই তাঁর পিছ। কিন্তু রক্তপাত দেখে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ধরাশায়ী হলে ঘাতকের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল মুহূর্ষ বীরের উপর। সীমার নামক এক পাপিষ্ট তার শিরচ্ছেদ করে। পদদলিত করা হয় তার দেহ এবং পাশবিক হিংস্রতার সর্বোতভাবেই তার অমর্যাদা করা হয়। তাঁর ছিন্ন মস্তক কুফায় বয়ে আনা হলে মনুষ্যত্বহীন ওবায়দুল্লাহ সেটির মুখে বেত্রাঘাত করে। গিবন বলেন, "দুরবর্তী সময়ে ও আবহাওয়ার হুসাইনের মৃত্যুর মর্মান্তিক দৃশ্য নিরাসক্ত পাঠকেরও সহানুভূতি জাগ্রত করে।" এইভাবে সেযুগের অন্যতম মহান আত্মা নিহত হন এবং তাঁর সঙ্গে পরিবারের বৃদ্ধ ও যুবক সকল পুরুষ মৃত্যুবরণ করেন। একমাত্র রুগ্ন শিশুপুত্র থাকে হুসাইন (রাঃ) এর বোন জয়নাব (জেনোবিয়া) গণহত্যা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তার নাম ও আলী পরবর্তী জীবনে তিনি উপাধি পান জয়নুল আবেদীন বা ধার্মিকের অলংকার। তিনি পারস্যের শেষ সাসানীয় রাজা ইযাজ্‌দজর্দের কন্যার গর্ভজাত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর পুত্র এবং তার মাধ্যমেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশ বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা পায়।[৩৮]

মহরম পর্ব্ব, উদ্ধার পর্ব্ব ও এজিদ বধ পর্ব্ব এই তিনটি পর্বে বিভক্ত বিষাদ সিন্ধু উপন্যাসটি। মহরম পর্ব্ব উপন্যাসটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় অধ্যায়। বিষাদ সিন্ধুর মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে মহরম পর্ব্বে। এজিদের জন্ম ও তার প্রেয়সী জয়নবকে পাবার জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্রের আশ্রয়, পিতা মাবিয়ার সঙ্গে এজিদের মতভেদ, হাসানের সঙ্গে জয়নবের বিয়ে, হাসানের সাথে এজিদের শত্রুতা, জায়েদার দ্বারা হাসানের মৃত্যু, হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের দ্বন্দ্ব ও হোসেনকে ধ্বংস করার জন্য এজিদের ষড়যন্ত্র এবং সবশেষে কারবালার প্রান্তরে সীমারের হাতে হোসেনের মৃত্যু এ সব কিছুই স্থান পেয়েছে মহরম পর্ব্বে। 'মহরম পর্বেই বিষাদ-সিন্ধুর কাহিনী দানা বেঁধেছে – দুর্মর রূপতৃষ্ণার কারণে এজিদ-চরিত্রে ট্রাজেডির বীজ উপ্ত হয়েছে এ পর্বেই। জায়েদা চরিত্রের যে অসামান্য দুতি তা-ও এ পর্বের বিষয়। অতএব বলা যায় 'মহরম পর্ব্বই – 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রাণ'।[৩৯]

আধুনিক জীবনচেতনা, শিল্পবোধ ও মানব মহিমার যে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে মহরম পর্ব্বে, উদ্ধার পর্ব্বে তা লক্ষ করা যায় না। লেখক ধর্মীয় আচ্ছন্নতার চিত্র অঙ্কনে বেশী মনোযোগী হওয়ার কারণে উদ্ধার পর্ব্ব হয়েছে খানিকটা ম্লান ও বিবর্ণ। সীমারের হোসেনের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা হোসেনের মস্তক রক্ষার জন্য আজবের প্রাণ-পন চেষ্টা, জয়নবের প্রতি এজিদের ক্রোধ প্রকাশ, হোসেনের মস্তক অলৌকিকভাবে উর্ধ্ব লোকে গমন, এজিদের দু:শাসন ও হাসান – হোসেনের বংশধরদের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র ও কুটজাল, বিপদগ্রস্থ হোসেন-পরিবারের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম, বীর মোহাম্মদ হানিফার দুধার প্রতিশোধ স্পৃহা, এজিদের সৈন্যের বিরুদ্ধে হানিফা, মস্‌হাব

কাবস্কার যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ, হানিফার বিরুদ্ধে এজিদের গুপ্তচরবৃত্তি ও যুদ্ধের প্রস্তুতি, সীমারের মৃত্যু, জয়নবের রূপমুগ্ধ এজিদের আত্মধিকার, এজিদের যুদ্ধ যাত্রা ও পরাজিত হয়ে প্রাণভয়ে পলায়ণ। এই সবকিছুই উদ্ধার পর্ব্বের বিষয়বস্তু। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এজিদের বন্দিদশা হতে জয়নাল আবেদীনের উদ্ধার প্রাপ্তি। এটিই এ পর্বের নামকরণের কারণ হতে পারে। সংক্ষিপ্ত আকারেই সমাপ্তি টেনেছেন এজিদবদ পর্ব্বের। এজিদকে হত্যার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও উদ্যোগ গ্রহণ, পরাজিত হয়ে এজিদের পলায়ণ ও জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নারকীয় যন্ত্রনাভোগ, বীর হানিফার দেব-নির্দেশিত বন্দিত্ব, সবশেষে জয়নাল আবেদীনের পিতার রাজ্য-উদ্ধারের পর সিংহাসনে আরোহণ প্রভৃতি ঘটনা স্থান পেয়েছে এই পর্বে। আর উপসংহারে সত্যের জয় পাপের পরিনামে শাস্তিভোগ ইত্যাদি কথার মাধ্যমে উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন।

বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাস বর্ণিত অনেক ঘটনা যেমন ইতিহাস সম্মত তেমনি কিছু মশাররফ হোসেনের কল্পনার ফসল। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই এ মর্মান্তিক যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল, রাজনৈতিক বিরোধ ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। কিন্তু উপন্যাসে বিরোধের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে রূপতৃষ্ণায় দগ্ধ এজিদের জয়নব লাভের দুর্মর আকাঙ্ক্ষাকে। এজিদ বধ পর্ব্বের তৃতীয় প্রবাহে এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

'হায়! কোথায় আমি – জয়নাব। সামান্য ব্যবসায়ী দীনহীন দরিদ্র্যের কুলবধূ। দৈহিক শ্রমোপার্জিত সামান্য অর্থাকাঙ্ক্ষীর সহধর্মিনী, রাজাচার, রাজব্যবহার – রাজপরিবারগণের অতি উচ্চ-সুখ-সম্ভোগের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? ... হায়! আমার নিজ জীবনের আদি অন্ত ঘটনা মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যক্ষ প্রমানের সহিত সপ্রমাণ হইবে, এই হতভাগিনীই বিষাদ-সিন্ধুর মূল। জয়নাবই এই মহাপ্রলয় কাণ্ডের মূল কারণ।"[৪০]

এজিদ বধ পর্ব্ব তৃতীয় প্রবাহে আছে –হায়! কোথায় আমি জয়নাব। সামান্য ব্যবসায়ী দীনহীন দরিদ্রের কুলবধু। দৈহিক শ্রমোপার্জিত সামান্য অর্থাকাঙক্ষীর সহধর্মিনী। রাজাচার রাজব্যবহার রাজপরিবার গণের অতি উচ্চ সুখ সম্ভোগের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমি রাজা অন্তঃ পুরে কেন? মদিনার পবিত্র রাজপুরীর মধ্যে জয়নাবের বাস অতি আশ্চার্য। দামেস্কের রাজকারাগারে বন্দিনী, সে আরো আশ্চার্য। আমার নিজ জীবনের আদি অন্ত ঘটনা মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যক্ষ প্রমানের সহিত সপ্রমাণ হইবে, এই হতভাগিনীই 'বিষাদ-সিন্ধু'র মূল। জয়নাবই এই মহা প্রলয়কাণ্ডের মূল কারণ। হায়! হায়! আমার জন্যই নূরনবী মোহাম্মাদের পরিবার পরিজনপ্রতি এই সাংঘাতিক

অত্যাচার।[৪১] অপরদিকে এজিদের জন্ম আরও যেসব অলীক ঘটনা 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসে বর্ণীত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে–

- এজিদের জন্ম উপাখ্যান।
- যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনার অতিরঞ্জন।
- আজরের স্ত্রী কর্তৃক তাঁর সন্তানদের মস্তক ছিন্ন করে সীমারের হাত থেকে ইমাম হুসাইনের মস্তক হস্তগত করার অভিপ্রায় এবং পরিশেষে ব্যর্থ হওয়া।
- খণ্ডিত শির হতে জ্যোতি বের হওয়া এবং সেই জ্যোতির আকর্ষণে উর্ধ্বে উঠে অন্তর্ধান হওয়া।
- ফোরাতে ভাসমান অবস্থায় প্রভূভক্তের পুত্রদের শুণ্যশির যুগল দেহের কাছে পাত্রস্থ মস্তক ধরতেই সেগুলোর দেহ অনুযায়ী সঠিক যোগাযোগ হয়ে যাওয়া।
- হানিফা এজিদের লড়াই।
- জয়নাবের রূপের খ্যাতি ও জায়েদার অসুস্থ ঈর্ষা ইত্যাদি সবই ইতিহাস বহির্ভূত কাল্পনিক ঘটনা।

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তাদের মধ্যে একদল খুব ভালো যাদের মধ্যে ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রবলভাবে বিদ্যমান, অপরদিকে খারাপ লোক, যাদের চরিত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে প্রাবৃত্তিক স্খলন ও মানবিক পতন। উপন্যাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র এজিদের। তিনি প্রাণবান পুরুষ, প্রতাপশালী শাসক ও রূপমুগ্ধকর প্রেমিক। এ প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর অভিমত স্মরণীয় গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট এবং প্রদিপ্ত চরিত্র এজিদের। তার চিন্তায়, আচরণে, আবেগে ও অভিব্যক্তিতে এমন একটা দৃঢ় গাঢ় ঔজ্জল্য আছে যে অন্যান্য চরিত্র তার পাশে নিতান্ত মর্যাদাহীন বলে মনে হয়। নীতিবিদের দৃষ্টিতে এজিদের ক্রিয়াকর্ম যত গর্হিত ও অভিশপ্ত বিবেচিত হোক না কেন, চরিত্র বিচারের সাহিত্যিক মানদণ্ডে এজিদের মত প্রাণময় পূর্ণাবয়ব পুরুষ সমগ্র উপন্যাসে দ্বিতীয়টি নেই। এজিদ পাপী, ধর্মদ্রোহী এবং ইন্দ্রিয় পরবশ। কিন্তু এজিদের পাপের প্রকৃতি অসামান্য, তার বিকাশ প্রলয়ঙ্কারী। তার পরিণাম যেমন ভয়াবহ, তেমনি শোকাবহ। এজিদ সাহসী রণকুশলী বীর সেনাপতি। রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনায় সে অকুতোভয়। রূপজ মোহে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার মতো সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী। স্বপক্ষীয় কৃতীয় সোনককে পুরস্কার দানে সে মুক্তহস্ত, অসহায় বন্দিনীকে লাঞ্ছিত করতে কুণ্ঠিত। লেখক বড় সযত্নে এজিদ চরিত্র নির্মাণ করেছেন।[৪২] অন্যসব চরিত্র ছিল বলতে গেলে অনুজ্জ্বল। এমনকি ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র তাদের সদগুনের উল্লেখ করেছেন। সেখানে তাঁরা ধর্মপ্রাণ মহৎ পুরুষ,

কর্তব্যনিষ্ঠা ও সরলতায় আকর্ষণীয় নিস্প্রভ। এক্ষেত্রে বলা যায় 'যারা ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় মহিমান্বিত এবং পূন্যবান তারা এ উপন্যাসে নিতান্তই নিস্প্রভ ও নিষ্ক্রিয়।'[৪৩]

নারীচরিত্র সমূহের মধ্যে জায়েদা বিষাদ-সিন্ধুর একমাত্র জীবন্ত নারী। রূপজ মোহের পরেই উপন্যাসের অন্যতম শিল্প উপাদান সপত্নীবাদ সে কারণেই হয়ত জায়েদা চরিত্রটি এত উজ্জ্বল। তবে মশারফ হোসেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্জাত সপত্নীবাদের উপাদান জায়েদা চরিত্রে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। বিষাদ-সিন্ধুর রূপগত পরিচয় প্রদানে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন এটি 'উপন্যাস,' কেউ বলেছেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস,' কেউ বলেছেন 'ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স,' কেউ বলেছেন, 'উপাখ্যান,' আবার কেউ এই জটিলতার মধ্যে না গিয়ে এইটিকে আখ্যায়িত করেছেন এইভাবে বিষাদ-সিন্ধু খাটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, জীবনচরিত্র ও নয়। তেমনি আটঘাট বাধা বিধিবদ্ধ Organic Plot এর উপন্যাসও নয়, এ ইতিহাস উপন্যাস সৃষ্টিধর্মীয় রচনা ও নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববিধ সংমিশ্রনে রোমান্টিক আবেগ মাখানো এক সংকর সৃষ্টি। গদ্য মহাকাব্য নীতি গ্রন্থ ইত্যাদি অভিধায়ও বিষাদ-সিন্ধু কখনো কখনো পরিচিতি লাভ করেছে। সন্দেহ নাই বিষাদ-সিন্ধুতে মাহকাব্যিক বিশালতা, ঐতিহাসিক উপাদান, ধর্মীয় নীতিকথা, রোমাঞ্চ উপকরণ ইত্যাদি নানা প্রবণতাও অনুষদের উপস্থিতি বর্তমান, তবে অন্তিম বিচারে এটি একটি উপন্যাস ইতিহাস আশ্রিত রোমাঞ্চ উপন্যাস।[৪৪] তবে বিষাদ-সিন্ধু কতখানি ইতিহাস সম্মত আর কতখানি ইতিহাসভিত্তিক নয়, উপন্যাসটির শৈপ্লিক সার্থকতা বিচারে এ প্রশ্ন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তিনি ইতিহাসের কাঠামোর উপরেই নির্মাণ করেছেন শিল্পের সৌধ।[৪৫]

পুঁথিসাহিত্যের অলৌকিকতাও অতিপ্রাকৃত অনেক ঘটনা 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন মীর মশাররফ হোসেন। পুথিসাহিত্যের এই উপাদান ব্যবহার সম্পর্কে মুনির চৌধুরী বলেছেন– 'পুথির বিশ্বস্ত সূত্রতায় প্রাপ্ত 'বিষাদ-সিন্ধু'র অনেক ঘটনাই অলিক। এজিদের জন্ম বৃত্তান্ত মশাররফ হোসেনের ছিন্ন শির থেকে প্রবাহিত শোণিত বিন্দুর ধারায় এজিদের পরিণাম আরবী হরফে লিখিত এবং সেই খণ্ডিত শির উর্দ্ধাকাশ থেকে পতিত স্বর্গীয় জ্যোতির আকর্ষণে আসমানে উঠে যাওয়া পূর্ব ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কারবালার প্রান্তরের আকাশে বাতাসে বৃক্ষে মাটিতে আশু মরণ সম্ভাবনার সহস্র প্রকার ছায়াপাত ঘটা, ফোরাতে ভাসমান অবস্থায় প্রভূ-ভক্তের পুত্রদ্বয়ের শূন্যশির যুগল দেহের কাছে পাত্রস্থ মস্তক ধরতেই সেগুলোর দেহ অনুযায়ী সঠিক যোগাযোগ হয়ে যাওয়া সবই অবিকল পুঁথির নিয়মে ঘটেছে। এমন কি হানিফা এজিদের লড়াই, সখিনা-কাসেমের বিবহা, জয়নাবের রূপের খ্যাতি ও জায়েদার অসুস্থ ঈর্ষা, এগুলোও পুঁথির দান।[৪৬]

তৎকালীন মুসলিম পুঁথিপাঠ ও চর্চা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সুতরাং সমকালীন এই সাহিত্যভাবনা থেকে মীর-মানসও মুক্ত ছিল না। অপরদিকে যৌবনের প্রেম এবং দাম্পত্য-সঙ্কট মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য ভাবনা এবং মানস-সংগঠনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠা লতিফ-উন-নিসার অকাল মৃত্যুর কারণে তাঁদের প্রণয় মিলনে রূপ লাভ করেনি। যা মীর মশাররফকে অত্যন্ত মানসিক কষ্ট প্রদান করেছে। ১৮৬৫ সালে আজীজ-উন-নিসার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু তাদের এ বিয়ে সুখের হয়নি। বিবি কুলসুমকে দ্বিতীয় বিয়ে করার পর তাঁর দাম্পত্য জীবন গভীর সংকটে পড়ে। প্রথম স্ত্রীর দ্বারা বিবি কুলসুমকে ডাকাত দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসে জায়েদা চরিত্রে আমরা এই সপত্নীবাদের বিস্ময় প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি।

Z_¨wb‡`©k

১. ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ভূমিকা, পৃ. ২৮

২. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী', জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্য, পৃ. ৭১

৩. মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী

৪. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৭১, কলিকাতা, মুক্তধারা, ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, পৃ. ২১

৫. হুমায়ুন কবির – বাঙালার কাব্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৫, কলিকাতা, চতুর্বঙ্গ, পৃ. ৪৫-৪৬

৬. রফিকউল্লাহ খান – বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ

৭. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশ' বাঙলাদেশ, মনসুর মুসা সম্পাদিত, ১৯৭১, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ৩৫

৮. মুহাম্মদ আবদুর রহিম – বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৭১), ১৯৭৬, ঢাকা, পৃ. ১২৩-১২৫

৯. অমলেন্দু দে. – বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ১৯৪৭, কলকাতা, রত্না প্রকাশন, পৃ. ৬১-১৩১

১০. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭১, ঢাকা, আহম পাবলিশিং হাউজ, পৃ. ১১১

১১. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

১২. বাংলার সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১২

১৩. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩-১৩১

১৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-

১৫. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

১৬. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৭

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪, ১৭৪-১৭৭

১৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার – বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৪৭), চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭৫, কলকাতা, পৃ. ২৬

১৯. Kamruddin Ahmad – A Socio-political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Fourth Edition, 1975, Dacca, Inside Library, P. xxxvi

২০. রফিকউল্লাহ খান – বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ – আশফাক-উল-আলম পরিচালক, গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

২১. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২২. ড. এম. এ. ওদুদ ভূঁইয়া – বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, রয়েল লাইব্রেরী, ৩১/৩২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৮৯, পৃ. ৫১

২৩. বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

২৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

২৫. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

২৬. বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

২৭. ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ – পৃ. ২৮

২৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ভূমিকা, পৃঃ ৯

২৯. মুনীর চৌধুরী, মীর মানস, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, তয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃঃ ১২

৩০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯

৩১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৩২. মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৩৩. Aristotle, On the Art of Poetry, Classical Literary Criticism (Translated by T.S. Porsch) London, 1984 ed: Pp. 42-45

৩৪. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের পত্র, দ্রষ্টব্যঃ নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি কলকাতা ১৩৬১, পৃ. ৬১৯

৩৫. ক্ষেত্রগুপ্ত, 'মীর মশাররফ হোসেন' সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃ. ১৩৫

৩৬. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, আরব জাতির ইতিহাস, নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২/৩ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০, পৃ. ৪৫৪-৪৫৬

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫

৩৮. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, 'এ শর্ট থিষ্ট্রি অব্ ম্যারাসিনস' – অনুবাদক হাবিব আহসান, এম. এ প্রকাশক, ৫৫, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা, ৭০০০৭৩, পৃঃ ৮০-৮৪

৩৯. উঃ বিঃ ঘোষ – পৃ. ১৩

৪০. মীর মশাররফ হোসেন, বিষাদ-সিন্ধ, এজিদ বদ পর্ব্ব, তৃতীয় প্রবাহ

৪১. বিষাদ সিন্ধু, পৃঃ ২৬৩

৪২. মুনীর চৌধুরী, বিষাদ সিন্ধু, পৃঃ ৪১

৪৩. আবুল আহসান চৌধুরী মীর মশারফ হোসেন, সাহিত্যকর্ম ও সমাজ চিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃঃ ১১০

৪৪. ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ভূমিকা, পৃঃ ১৪-১৫

৪৫. মুনীর চৌধুরী, মীর মানস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

Iô Aa¨vq

ie›‘bv‡_i BwZnvm †PZbvi ¯vZš¨

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিহাসশ্রয়ী দুটি উপন্যাস রচনা করেছেন। একটি 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১২৮৯ বঙ্গাব্দ) ও অপরটি 'রাজর্ষি (১২৯৩ বঙ্গাব্দ)। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসটি রচনা করেছেন বাংলার বার ভূঁইয়াদের অন্যতম ভূঁইয়া যশোরের প্রতাপাদিত্যকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের সূচনাতে উল্লেখ করেছেন তিনি সেই সময়ে প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে লেখা সমস্ত বই পড়েছিলেন। তবে এই উপন্যাসের প্লটের জন্য সর্বাপেক্ষা ঋণী 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র কাছে। প্রতাপাদিত্য চরিত্র নির্মাণে 'বঙ্গধিপ পরাজয়' উপন্যাসটি কিছুটা ভূমিকা রেখেছে বলা যায়। কাজেই 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে'র উৎস বিচার করতে গেলে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ডকেই গ্রহণ করতে হবে।[১]

ঊনিশ শতকে বাংলায় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু পূনজাগরণের জোয়ার এসেছিল তা ঠাকুর পরিবারকেও স্পর্শ করেছিল। তাই তো ব্রাহ্ম পরিবারের এই কৃতি সন্তানরা হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিল।[২] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন হিন্দু মেলার পর হতে (১৮৬৭) দেশের লোকের প্রতি অনুরাগ ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করে 'পুরু বিক্রম' (১৮৭৪) ও 'অশ্রুমতি' (১৮৭৯) নাটক রচনা করেন।[৩] এমনি পারিবারিক স্বদেশচেতনার পরিমণ্ডল কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি তাঁর মুদ্রিত প্রথম কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার' নামক কবিতা ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মেলায় পাঠ করেন। এই কবিতায় তিনি ভারতের বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। রাম ও যুথিষ্ঠিরের রাজ্য শাসন স্মরণ করেছেন। পৃথ্বিরাজ ও দুগাবতীর আত্মবিসর্জনের প্রশংসা করেছেন।[৪] এইভাবেই কিশোর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইতিহাস প্রিয়তার জন্ম নিতে থাকে। তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। এইজন্যই হয়তো প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' তাঁর নিকট অতি প্রিয় ছিল এবং তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ্য ভাগ্নী সৌদামিনী দেবিকে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' পাঠ করে শোনাতেন।[৫] সে সময় অধিকাংশ উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছিল সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যুগের আবহাওয়ায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাছাড়া সেসময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত ছিল না। তার 'বউ ঠাকুরাণীর

হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) ঐতিহাসিক আদর্শে রচিত বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণবহুল শোভাযাত্রা রবীন্দ্রনাথের মনকে সেরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে পারে নাই। ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহ ও ভাগ্য-পরিবর্তনের মধ্যে তিনি নিভৃত সাধনা ও অখণ্ড শান্তির নিবিড় আনন্দ রসে মগ্ন হয়েছিল।[৬] বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় যে শক্তি ও প্রাণ ছিল তা তাঁর পরবর্তী লেখকগণ স্পর্শ করতে পারেননি। বঙ্কিম যেরূপ সুকৌশলে ইতিহাস রোমান্স ও বাস্তব জীবনকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন। অদ্ভুদ প্রতিভাবলে তাদের একটা সুন্দর সমন্বয়-সাধন করেছিলেন, তাঁর পরবর্তীদের মধ্যে সেই গুনের একান্ত অভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের পর উপন্যাসে যে গভীরতর বাস্তবতা পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথই তার প্রথম সূচনাকারী। রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার পূর্বজ্ঞান বলে বঙ্কিম প্রবর্তিত উপন্যাসের ধ্বংসোন্মুখতা উপলব্ধি করে উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ও ইতিহাসের চোরাবালি হতে সরিয়ে বাস্তব জীবনের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও প্রাত্যহিক জীবনের সুক্ষ্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণে কাজে লাগিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' এর সূচনাতে জানিয়েছেন 'এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ হতে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম। সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোন বন্ধুর অযত্নকার ক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে..... তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহ বাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য'।[৮] শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' এর সার্বিক মূল্যায়নে বলেছেন, 'এই উপন্যাসে লেখকের মনোবৃত্তি ও কার্যপ্রণালী ঔপন্যাসিকের মত নহে। ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণ উভয়েই নিতান্ত সহজ, অগভীর ও জটিলতা বর্জিত। প্রতাপাদিত্য, বসন্তবায়, উদয়াদিত্য প্রভৃতি সকলেই যেন এক একটি অবিমিশ্র গুণের প্রতিমূর্তি। কোন বিরোধী উপাদানের সমন্বয় তাহাদের চরিত্রকে বৈচিত্রমণ্ডিত করে নাই'।[৯]

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালের বাংলা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের পটভূমি 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের সংক্ষিপ্তাংশ নিম্নরূপ–

রাজা প্রতাপাদিত্য স্বাধীনভাবে যশোর রাজত্ব করছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতৃব্য বায়গড়ের রাজ্য মুঘলদের অধিনতা স্বীকার করে রায়গড় শাসন করেছিলেন। এতে স্বাধীনচেতা প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়ের প্রতি ক্ষুন্ন হন। বাল্যকালে লালন-পালন করা পিতৃব্যের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবণতি ঘটে। কিন্তু তবুও বসন্তরায় যশোরে যাওয়া-আশা বন্ধ

করতে পারতেন না। কারণ তিনি প্রতাপাদিত্যের দুই সন্তান উদয়াদিত্য ও বিভাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন তারা উভয়ে বসন্তরায়ের অনুগত ছিল। এজন্য প্রতাপ বসন্তরায়ের প্রতি আরও বিরক্ত হন। উদয়াদিত্য ছিলেন শান্ত প্রকৃতির ও প্রজাহিতৈষী। সর্বোপরি স্ত্রী সুরমার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা ও নির্ভরশীলতা। এজন্য প্রতাপ পুত্রকে অপছন্দ করতেন এবং বিনা কারণে পুত্র বধুকে দোষারূপ করতেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র ছিল প্রতাপাদিত্যের জামাতা। রামচন্দ্রের সাথেও প্রতাপের সম্পর্ক মধুর ছিল না। একদিন জামাতা তাঁর স্ত্রী বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে নিতে এলে, তাঁর ভাড় রমাই নারীর ছদ্মবেশে তাঁর শাশুড়ীকে অপমান করলে প্রতাপ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে জামাতার শিরচ্ছেদের আদেশ দেন। কিন্তু উদয়াদিত্যের সাহায্যে কৌশলে রামচন্দ্র পলায়ন করতে সমর্থ হন। এ তথ্য জানার পর প্রতাপাদিত্য পুত্রকে কারাগারে বন্দী করেন। পুত্রবধুকে বাপের বাড়ি পাঠাবার নির্দেশ দেন। স্বামী বিচ্ছেদের কষ্ট সইতে না পেরে সুরমা শ্বশুর বাড়িতেই মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে উদয়াদিত্যকে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য সীতারাম ও উদয়াদিত্যের ভক্ত প্রজারা তথায় লাগিয়ে কারাগার থেকে তাকে মুক্ত করে। বায়গড়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এদিকে বিভাকে স্বামীর ঘরে পাঠানোর জন্য বসন্তরায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এই মর্মে একটি পত্র লেখেন যে রামচন্দ্র তাকে চন্দ্রদীপে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। উদয়াদিত্যের বায়গড়ে পলায়নের সংবাদ পেয়ে রাজা প্রতাপাদিত্য ক্রোধে সৈন্য পাঠান তাকে যশোরে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন এবং এতে বসন্ত রায়ের হাত আছে মনে করে তাকে শিরোচ্ছেদ করে হত্যা করেন। উদয়াদিত্য অত্যাচারী পিতার কঠিন হৃদয়ের প্রতি ঘৃনা ও লজ্জায় বিতশ্রদ্ধ হয়ে ভগ্নি বিভাকে নিয়ে রামচন্দ্রের রাজ্য চন্দ্রদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রামচন্দ্রের রাজধানির নিকটের একটি গ্রামে নৌকা ভিড়ানো হলে চারিদিকে লোকসমাগম দেখে বিভার মনে আশংকার জন্ম নেয়। কিছুক্ষন পর রামচন্দ্রের সহচর রামমোহন এসে বিভাকে রামচন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়ের দু:সংবাদ দিলে তার আশংকা সত্যে পরিণত হয়। তবুও বিভার অনুরোধে রামমোহন তাকে রামচন্দ্রের রাজবাড়িতে নিয়ে গেলে তিনি বিভাকে অপমান করে প্রত্যাখান করলে বিভার মুখ নীল হয়ে গেলে দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় রামমোহন বিভাকে নৌকায় তুলে দেয়। উদয়াদিত্য ভগ্নিকে নিয়ে কাশিধামের অভিমুখে যাত্রা করে। রামমোহন ও সীতারাম তাঁদের সঙ্গে অগ্রসর হয়। চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল অদ্যাপি তাহার নাম রহিয়াছে 'বউ ঠাকুরাণীর হাট'। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন।

'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের স্বতন্ত্র স্বরূপটি হচ্ছে অন্যান্য ইতিহাসশ্রয়ী উপন্যাসের মত ঐতিহাসিক ঘটনার কোন বিবৃতিমূলক বর্ণনা নেই। আবার ভূদেব, রমেশ ও বঙ্কিমের মত ইতিহাস খ্যাত চরিত্রকে উপন্যাসের নায়ক হিসাবে

গ্রহণ করেননি বা দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবোধে অনুপ্রেরণা দানকারী চরিত্র রূপেও উপস্থাপন করেননি। রবীন্দ্রনাথ এমন একজন ব্যক্তির শাসনকালকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন যিনি আদর্শ বীর চরিত্র বা দেশহিতৈষী ছিলেন না বরং ইতিহাসে তিনি একজন বিতর্কিত ভূঁইয়া হিসাবে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'বউ ঠাকুরাণীর হাটের' সূচনায় লিখেছেন, "দ্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীর চরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তার ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ের এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনো তার পূজা প্রচলিত হয়নি"।

এ থেকে বোঝা যায় 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত হলেও সেখানে প্রতাপকে কেন্দ্র করে যেটুকু দেশাভিমান ছিল রবীন্দ্রনাথ সেটিও স্বীকার করেননি। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' প্রকাশিত হবার কিছুকাল পূর্ব হতেই বাংলায় স্বদেশী উদ্দীপনা জাগতে থাকে। ঠাকুর বাড়ীতেও এই স্বদেশী প্রেরণার ঢেউ লাগে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেশপ্রীতি ছিল, কিন্তু ছিলনা দেশ উন্মাদনা। সুতরাং তিনি যদি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোনো মহত্ব খুঁজে পেতেন তাকে অবহেলা করতেন না।[১০]

ইতিহাসে আমরা যে প্রতাপের ছবি দেখতে পাই তাহলো তিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেননি বরং তিনি তাদের অনুগত ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি ও পিতৃব্য বসন্ত রায় তাদের প্রভু দাউদ খান করবাণীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ যশোরের জমিদারী লাভ করে। এই বংশের উত্থান শুরু হয় বাংলার কররাণী বংশের শেষ শাসক দাউদ খান কররাণীর পতনের পর। শ্রীহরি দাউদ খানের উজির ছিলেন। তিনি শ্রীহরিকে বিক্রমাদিত্য উপাধি দেন। শ্রীহরির ভাই জানকী বল্লভও বসন্ত রায় উপাধি লাভ করে।[১১] কিন্তু রাজমহলের যুদ্ধের (১৫৭৫) আগে উকিল কতলু খান ও উজির শ্রীহরি বুঝতে পারে দাউদের পতন আসন্ন। তারা গোপনে মুঘল সেনাপতি খান জাহানের সঙ্গে যোগাযোগ করে দাউদের গোপন দলিলপত্র মুঘল সেনাপতি খান জাহানের হাতে তুলে দেয়। এর পুরস্কার স্বরূপ দাউদের পরাজয় ও মৃত্যুর পর শ্রীহরি ও তার ভাই বসন্ত রায়কে যশোরের জমিদারী প্রদান করা হয়। দাউদ খান কররাণীর অর্থ-সম্পদের রক্ষকও এই দুই ভাই ছিলেন। সেগুলিও তারা হস্তগত করে যশোরে নিয়ে আসেন।[১২] শ্রীহরির ছেলে প্রতাপাদিত্যও পিতা ও পিতৃব্যের মত মুঘলদের অনুগত ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের রাজা যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জের কিছু অংশসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। ধন-সম্পদে, যুদ্ধের নৌকায় এবং

অস্ত্রশস্ত্রে তার সমকক্ষ তখন বাংলায় আর কেউ ছিল না। ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে এলে প্রতাপাদিত্য আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ বহু উপহারসহ তার দুত শয়খ বদীকে সুবাদারের নিকট পাঠান এবং তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমনে ইসলাম খান যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যের সহযোগিতা কামনা করলে তিনি সুবাদারকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে মুঘল বাহিনী প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য ও প্রতাপাদিত্য পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পরে প্রতাপাদিত্য মুঘলদের হাতে বন্দী হন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে যে ভুল করেন নিজের জমিদারী ও জীবন উভয়েই দিয়ে প্রতাপকে সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়। তার ক্রিয়াকাণ্ডে তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের চোখেও প্রতাপাদিত্য বাংলার আদর্শ চরিত্র ছিলেন না। তাই মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারে প্রতাপাদিত্যের অসম্মতির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্যই দেখতে পেয়েছিলেন। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অঙ্কন করেছেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১৮৬৯) উপন্যাসের ১ম খণ্ডের প্রতাপের অনুরূপ। নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও ইন্দ্রিয়বিলাসী। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে ইন্দ্রিয়বিলাসী নয় বরং হৃদয়হীন ও নৃশংসতার দিক বেশি পরিস্ফুটিত হয়েছে। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র সাথে মিল যেমন আছে তেমনি কিছু ক্ষেত্রে অমিলও পরিলক্ষিত হয়। প্রতাপচন্দ্রের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের দ্বারা পিতৃব্যকে খুন করার পর হতে কাহিনী শুরু হয়েছে অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে' পিতৃব্য বসন্ত রায়ের হত্যার ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। 'বসন্ত রায় চোখ বুজিয়া ইস্টদেবতার নিকট ভূমিষ্ট হইয়া রইলেন, দক্ষিণ হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন ও কহিলেন 'সাহেব এইবার''। মুক্তিয়ার খাঁ জাকিল "আবদুল"। আবদুল মুক্ত তলোয়ার হস্তে আসিল। মুক্তিয়ার মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত পরেই রক্তাক্ত অসি হস্তে আবদুল গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। গৃহে স্রোত বহিতে লাগিল'।[১৪] 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' এর বিষয়বস্তুর জন্য বঙ্গাধিপ পরাজয়ের নিকট ঋণী হলেও রচনাবীতিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের শৈলীকে গ্রহণ করেছিলেন।[১৫] বঙ্গাধিপ পরাজয়ের লেখক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ স্কটকের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন স্কটের Ivanhoe-এর সপ্তম থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত যে ট্যুর্নামেন্ট ঘটনা আছে তার থেকে হুবহু অনুবাদ 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' আছে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব বঙ্কিমকে অনুসরণ করেছেন।[১৬]

'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র প্রতাপ, কাপুরুষ হীন, বসন্ত রায়ের ছোট রাণী বিমলীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ও দুশ্চরিত্র রূপে চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়গুলি এড়িয়ে গেছেন। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে উদয়াদিত্যে ও তার পত্নী সুরমা প্রসঙ্গ

নেই। সুরমা আছে প্রতাপাদিত্যের কন্যারূপে। অপরদিকে 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে' প্রতাপের কন্যা বিভাকে বিয়ে দিয়েছেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে। সেটি ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনার ফসল। তাই বিভা চরিত্রটি ছিল এত অনবদ্য। বাংলার বার ভূইয়াদের ইতিহাসে রামচন্দ্রের নাম পাওয়ায় রামচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প নারায়নের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী লাভ করেন। যশোরের জমিদার প্রতাপাদিত্যের জামাতা ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় তিনি বাংলার জমিদার ছিলেন। রামচন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতা করে ভুলুয়অর রাজা লক্ষণ মাণিক্যকে হত্যা করেন।[১৭] বসন্ত রায় একজন মহৎ আদর্শ ও ক্ষমাশীল শাসক হিসাবে তিনি চিত্রিত হয়েছেন উভয় উপন্যাসেই। 'যশোর খুলনার ইতিহাস' লেখক শতীশচন্দ্র মিত্র প্রতাপের প্রশংসা করেছেন এবং অসৎকর্মের মধ্যেও দেশপ্রেমিকের মহত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে যে সকল নতুন তথ্য আবিস্কৃত হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতাপাদিত্য চরিত্র ইতিহাস সম্মত বলে মনে হয়। বিশেষ করে আবদুল লতিফের ভ্রমণকাহিনী মিয়া নাথান, স্যার যদুনাথ সরকার ও আবদুল করিম প্রমুখ লেখকদের লেখায় এর সততা পাওয়া যায়।

'বউ ঠাকুরাণীর হাট' এর কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ দুটি নাটক রচনা করেন একটি 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) অপরটি 'পরিত্রান' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী নামে একটি নতুন চরিত্রের সংযোজন ঘটিয়েছেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয় ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চরিত্র। তৎকালীন সময়ে বৃটিশদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রাজনৈতিক নেতা মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের ছায়া লক্ষ করা যায় ধনঞ্জয়ের মধ্যে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ও অন্যায়ের প্রতিবাদকারী হিসাবে গান্ধী সারাদেশে যেভাবে সম্মানিত ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন ঠিক একই সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে নিজের সম্মানজনক পুরস্কার 'নাইট' খেতাব পরিত্যাগ করেছিলেন ভারতীয় জাগরণের সেই দুই কীর্তিমান মহৎ চরিত্রের সমাবেশে যেন এই ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র সংগঠিত।[১৮] ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সামান্য পরিবর্তন সাধন করে 'পরিত্রান' নাটকটি প্রকাশ করেন। এখানেও ধনঞ্জয় রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহায় জনগণের পক্ষে রাজকুমার প্রতাপাদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে সকল বিপদকে উপেক্ষা করে সত্য ও ন্যায়ের আদেশ পালন করে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "নাটক দুখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখা হইলেও ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের আধুনিক কালের রাজনৈতিক অবস্থার ছায়া পড়িয়াছে"।[১৯]

'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসেও আমরা এর ছায়া দেখতে পাই। তবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সামন্ত রাজা প্রতাপাদিত্য প্রজাদের ভয়ভীতি দেখিয়ে অনুগত রাখার রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই যখন দেখতে পান যুবরাজ উদয়াদিত্যের মধ্যে উদার মন ও জনকল্যাণকামী মানসিকতার তখন তিনি মনে করে ভয় পান যে, যুবরাজের দ্বারা রাজ্য শাসন হবে না তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্য হাতছাড়া হতে পারে। ভীতবের ভয়কে তিনি মেকি আবরণের দ্বারা ঢেকে রেখে বলিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপের এই মেকি আবরণ উন্মোচন করতে পেরেছিলেন যেমন- 'এ কুলাঙ্গার ঠিক রায়গড়ের খুড়া বসন্তরায়ের মতো হইবে, সেতার বাজাইয়া নাছিয়া বেড়াইবে ও রাজ্য অধ:পাতে দিবে।[২০]

'বউ ঠাকুরাণী হাটে' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতাপচন্দ্রকে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ও অত্যাচারী রাজা হিসাবে চিত্রিত করলেও এমন কিছু উদ্ধৃতি আছে যা প্রতাপকে বলিষ্ট চরিত্র ও মুঘল বিরোধ। স্বদেশপ্রেমিক ও আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণ শাসক বলে মনে হয়। পিতৃব্য বসন্ত রায় আমার পূজ্যপাদ কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই, তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এমন লোকের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের কোনো সম্পর্ক নাই। ক্ষত হইলে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়; আমার ইচ্ছা যায় রায় বংশের ক্ষত। বঙ্গদেশের ক্ষত ঐ বসন্ত রায়কে কাটিয়া বাচাই।[২১] বসন্ত রায় সম্পর্কে প্রতাপাদিত্যের উক্তি পিতৃব্যের প্রতি নিষ্ঠুরতার বহি:প্রকাশ ঘটলেও বঙ্গদেশকে রক্ষার সংকল্পে নায়োকচিত চরিত্রের অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটেছে। আবার মুঘলদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সাহসী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, "দিল্লীরশ্বর তো আমার ঈশ্বর নহেন। তিনি রুষ্ট হইলে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে এমন জীব যথেষ্ট আছে, মানসিংহ আছে, বীরবল আছে, আমাদের বীরবল আছে, আমাদের বসন্ত রায় আছেন, আর সম্প্রতি দেখিতেছি তুমিও আছ। কিন্তু আত্মবৎ সকলকে মনে করিয়োনা। .... দেখোমন্ত্রী দিল্লীশ্বরের ভয় দেখাইয়া আমাকে কোন কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিও না, তাহাতে আমার নিতান্ত অপমান বোধ হয়"।[২২] এইভাবে প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বরকে বিদ্রুপ, কখোন ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি পুত্র উদয়াদিত্য ও পিতৃব্য বসন্ত রায়ের উপর ক্রোধান্বিত হয়েও তিনি দিল্লীশ্বরকে তাচ্ছিল্য করেছেন, পুত্র তাঁর নামে দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ করতে পারে তাতে প্রতাপাদিত্যের কিছু যায় আসে না। বমাই ভাঁড় স্ত্রীলোক সেজে রাজর্ষিকে অপমান করলে বসন্ত রায় এই ঘটনাকে নেহায়েৎ 'ছেলেমানুষী' বলাতে পিতৃব্যের প্রতি যে ক্রোধ প্রকাশ পায় তার বীর মুঘলদের উপরও বিদ্ধ হয়। 'দেখো পিতৃব্যঠাকুর রায় বংশের কিসে মান-অপমান হয় সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিবে, তবে কি ঐ পাকা চুলের উপর মোগল বাদশাহের শিরোপা জড়াইয়া বেড়াইতে পার। বাদশাহের প্রসাদগরে তুমি মাথা তুলিয়া বেড়াইতেছ বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মাথা একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে। যবন-চরণের মৃত্তিকা তুমি কপালে ফোঁটা করিয়া পরিয়া থাকো। তোমার ঐ যবনের পদধূলিময় অকিঞ্চিৎকর মাথাটা ধূলিতে লুটাইবার সাধ ছিল, বিধাতার

বিড়ম্বনায় তাহাতে বাধা পড়িল।[২৩] উপন্যাসে বিভিন্ন সময় মন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে মুঘল সম্রাট সম্পর্কে যে সাহসী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতে প্রতাপাদিত্যের চরিত্র দেশপ্রেমিক বাঙালির উজ্জ্বল রূপ ফুটে উঠেছে যা একটি স্বাধীনতাকামী জাতিকে লক্ষে পৌছাতে অনুপ্রেরণা যোগায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের তুচ্ছ ও বহিরাগত বোঝাতে 'যবন' এবং ম্লেচ্ছ শব্দের ব্যবহার করা হতো। রবীন্দ্রনাথও 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে'র প্রতাপাদিত্যের অন্তরের ভিতর থেকে 'যবন বিদ্বেষ' প্রকারান্তরে মুসলমান বিদ্বেষ দূরীভূত করতে পারেন নাই।[২৪]

সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোর-খুলনার ইতিহাসের অনেক বিষয় বউ ঠাকুরাণীর হাটে স্থান পেয়েছে, বিয়ে উপলক্ষে রামচন্দ্রের যশোহরে আগমন দেহরক্ষী রামমোহন লাল, রমাই ভাঁড়ের স্ত্রীবেশে মহারাণীর সঙ্গে রসিকতা প্রতাপাদিত্য ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে রামচন্দ্ররে হত্যার আদেশ প্রদান, রামচন্দ্রে পলায়ন এসবই সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর-খুলনার ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সতীশচন্দ্র মিত্র মতে ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের কন্যার সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের (বাকলার) রাজা রামচন্দ্রের বিয়ে হয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এ সময় বসন্তরায় জীবিত ছিলেন। কিন্তু সতীশচন্দ্রের মতে রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিয়ের ৭/৮ বছর পূর্বে মানসিংহ কর্তৃক নিহত হন ১৫৯৪ থেকে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কারণ ১৫৯৯ থেকে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জেসুইট পাদরিগণ এদেশে অবস্থাকালে যশোর রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম দিক ভ্রমন করেন কিন্তু কোথাও বসন্ত রায়ের রাজ্যের কথা বলেননি। যদিও চাঁদ খা চক, সাগরদ্বীপ বসন্ত রায়েরই সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল যেখানে তারা গিয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রতাপচন্দ্র ঘোষের সমালোচনা করেছেন বঙ্গাধিপ পরাজয়ের খুল্লতাতের হত্যার পর তাহার স্ত্রীগণের উপর প্রতাপ কর্তৃক যে সব পাশবিক অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলিয়া বঙ্গাধিপ পরাজয়ের গ্রন্থাকার নবীন বয়সে স্বীয় লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।[২৫] সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতাপাদিত্যের সমস্ত অপকর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন বসন্ত রায়কে হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন এটি প্রতাপের কোষ্ঠীর দোষ, বসন্ত রায় কর্তৃক প্রতাপের প্রাণ নাশের আশংকা, বসন্ত রায় স্বদেশের শত্রু, দেশোদ্রোহী করেছেন। যশোহর-খুলনার ইতিহাস লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র রাজা প্রতাপাদিত্যের সকল দোষত্রুটির পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ উৎঘাটন করে প্রতাপকে স্বদেশ প্রেমিক ও বাংলার একজন আদর্শ বীর পুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তবে যদুনাথ সরকার ভিন্নমত পোষণ করেছেন, æA false provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the Bara Bhuiyas of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort. Firstly, they were nearly all of them upstarts, who had in their own persons – or one generation earlier – grabbed at some portion of the dissolving karrari kingdom of Bengal and set up as masterless Rajas in their

different corners of the country, especially in the inacessible regions of the sea – coast in Khulna and Baqarganj or beyond the mighty barrier of the Brahmaputra in Dacca and the still remoter jungles of north Mymenshingh and Sylhet.

There mushroom captains of plundering bands have been likened to the hereditory chieftains of the Sesoclia and Rathor clans Rajoutana who fought the Mughals in defence of the homes they had bought with the blood of their ancestors through centuries of struggle. The height of absurdity is reached when our dramatists call pratapaditya of Jessore as the counterpart of Mahorana Pratap Singh of Mewar.[২৬]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ইতিহাসের আলোকে দেখিয়েছেন যে, প্রতাপাদিত্যকে সাহিত্যিকরা যেভাবে মেবারের ব্যনা প্রতাপসিংহের সঙ্গে তুলনা করে গৌরবান্বিত করার চেষ্টা করেছেন যশোরের প্রতাপাদিত্য তা ছিলেন না। আবদুল লতিফের ভ্রমণকাহিনী এবং মির্জা নাথানের বাহারিস্থা-ই-গায়বী প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতাপাদিত্য এবং তার পরিবার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। এটি ঘটেছে রবীন্দ্র ঠাকুরের 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' রচনার পর।

বাংলার ইতিহাস জানা অসম্পূর্ণ থাকবে যদি মির্যানাথন-এর বাহারিস্তান-ই-গায়বী পাঠ করা না হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য এবং মূল্যবান দলিল মিরয়া নাথানের বাহরিস্তান-ই-গায়বী। গ্রন্থটিতে বাংলার ইতিহাস এবং বাংলার সঙ্গে সম্পৃক্ত অঞ্চলের ইতিহাস লিখিত হয়েছে। মিরযা নাথন বাংলায় নিযুক্ত মুঘল সেনাপতি ছিলেন। তাঁর সামরিক জীবন বাংলাতেই কাটান। তাই তিনি অন্য কারো রিপোর্ট বা সংবাদের ভিত্তিতে বইটি লিখেনটি, নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন। তিনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন।[২৭]

আবদুল লতীফ তাঁর ভ্রমণ কাহিনী ডায়রীর আকারে লিখেছেন। এই ভ্রমণ কাহিনীতেও বাংলার অনেক মূল্যবান তথ্য রয়েছে। আবদুল লতিফ ছিলেন বাংলার দেওয়ান আব্দুল হাসানের বিশ্বস্ত কর্মচারী। যদুনাথ সরকার সর্বপ্রথম এই পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[২৮] এই দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলার অনেক অজানা তথ্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিগোচর হয়। মির্যা নাথনের বাথরিস্তান-ই-গায়বী হতে জানা যায় প্রতাপাদিত্যের পুত্রদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। পিতার নির্দেশেই উদয়াদিত্য সালকা নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করেন এবং বাংলার

সুবাদার ইসলাম খানের সেনাপতি গিয়াস খান ও মির্যা নাথনের যুদ্ধে অগ্রাভিযানের পথ রোধের চেষ্টা করেন যদিও উদয়াদিত্য মুঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। তবে পিতার আদেশ তিনি নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে পালন করেন। আবার গিয়াস খান ও মির্যা নাথনের নিকট রাজা প্রতাপাদিত্য আত্মসমর্পণের সময়ও পুত্র উদয়াদিত্যের সঙ্গে পরামর্শ করেন।[২৯]

'বউ ঠাকুরাণীর হাট' এর প্রতাপের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন যেভাবে শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিকট ঠিক জীবন্ত ঐতিহাসিক মানুষ নহে – সংসারের নির্মম ক্রুবতা, যাহা আততায়ীর মত আমাদের সুখ-শান্তির কণ্ঠ চাপিয়া ধরে ও আমাদের সুকুমার সৌন্দর্যপ্রবণ বৃত্তিগুলিকে নির্দয়পোষণে পীড়িত করিতে চাহে, তাহারই একটা অস্পষ্ট মূর্তি মাত্র"।[৩০] রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিভাবে উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্পর্কে শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' – এ প্রতাপাদিত্যের রুদ্র মূর্তি ও হিংস্র-ভীষর্ণতা অপেক্ষা বসন্ত রায়ের আনন্দ-বিভোর সরলতা উদয়াদিত্যের ম্লান ও বিষন্ন মুখচ্ছবি ও বিভার করুণ-জীবন-কাহিনী আমাদের মাঝে গভীরভাবে মুদ্রিত থাকে। এই শেষোক্ত চরিত্রগুলি লেখকের গভীর ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার নিজের জীবন পাত্র যে করুণ মধুর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে তাহাই তিনি ইহাদের ভিতরে সঞ্চারিত – যে উদাস বিরহ ব্যথাতুর রাগিণী তাঁহার গীতি কবিতায় এরূপ মনোহরণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রথম কাকলী এই তরুণ বয়সের উপন্যাসে শুনা যায়।[৩১] 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে – রচিত হলেও ইতিহাসের বর্ণবহুল বিচিত্রতা রবীন্দ্রনাথের মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে বিজিত কুমারের বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাসের পাত্রপাত্রীগুলিতে বিশেষ কালের চিহ্ন পর্যন্ত লক্ষ করা যায় না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাত্রপাত্রী সাধারণত ঐতিহাসিক ঘটনার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ব্যক্তি চরিত্রগুলি প্রায়ই বৃহত্তর ঘটনার আবর্তে আবর্তিত হয়। ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেও লেখক ঘটনাগুলির বিশেষ মূল্য দেন। স্থান কাল পাত্রের এই বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান। 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে' রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল স্বতন্ত্র।[৩২] তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের রোমান্সের ঘাটতি পূরণ করেছেন জীবনের অন্তর্মুখী রসপূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সাধারণই হয়ে উঠল অসাধারণ।[৩৩] সকল সমালোচকদের বক্তব্য সম্পর্কে সতর্ক থেকেও বলা যায় 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে'র চমৎকারী ও বিস্ময়কর এলাকা সেইগুলি – যেখানে রবীন্দ্রনাথ বেদনার্থ অনুভূতিময় ও অতিসংবেদনশীল উদয়াচিত্য কিংবা বিভোর দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবনকে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে চেতনামগ্ন নবতর বাস্তবতায় তরঙ্গিত করে তুলেছেন।[৩৪]

ivRwl

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রাজর্ষি উপন্যাসটির উপাদানও ঐতিহাসিক। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ পরিবারের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসটি। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের জীবন আদর্শ, অতি সাধারণ জীবনাচারণ, বলিদান বিরোধী রাজার দেবমন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও বৈমাত্রিয় ভাই নক্ষত্র রায়ের রাজ্য লাভের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজর্ষির প্রেরণা স্বপ্নলব্ধ বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবন স্মৃতিতে। 'স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্ত চিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, একী! এ যে রক্ত" বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাইরে রাগের ভান করিয়া কোনমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে – জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। .... এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ্য গোবিন্দ মানিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে 'বালকে' বাহির করিতে লাগিলাম।'[৩৫]

'রাজর্ষি' উপন্যাসটি জ্ঞানদানন্দী সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'বালকে' ১২৯২ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[৩৬] 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নামকরণের[৩৭] সার্থকতা ফুটে উঠেছে রাজা গোবিন্দমানিক্যের ঋর্ষির ন্যায় জীবন যাপনে। যা রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। 'রাজর্ষি'তে ইতিহাস এসেছে দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের শাসনের শেষ সময়ে সংঘটিত চার পুত্রের (দারা, আওরঙ্গজেব, সুজা ও মুরাদ) দ্বন্দ্বের পটভূমিকায়। সেইসময় বাংলার সুবেদার ছিলেন শাহ সুজা। পুরোহিত রঘুপতি ও নক্ষত্র নারায়ণ নিজরাজ্যে পুন:প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সুজার সাহায্যপ্রার্থী, যারা ত্রিপুরায় রাজা গোবিন্দ-মানিক্য কর্তৃক ছিলেন নির্বাসিত। এই ইতিহাসের অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন চার্লস স্টুয়ার্টে এর হিস্টরি অব বেঙ্গল থেকে। তিনি নিজেই 'রাজর্ষি' উপন্যাসের ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে তা উল্লেখ করেছেন। যেখানে বর্ণিত আছে আওরঙ্গজেবের সৈন্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পলায়ন করা। এলাহাবাদের যুদ্ধক্ষেত্রে শাহ সুজা পরাজিত হয়ে ঢাকায় পলায়ন ও অবশেষে সুদৃঢ় চট্টগ্রাম বন্দরে এসে জাহাজে মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। উপন্যাসে উপসংহারের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শেষ দুটি 'প্যারাগ্রাফ' কৈলাশচন্দ্র সিংহের ত্রিপুরার ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত।

যে 'বালক' পত্রিকায় 'রাজর্ষি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেই পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষির রচনার পূর্বে 'মুকুট', 'হেয়ালি নাট্য' কাজের লোক প্রভৃতি রচনা প্রকাশ করেছিলেন যেগুলিতে তাঁর জাতীয় জাগরণ, স্বদেশ প্রেম ও ইতিহাসবোধের মানসিকতার বহি:প্রকাশ ঘটেছিল। সে সময় দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল দ্বন্দ্বময়। ১৮৭৬

খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই সংগঠনটির নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনের সমালোচনামূলক রাজনৈতিক আলোচনা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।[৩৮] হাইকোর্টের বিচারাধীন একটি মামলা সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ তার 'বেঙ্গল' পত্রিকায় সমালোচনা করলে আইন অবমাননার দায়ে তাকে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে দুই মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এতে ইংরেজদের সঙ্গে এদেশবাসীর রাজনৈতিক বিরোধ আরও তীব্র হয়। দেশবাসীর সম্মিলিত অংশগ্রহণে আন্দোলনকে সঙ্গবদ্ধ করার জন্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে কলকাতায় 'ন্যাশনাল লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' কলকাতায় জাতীয় মহাসমাবেশ আহ্বান করেন। আনন্দমোহন বসুও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই সভার অধিবেশন চলেছিল তিন দিন পর্যন্ত।[৩৯]

ভারত উপমহাদেশে যখন জনগণের মধ্যে এইরূপ রাজনৈতিক সচেতনতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তখন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মকর্তা এ. ও হিউম ভারতীয়দের ন্যায্য দাবীর প্রতি সমর্থন দেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে হিউম লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে পরামর্শ করে এদেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বহি:প্রকাশ ঘটার উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৮৫ খিস্টাব্দে বোম্বাইতে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 'বোম্পাই' প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন এর নেতৃত্বে সভাটি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার নাম হলো 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'।[৪০]

সফল প্রদেশের রাজনৈতিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল এই সংগঠনটি। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে, যারা বিগত দশ বৎসর যাবৎ বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা রূপে সুপরিচিত ছিলেন, যেমন সুরেন্দ্র নাথ, আনন্দ মোহন ও শিশির কুমার তাঁদের অধিবেশনে আহ্বান করা হয়নি। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে বাঙালি নেতাদের না দেখতে পেয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ–
শুনিতে পেয়েছি ওই–
সবাই এসেছে লইয়া নিশান
কইরে বাঙালি কই।[৪১]

রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসে বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরার ইতিহাসের সংমিশ্রন ঘটিয়ে কাহিনীর বিন্যাস করেছিলেন। এর একটি কারণও ছিল। তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকার সহ-সম্পাদক ত্রিপুরার ইতিহাস লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। যার ফলে তিনি তাঁর কাছ থেকে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস, সেখানকার সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। যা থেকে পরবর্তীতে 'রাজর্ষি' রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।[৪২] 'রাজর্ষি' উপন্যাসের **১ম** খণ্ডের বিষয়বস্তু ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মানিক্যের কাহিনী আর ২য় খণ্ড বাংলার মুঘল সুবেদার ও সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। 'রাজর্ষি'র কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মানিক্যের ছোট মেয়ে হাসির মৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে ভূবেনেশ্বরী মন্দিরের বলিদান প্রথা রহিত করেন। কারণ বলিদানের রক্ত দর্শনে অসুস্থ হয়ে হাসি মৃত্যুবরণ করে। জীববলি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি ক্রুদ্ধ হয়। ধর্মের ব্যাপারে রাজার হস্তক্ষেপকে অনধিকার চর্চা মনে করে রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। গোবিন্দ মানিক্যের ভাই নক্ষত্র রায়কে সিংহাসন লাভের প্রলোভন দেখিয়ে রাজাকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও দুর্বল মনের অধিকারী নক্ষত্ররায় রাজহত্যায় অসম্মত হন। কিন্তু রঘুপতির প্ররোচনায় গোবিন্দ মাণিক্যের পালক পুত্র ধ্রুবকে অপহরণ করে মন্দিরে নিয়ে যায় দেবি সম্মুখে বলিদানের জন্য। রাজা এই সংবাদ পেয়ে মন্দিরে গিয়ে ধ্রুবকে উদ্ধার করে এবং রঘুপতি ও নক্ষত্র রায়কে নির্বাসনের আদেশ দেয়। রঘুপতি মন্দিরের সেবক রাজসিংহকে রাজা গোবিন্দ মাণিক্যকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করে। কিন্তু জয়সিংহ তা না করে নিজেই মন্দিরে দেবির সামনে আত্মহত্যা করে। ঘটনাটি ঘটে রঘুপতির নির্বাসনের পূর্বরাত্রে। নির্বাসিত হওয়ার পর রঘুপতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠে এবং রাজ্যকে শায়েস্তা করার জন্য রাজমহলে গিয়ে শাহ সুজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং কৌশলে তাঁকে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণে রাজী করান। রঘুপতি নির্বাসিত নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে নিয়ে মুঘল বাহিনীসহ গোবিন্দ মানিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করেন। নিজের কনিষ্ঠ ভাই নক্ষত্র রায় মুঘল সৈন্য সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে শুনে রাজা অত্যন্ত মর্মাহত হন। ভাইয়ের রক্তে রাজ্য কলঙ্কিত না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সন্ন্যাস জীবন-যাপনের উদ্দেশে রাজ্য ত্যাগ করে সুদূর চট্টগ্রামে বানবাসী হন। এদিকে নক্ষত্র রায় ছত্রমাণিক্য উপাধি নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরই শাসন পরিচালনার ব্যাপারে রঘুপতির হিতোপদেশ উপেক্ষা করলে নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। এতে রঘুপতি অপমানিতবোধ করে এবং অনুতপ্ত হয়ে ভগ্নহৃদয়ে গোবিন্দ মানিক্যের নিকট চট্টগ্রামে চলে যায়। সেখানে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে গোবিন্দ মানিক্যের সঙ্গে বসবাস করে। এদিকে শাহ সুজা বিনা অপরাধে রাজাকে রাজ্যত্যাগী করার জন্য দুঃখ

প্রকাশ করেন এবং তাঁর নিজের ভাই কর্তৃক রাজ্য হতে বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা বলেন। এরপর উভয়ে কোলাকুলি করে শাহ সুজা গোবিন্দ মানিক্যের নিকট আত্মসর্ম্পণ করেন। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে আদর্শগত দ্বন্দ্ব উপস্থাপনের পাশাপাশি ত্রিপুরা ও মুঘল বংশের ইতিহাস এসেছে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে। রবীন্দ্রনাথ দুইটি বংশের মধ্যেকার ভ্রাতৃবিরোধের চিত্র তুলে ধরেছেন।

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জাঁকজমকশালী আডম্বরপূর্ণ ও গৌরবের শীর্ষ স্থানের অধিকারী ছিলেন সম্রাট শাহজাহান। আকস্মিকভাবে জীবনের শেষ সময়ে তিনি নিঃস্ব ও শোচনীয় কারাবন্দিত্ব বরণ করতে হয়। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি অসুস্থ হলে তার পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মুঘল ইতিহাসে যা ছিল একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। দিল্লীর সিংহাসন লাভকে কেন্দ্র করে সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে এবং এতে সুজার জীবনে যে করুণ পরিণতি নেমে আসে তার বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাসে। অপরদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা গোবিন্দ মানিক্য ও তাঁর ভাই নক্ষত্র রায়ের বিরোধের মধ্যে একটি মিল খোঁজার চেষ্টা করেছেন। শাহ সুজা ও গোবিন্দ মানিক্য উভয়েই রাজ্য হতে পালিয়ে চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। মুঘল সুবেদার শাহ সুজা ভাই আওরঙ্গজেব কর্তৃক রাজ মহল হতে বিতাড়িত। অপরদিকে রাজা গোবিন্দ মানিক্যও ভ্রাতৃবিরোধের কারণে ঋষিবেশ ধারণ করে রাজ্য ত্যাগ করেন। এই দুই রাজবংশের ইতিহাসে ভ্রাতৃবিরোধের শুরু স্বরূপ ও কারণ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ছিল একটিই রাজ্য লাভ। এদিক থেকে 'রাজর্ষি'তে মুঘল ইতিহাসের সাথে ত্রিপুরার ইতিহাসের ব্যবহার যথার্থ বলে মনে হয়।[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ আদর্শগত দিক থেকে দুটি ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে যে ভিন্নতা আছে তা তিনি 'রাজর্ষি' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে গোবিন্দ মানিক্য ও নক্ষত্র রায়ের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তা মন্দিরের জীব হত্যা বিষয়ক আদর্শগত জটিলতাকে নিয়ে। যদিও পরবর্তীতে তা সিংহাসন লাভের মধ্য দিয়েই শেষ হয়। অপরদিকে মুঘল ইতিহাসে ভ্রাতৃবিরোধ শুরু হয়েছে সরাসরি সিংহাসন লাভকে কেন্দ্র করে। গোবিন্দ মানিক্যের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে চিত্রিত করার জন্য সমসাময়িককালের মুঘল ইতিহাসের সার্থক অবতারণা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেণ ভূ বনেশ্বর মন্দিরে নয়বলি ও জীবহত্যার মত নিষ্ঠুর ধর্মীয় প্রথার বিলোপ সাধন করে রাজ্যে শন্তি প্রতিষ্ঠিত করতে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার রক্তে হাত না রাঙ্গিয়ে তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে সন্নাস জীবন-যাপনকে বেছে নিয়েছিলেন এসবই রাজা গোবিন্দ মানিক্যকে বরেণ্য করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রনাথ গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন "ত্রিপুরার প্রান্তে মন্দিরের কোণে" মোঘল রাজ্যের সংবাদ বড়ো পৌঁছিত না। এই নিমিত্ত রঘুপতি ঢাকা শহরে গিয়া মোঘলদিকের রীতিনীতি ও রাজ্যের অবস্থা জানিতে কৌতুহলী হইলেন। তখন মোঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। তখন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরংজীব দক্ষিণাপথে বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাংলার অধিপতি ছিলেন; রাজমহলে তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ট পুত্র কুমার মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা। জ্যেষ্ঠ্য যুবরাজ দারা রাজধানী দিল্লীতেই বাস করিতেছেন। সম্রাটের বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া দারার উপরেই সাম্রাজ্যের ভার পড়িয়াছে। তখন ভারতবর্ষে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে যে, শাহজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ান। এই সংবাদ পাইবামাত্র সুজা সৈন্যসহিত দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। সম্রাটের চারি পুত্রই মুমুর্ষ শাজাহানের মাথার উপর হইতে মুকুটটা একেবারে ছোঁ মারিয়া উড়াইয়া লইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন।[৪৪]

রঘুপতি রাজমহল ত্যাগ করে সুজার অন্বেষণে বের হলে তিনি দেখতে পেলেন, 'পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যরা যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার উভয় পার্শ্বে কেবল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে। সৈন্যরা অশ্ব ও হস্তি পালের জন্য অপক্ক শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কৃষকের মরাইয়া একটি কণা অবশিষ্ট নাই। চারিদিক কেবল লুণ্ঠনবশিষ্ঠ বিশৃঙ্খলা'। অধিকাংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছে।[৪৫]

পথ চলতে চলতে রঘুপতি মুঘল ইতিহাসের উত্তরাধিকার যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিলেন। সুজাকে দমন করার জন্য দারা পুত্র সুলেমান ও রাজ জয়সিংহকে প্রেরণ। তুমুল যুদ্ধে সুলেমান ও জয়সিংহের নিকট সুজার পরাজয়। পরাজিত সুজার রাজধানী রাজমহলে ফিরে এসে নতুন উদ্যোমে সৈন্য সংগ্রহ করার প্রস্তুতি গ্রহণ। দারাকে পরাজিত করে আওরঙ্গজেবের দিল্লীর সিংহাসন দখল। আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহাম্মদের সুজার পক্ষে যোগদান এবং তাঁর কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া। আবার ঢাকায় আওরঙ্গজেবের মুহাম্মদকে লেখা পত্রসহ চরের ধরা পড়া, পরবর্তীতে সুজার মুহম্মদকে ভূল বোঝা এই সব ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি তিনি তার 'রাজর্ষি'তে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সুজার ঐতিহাসিক চরিত্র অঙ্কন করেছেন চার্লস স্টুয়ার্টের বর্ণনানুযায়ী। উপন্যাসের অপরাপর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও স্টুয়ার্টের অনুকরণে লেখা যা লেখক নিজেই বলেছেন 'ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে'। মুঘল ইতিহাসের ভাগ্য বিড়ম্বিত চরিত্র শাহ সুজা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উপন্যাসে সুজার জীবনের এই বিষাদময় করুণ চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন এলাহাবাদের নিকট যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সেনা কর্তৃক পরাজিত হয়ে ছদ্মবেশে পালিয়ে পাটনায় পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন। আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহাম্মদ সৈন্যসহ পাটনা আক্রমন করলে সুজা পাটনা ছেড়ে

মুঙ্গেরে পলায়ন করেন। এদিকে আওরঙ্গজেব কুমার মুহাম্মদের সাহায্যে তাঁর বিচক্ষণ সেনাপতি মীর জুমলাকে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ মুঙ্গেরে সুজার পিছু ধাওয়া করলে তিনি সেখান থেকে পরিবার পরিজন ও সেনা সামন্ত নিয়ে রাজমহলে পলায়ন করেন। কিন্তু মীর জুমলা ও মুহাম্মদের সম্মিলিত বাহিনী রাজমহল অভিমুখে যাত্রা করলে সুজা ছয়দিন প্রাণ-পণে যুদ্ধ করেন। অবশেষে নিরূপায় সুজা ঝড়ের রাত্রিতে অন্ধকারে পরিবার পরিজন নিয়ে নদী পার হয়ে তান্ডায় পলায়ন করেন।

উপন্যাসে বর্ণিত যুদ্ধের এই অংশটি ইতিহাস সমর্থিত। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদের নিকট খাজওয়ার যুদ্ধে শাহ সুজা আওরঙ্গজেবের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে মীর জুমলা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলে তিনি আরাফানের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং এরপর তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। [৪৬] তবে যদুনাথ সরকারের বর্ণনায় জানা যায় যে, জান্ তারক নামে হল্যান্ডের এক বণিক আরাকান হতে আওরঙ্গজেবকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আরাকানে মুঘল ও পাঠান অধিবাসীদের প্ররোচনায় সুজা আরাকানের রাজাকে হত্যা করে আরাকান সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশিত হলে সুজা নিকটস্থ জঙ্গলে পলায়ন করেন। ম্যারা এই দুর্ভাগা শাহজাদার পশ্চাধাবন করে এবং তাঁর দেহ খন্ড-বিখন্ড করে হত্যা করে।[৪৭] আওরঙ্গজেবে পুত্র মুহাম্মদের পরিণতিও ছিল করুণ। মীর জুমলার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে তিনি সুজার পক্ষাবলম্বন করলে মুহাম্মাদকে আজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় এবং তিনি ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

'রাজর্ষি' উপন্যাস পাঠ করে এই ধারণা পোষণ করা যায় যে, রবীন্দ্র মানসের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল মুঘল ও ত্রিপুরা রাজবংশের ভ্রাতৃবিরোধের চিত্র। মুঘল ইতিহাসে ভ্রাতৃবিরোধের কারণে সুজার যে করুণ অবস্থা হয়েছিল, ত্রিপুরার ইতিহাসে ভ্রাতৃবিরোধের ফলে গোবিন্দমাণিক্যেরও একই অবস্থা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ উভয়ের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে চরিত্রের মিল অমিল বর্ণনা করেছেন। ফকিররূপী সুজা এবং ঋষি রূপ ধারণকারী গোবিন্দমানিক্য উভয়েই যখন একে অপরের মুখোমুখি হলেন তখন গোবিন্দ মানিক্যের মনে হলো এই ফকির নিজের সমস্ত বাসনা বিসর্জন দিয়ে মহৎ উদ্দেশ্যে জগতের কাজ করতে বের হয়নি বরং তাঁর বাসনা পূর্ণ হয়নি বলে রাগ করে সমস্ত জগতের প্রতি বিমুখ হয়ে বের হয়েছেন। অপরদিকে ঋষিরূপী গোবিন্দ মানিক্যকে দেখে সুজার মনে হয়েছে তিনি সবকিছু ত্যাগ করেছেন তবুও সবই যেন তাঁর। কিছুই চাননি বলেই যেন সব পেয়েছেন। উভয়েই যে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের স্বীকার এবং ভ্রাতৃবিরোধের কারণে সিংহাসনচ্যুত হয়ে নিজের দেশ হতে বিতাড়িত। গোবিন্দ মানিক্য

নক্ষত্ররায় কর্তৃক এবং সুজা আওরঙ্গজেব কর্তৃক। এভাবে ঔপন্যাসিক বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ও ক্ষুত্র ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের উপসংহারে ছয় বৎসর রাজত্ব করার পর ছত্র মানিক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দ মানিক্যের নিজ রাজ্যে ফিরে এসে পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া দেখিয়েছেন। আর সুজার শোচনীয় পরিণতি উল্লেখ করেছেন। গোবিন্দ মানিক্য সুজাকে 'যানাদি' ও অনেক অনুচরসহ তাঁর বন্ধু আরকান রাজের দরবারে প্রেরণ করেন। বিদায়ের সময় সুজা বহু মূল্যবান তরবারি গোবিন্দ মানিক্যকে উপহার স্বরূপ দান করেন। তবে সুজার দুর্ভাগ্য যে আরাকান রাজা সুজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করে এবং সুজার কনিষ্ঠ কন্যাকে বিয়ে করে। এদিকে গোবিন্দ মানিক্য সুজার নাম চিরস্মরণীয় করার জন্য তিনি তরবারের বিনিময়ে বহু অর্থ বিনিময়ে কুমিল্লা নগরীতে একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ নির্মাণ করান যা এখনও কুমিল্লাতে সুজা মসজিদ নামে পরিচিত। অপরদিকে গোবিন্দ মানিক্যের যত্নে মেহের কুল আবাদ হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মনদের অনেক জমি তাম্রপত্রে সনন্দ লিখে দান করেন। কুমিল্লার দক্ষিণে বাতিসা গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করেন। আরও অনেক জনহিতকর কাজ-কর্ম করার পরকল্পনা ছিল কিন্তু শেষ করতে পারেননি বলে অনুতপ্ত হয়ে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে কল্যাণ মানিক্য ত্রিপুরার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর সময় বাংলার সুলতান শাহ সুজা ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন।[৪৭] ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে কল্যাণ মানিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ মানিক্য ত্রিপুরা রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এতে তার কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাই নক্ষত্র রায় অসন্তুষ্ট হন এবং সুলতান সুজার সাহায্যে উপর্যুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করে গোবিন্দ মানিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। গোবিন্দ্র মানিক্য ভ্রাতৃবিরোধের অবশ্যম্ভাবী অশুভ ফলের কথা চিন্তা করে স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করেন। চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। নক্ষত্র রায় সুজার অধিনতা স্বীকার করে ছত্র মানিক্য নাম ধারণ করে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৪৯] কৈলাশচন্দ্রসিংহ লিখেছেন, ছত্রমানিক্য যখন তাঁর ভাই গোবিন্দ মানিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন তখন ভারত ভূমি আর এক ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল।

আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে শাহ সুজা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানি রাঙামাটি থেকে পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে গোবিন্দ মানিক্যের বাসভবনে পৌছান।[৫০] গোবিন্দ মানিক্য তাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন। সুজা বিদায়ের সময় কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তার ব্যবহৃত বহুমূল্যবান 'নিমর্চা' তরবারি ও হীরার অঙ্গুরীয়

উপহার দেন। এ সবই ত্রিপুরার ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আরও উল্লেখ আছে, সুজা যখন আরাকান রাজ্যে পৌছান আরাকান অধিপতি সুন্দ-সু-ধর্ম্ম সুজার কনিষ্ঠ কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সুজা অস্বীকার করলে তাঁকে হত্যা করে আরাকান রাজা তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন। এদিকে ছত্র মানিক্যের ছয় বৎসর রাজত্ব করার পর মৃত্যুবরণ করলে পুনরায় গোবিন্দ মানিক্য ত্রিপুরার রাজা হন এবং হতভাগ্য সুজার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করার জন্য কুমিল্লাহ নগরীর নিকট গোমতি নদীর তীরে সুদৃশ্য সুজা মন্দির নির্মাণ করেন। সুজার দেওয়া মূল্যবান তরবারি বিক্রির অর্থের বিনিময়ে। সুজা মসজিদ নির্মাণের অপর একটি মত হলো সুজা ত্রিপুরা রাজ্য জয় করে বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য সুজা মসজিদ নির্মাণ করেন।

দেব-দেবীর পুজার্চনায় বলিদান, শাস্ত্রাপুসারে দেবতার নামে জীববলি ত্রিপুরা রাজবংশের চিরাচরিত প্রথার কথা শাস্ত্রে আছে। ইতিহাসগতভাবে এইসব ঘটনার ভিত্তি সুদৃঢ় না হলেও ধর্ম ও বলিদান প্রথা সম্বন্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজবংশের সংশ্লিষ্টতা স্বীকৃত।[৫২]

রবীন্দ্র মানসে ইতিহাস চেতনা এসেছে বলিদান প্রথার মত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। ঊনিশ শতকের শেষে হিন্দু পুনর্জাগরণের যুগে সামাজিক প্রয়োজনে এই প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান ছিল যুক্তিযুক্ত। তাইতো তিনি এই কুসংস্কার প্রথার বিরুদ্ধে গোবিন্দ মানিক্যকে উপস্থাপন করেছেন। যাঁর নিকট রক্ষণশীল রঘুপতি উদারনৈতিক ও বিপ্লবী বিল্বন আত্মসমার্পণ করে মানবতাবাদের নতুন দিক উন্মোচন করেছেন।

Z_¨ wb‡‘k

১. ড. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃ. ২০৮

২. ড. আনিসুজ্জামান, রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), সুডেন্ট ওয়েজ বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৩৭৫। রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা ঃ একটি দিক, পৃ. ৫২৭

৩. দিলওয়ার হোসেন, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩৮২

৪. ড. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৬

৫. ড. বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

৬. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. ১৩৯

৭. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৮. 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' রবীন্দ্রনাথ রচিত, সূচনা, চৈত্র ১৩৪৬

৯. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

১০. ড. বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

১১. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (মুঘল আমল), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭, প্যারিদাস রোড, ঢাকা, পৃ. ৪৭

১২. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (মুঘল আমল), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

১৩. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (মুঘল আমল), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩-২৬৫

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বউ ঠাকুরাণীর হাট', ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৮

১৫. ড. বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫

১৬. ড. বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫

১৭. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

১৮. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি-রশ্মি, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৭৮, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২, পৃ. ১১৪

১৯. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বউ ঠাকুরাণীর হাট', কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

২১. 'বউ ঠাকুরাণীর হাট', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৬

২২. 'বউ ঠাকুরাণীর হাট', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

২৩. 'বউ ঠাকুরাণীর হাট', পূর্বোক্ত, দশম পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৭

২৪. কালী প্রসন্ন সেন, রাজমালা সম্পাদিত, আগরতলা, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ, প্রথম লহর, পৃ. ২৬৬

২৫. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, যুগীপাড়া বাইলেন, কলিকাতা-৬, পৃ. ২৮০

২৬. Sir Judu Nath Sarkar, The History of Bengal, vol. 11, published by the University of Dacca, p. 225

২৭. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬, ১১

২৮. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

২৯. মির্যা নাথন, বাহারিস্তান-ই-গায়বী, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১১৭, ১২৭-১৩০

৩০. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৩১. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৩২. ড. বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯-২২০

৩৩. কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, পৃ. ৫৮-৫৯

৩৪. সৈয়দ আকরাম হোসেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১১০

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, বিদ্যালয়-পাঠ্যসংস্করণ, মুনমুদ্রণ, ১৩৮১, পৃ. ১৪৫

৩৬. দিলওয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০২

৩৭. ৬০ বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

৩৮. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃ. ৫৮৪

৩৯. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, ২২/১ বিধান স্মরণী, কলিকাতা-৬, পৃ. ৬৮

৪০. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১-৭২

৪১. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৪২. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবনী', ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থমালা, ২-বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. ১৬৫

৪৩. ড. বিজিত কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

৪৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, রাজর্ষি, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৯৭

৪৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোক্ত, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৯৭

৪৬. প্রফেসর এ. কে. এম. আবদুল আলীম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ২৬১

৪৭. Jadunath Sarkar, History of Auranzib, vol. II, July 1912, Calcutta, P. 187

৪৮. শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩, পৃ. ৪৭৫

৪৯. কৈলাশচন্দ্র সিংহ, রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, যোগেশচন্দ্র সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৩, আশ্বিন, পৃ. ৮০

৫০. কৈলাশচন্দ্র সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৫১. কৈলাশচন্দ্র সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৫২. দিলওয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬-৪২৭

Dcmsnvi

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালির ইতিহাসচেতনার ক্ষেত্রে এক স্বর্ণযুগ। দীর্ঘকালের পশ্চাৎপদ সমাজ-কাঠামোতে পাশ্চাত্য-শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চা মানুষের মেধা, জ্ঞান, সমাজ ভাবনা ও ইতিহাস চেতনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন ঘটায়। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ভব ঘটে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ উপন্যাসিক এ সময় উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। শেষোক্ত জন ছাড়া বাকি সকলেরই ঔপন্যাসিক প্রতিভার সাধনা ও সিদ্ধি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সঙ্গত কারণেই রেনেসাঁসীয় নবচেতনার অভিঘাতে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিভাবনার সমান্তরালে ইতিহাস ভাবনা বহুবিদ প্রশ্ন, পরীক্ষা ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। এই দ্বন্দ্বময় প্রেক্ষাপটেই বাঙালি ঔপন্যাসিক রচনা করেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস, যেখানে তাঁদের ইতিহাসভাবনা, সমাজদৃষ্টি ও শিল্পমানসের প্রকাশ ঘটেছে ।

স্বদেশপ্রেম, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতনতা, জাতীয়তাবাদী চেতনা, আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন, প্রভৃতি নানাবিধ চিন্তাধারার নবরূপে বিকাশ ঘটতে দেখা যায় এ সময়। ঊনিশ শতকে এগিয়ে চলা একটি জাতির ইতিহাসবোধের স্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায় এই সমস্ত রচনায়। জেগে উঠা একটি জাতির জন্য ইতিহাসচেতনা যে তার নবচেতনার প্রথম ধাপ আলোচিত উপন্যাসগুলি তার প্রমাণ। আর চেতনা প্রধানত পরম্পরা ও পরিবর্তনের tradition and change এটি বললে ধারণাটি আরও স্পষ্টতর হয়। এই মতবাদটি সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের।[১]

দেশকালবদ্ধ সামাজিক মানুষের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল যারা অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের বর্তমানকে জানতে ও বুঝতে চান ভবিষ্যৎ জীবনকে কিছুকটা লক্ষণ ও নিশানা দেবার জন্য তাঁরা তা পরম্পরা-পরিবর্তন চেতনার বশেই করে থাকেন। তাঁদের অতীতকে জানতে বুঝতে চাওয়ার অকথিত প্রেরণাই হচ্ছে কখন এবং কী উপায়ে পরম্পরা বা পরিবর্তনের চেতনা কম-বেশী সক্রিয় হয়েছে তা বিশদভাবে জানা ও বুঝা। বুদ্ধির এই ক্রিয়াই তাকে সদাপ্রবাহমান ইতিহাসের ক্রম বা historical process বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু সৃজনশীল মানুষের কাছে শুধু 'ইতিহাসের ক্রম' জানাই যথেষ্ট নয়। তিনি জানতে চান কেন ঘটেছে। তার কারণ অনুসন্ধান করতে এবং তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে। বুদ্ধির এই ক্রিয়াই তাকে সাহায্য করে ইতিহাসের ব্যাখ্যা বা historical explanation খুঁজে পেতে। এই ঐতিহাসিক পর্যক্রম ও কার্যকারণ সম্বন্ধ উৎঘাটন করাই সার্থক ঐতিহাসিকেরা প্রধান উদ্দেশ্য বা কাজ। পরম্পরা একান্তই কালচেতনা নির্ভর। বস্তুত কালচেতনা ইতিহাস চেতনারই অংশ।[২]

পাশ্চাত্য ইতিহাস ও সমাজ চিন্তায় Progress বা প্রগতি সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, সেই কাল ধারণার বশেই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের দেশকালবদ্ধ মানব সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাখ্যা করেন। পাশ্চাত্য কালভাবনা ও Progress ভাবনা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আধুনিক ভারতীয় মানসে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজী tradition কথাটির ভারতীয় প্রতিশব্দ 'পরম্পরা'। সুদূর অতীত থেকে সদ্য অতীত পর্যন্ত যা কিছু উত্তরাধিকার মানুষের সে সমস্তই পরম্পরা। কাল প্রবাহের সাথে প্রাকৃতিক নিয়মেই ঐতিহ্যের আকৃতি-প্রকৃতি, অর্থ-ইঙ্গিত বদলায়। সৃজনশীল লেখকের উদ্ভাবন ক্রিয়ার মধ্যে নিহিত থাকে নানা সংগ্রাম ও বিরোধ, নানা পরীক্ষা ও নিরীক্ষা। সমসাময়িক কালের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মানুষের চিন্তাভাবনা থেকে শুরু করে ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মের এই প্রক্রিয়াগুলি কালের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মানুষের মনন, কর্মের প্যাটার্ন ও চরিত্র দান করে। কালের চক্রাবর্তে এমন কখনও-কখনও ঘটে যে যখন কোনো বিশেষ দেশের, বিশেষ কালের মানবগোষ্ঠী একান্তভাবে কূলনির্ভর হয় তখন মনে করে যে সমাজ ও রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার তারা পেয়েছে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে পচন ধরেছে এবং এর ফলে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তখন তারা সেই সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমূলে উপড়ে ফেলে দিতে চায়। ইতিহাসে এর নাম Revolution বা বিপ্লব।[৩]

উত্তরাধিকার একদিকে যেমন সমাজ শক্তির উৎস তেমনি অন্যদিকে দুর্বহ ভারও, যার চাপে সমাজদেহ নুয়ে পড়তে পারে। আর ভারতবর্ষের মত চার-পাঁচ হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস সজ্ঞানে সচেতনে ও সক্রিয়ভাবে বহন করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। উত্তরাধিকার মূল্যায়ন করার নিয়ম অনেকটা জৈবিক নিয়মের মত। ফুল-ফল-শস্য চাষ করার সময় চাষী পরীক্ষা করে দেখেন কোন্ কোন্ বীজের সৃষ্টি ক্ষমতা অক্ষুন্ন আছে সেগুলি বপন বা রোপন করে। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও সেরূপ। ভূদেব, বঙ্কিম, রমেশ, রবীন্দ্রনাথ ও মীর মশাররফ উত্তরাধিকারের সেই সচল অংশই তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। সেখানে অনিবার্যভাবে এসে উপস্থিত হয়েছে মারাঠা, রাজপুত ও মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ এবং ১০ই মহররমে সংঘঠিত কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। আবার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রসঙ্গে এসেছে মুঘল-পাঠান বিরোধ এবং বাঙালির প্রতিরোধের ইতিহাস।[৪]

বাংলা উপন্যাস ইতিহাসের অঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। তিনি যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা শুরু করেন তখন বাঙালির মানসপটে জাতীয়ভাবের সুর ছিল নরম। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনা বাঙালি মনে নবজাগরণের সূচনা করেছিল মাত্র। তাই তখনও মুঘলদের প্রতিপক্ষ করে হিন্দুদের বাহুবল প্রদর্শনের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। আবার তিনি কল্পিত কাহিনী অবতারণার

মাধ্যমে যেমন আওরঙ্গজেবের কন্যা রওশন আরার সঙ্গে শিবাজীর প্রেমের গভীরতা প্রদর্শনের দ্বারা যে মানবতাবাদী চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেখানে মুঘলদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাই ফুটে উঠেছে। এদিক থেকে বিচার করলে ভূদেবের রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে মুঘল বিদ্বেষী ভাব নেই বললেই চলে।

জাতীয়ভাব যখন প্রবল হয়ে জাতীয়তাবোধে রূপলাভ করল তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ল মুঘলদের প্রতিপক্ষ করে হিন্দুদের বাহুবল প্রদর্শনের। তখন লেখকদের মধ্যে ঐতিহাসিক রোমান্স সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা জাতীয়তাবোধের পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে দেখি প্রবলভাবে। একদিকে সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিপ্লব প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনাবলী অপরদিকে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা, হিন্দু মহাসভার উদ্ভব, সামাজিক সংস্কারের জন্য ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী সে সময় ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ব্রাহ্মমতবাদ বিভক্ত হয়ে গেলে বাংলা সাহিত্যও সমাজে আবার পৌরাণিক মতের নতুনভাবে আবির্ভাব ঘটে। যা হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটায়। বঙ্কিমচন্দ্র হলেন এই নব আন্দোলন ও জাগরণের পুরোধা। তাইতো তার 'রাজসিংহ' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে হিন্দু বিদ্বেষী রূপে চিত্রিতকরণ এবং মারাঠা বীর শিবাজীকে উপস্থাপন।

রমেশচন্দ্র দত্ত একইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মানসপটে জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার বীজ বপণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি তার উপন্যাস রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মুঘলদের অনুগত হিন্দু রাজাদের সাহস, রণনৈপূন্য, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেছেন। আবার রাজপুত জাতী ও মারাঠা শক্তির উত্থান এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। মুঘল সম্রাট আকবরের বঙ্গবিজেতা সেনাপতি রাজা টোডরমলের রণনৈপুণ্য ও বীরত্বকে যেমন তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন তেমনি আবার মুঘল বিরোধী শক্তি মারাঠা বীর শিবাজীর অভ্যুত্থান ও প্রতাপসিংহের বীরত্ব গাথা ও জীবন আদর্শকে কেন্দ্র করেও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। এসব কিছুর মূলে ছিল বাঙালিকে জাতীয় জাগরণ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। এখানে রমেশচন্দ্র সম্পর্কে আর. সি. দত্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য "ইতিহাসের প্রতি স্বাভাবিক আবেগ ও আকর্ষণের জন্যই যে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন তাই নয়, গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কাহিনীগুলি বর্তমান যুগকে স্মরণ করানোই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য।"[৫]

যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার মাধ্যমে বাঙালি তথা হিন্দু জাতীয় জাগরণে প্রচেষ্ঠার কারণে বিদগ্ধ পাঠকের নিকট জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছেন ঠিক সেই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামাজিক উপন্যাস করুণা (১৮৭৭-৭৮) প্রকাশিত হয়। সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাসটি ততটা আলোচিত না হওয়ায় তিনি পরবর্তীতে 'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮২) ও রাজর্ষি (১৮৮৭) নামে দু'টি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র ধারার ইতিহাস চেতনার স্বরূপ প্রবর্তন করেন। যে কারণে তিনি বাঙালি ঐতিহাসিক দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম সারির স্থান অধিকার করে আছেন। তার নিকট মানুষের সুখ-দু:খ-বিরহ-মিলন, নর-নারীর আনন্দ-বেদনা পূর্ণ জীবন ইতিহাসের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। তাই তো 'বউঠাকুরাণীর হাটে' দেখিয়েছেন মুঘল বিদ্রোহী প্রতাপসিংহের কন্যা বিভার বিবাহ-বঞ্চনা এবং পুত্র উদয়াদিত্যের বৈরাগ্যপনা। রাজর্ষিতে মুঘল রাজবংশে উত্তরাধিকার যুদ্ধের নির্মম পরিহাসের শিকার শাহ সুজা আশ্রয় নিলেন গোবিন্দমাণিক্যের নিকট যিনি একই ধরনের ভ্রাতৃবিরোধের কারণে রাজ্য পরিত্যাগ করে ঋষিবেশ ধারণ করে চট্টগ্রামের অরণ্যাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

অপরদিকে প্রাচীন নিষ্ঠুর বলিদান প্রথার পুরোহিত রঘুপতি সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করায় গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন রাজমহলে সুজার নিকট উপস্থিত হয়ে। মুঘল-মাণিক্য রাজবংশের ঐতিহাসিক ঘটনা সংযোজন 'রাজর্ষিতে' প্রেম ও প্রতাপের আদর্শগত দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ মানবিক মূল্যবোধের চেতনাকে তুলে ধরেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র বিল্বন ঠাকুর হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জাত-কুল-মান ভুলে খাঁটি মনুষ্যত্ববোধের উজ্জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আর্ত-পীড়িত মানুষের মুক্তি সাধনে। এইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাসচেতনার স্বতন্ত্র স্বরূপ।[৬] তিনি বলিদান প্রথার মত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গোবিন্দমাণিক্যকে দাঁড় করিয়ে এক নতুন মানবতাবাদের দিক উন্মোচন করতে চেয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক ছিল হিন্দু পুনর্গঠনের যুগ। তাই সামাজিক প্রয়োজনেই তিনি 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষী'র মত উপন্যাস রচনা করেছেন। সেখানে ইতিহাসে এসেছে মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে তৎকালীন বাস্তব জীবনচিত্র। রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশিক আমলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই হয়ত জাতীয় সংকটের ধারণা ছিল তাঁর নিকট সুস্পষ্ট। হিন্দুর দুর অতীত এবং সমকালীন বৃটিশ শাসক নিয়েই ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। এটি তিনি উপলব্দি করতে পেরেছিলেন বলেই মধ্যযুগের মুঘলদের ইতিহাস তাঁর সৃষ্টিশীল রচনায় স্থান করে নিয়েছিল।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষণীয় যে, মীর মশাররফ হোসেন ব্যতীত সকল লেখকের লিখিত উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল মুঘল ইতিহাস। কখনও মুঘল ইতিহাস এসেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কখোনও বিশেষ কোন ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে, আবার কখনও মুঘল আদর্শের পক্ষে ও বিপক্ষে এমনকি তাদের কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি

করেও উপন্যাস রচিত হয়েছে। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ও ঘটনাবহুল মুঘল ইতিহাস নিয়ে লিখিত উপন্যাসে রোমান্স সৃষ্টি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশপ্রেম, স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিষ্ঠা করা হিন্দুদের অতীত ঐতিহ্যের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। অতীতে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে কোনভাবেই কম ছিলনা তা প্রমাণ করে, আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলাও মুঘলদের প্রতি জাতি বৈরীভাব দেখানোর কারণ হতে পারে।

ঔপন্যাসিকরা এক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন বলা যায়। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে নতুন ভাবাদর্শের জন্মলাভ, হিন্দু পুনর্জাগরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কখনও বিরোধ ও কখনও মিলন, সেই সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার মধ্যদিয়েই আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল এবং তার প্রসারও ঘটেছে সেভাবেই।[৭]

মীর মশাররফ হোসেনের লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিষাদ সিন্ধু' ছিল একটি ভিন্ন পটভূমিকায় লেখা। আলোচিত সকল লেখকের উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল ভারত-উপমহাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। কিন্তু মীর মশাররফ হোসেনের উপন্যাসের বিষয়বস্তু একেবারেই ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন দেশের ইতিহাস। সুদূর আরবদেশের ফোরাত নদীর তীরে কারবালার প্রান্তরে সংঘটিত বিষাদময় ও শোকাবহ হত্যাকাণ্ড, ইসলামের ইতিহাসে যার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই মর্মান্তিক ঘটনাকে উপজীব্য করে তিনি তার ঐতিহাসিক উপন্যাসটি রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি কালজয়ী সৃষ্টি। এক শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত উপন্যাসটি বাংলাভাষী সাহিত্য পিপাসুদের নিকট এখনও সমান জনপ্রিয়। তবে একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত সমাজের সমালোচকদের নিকট এই 'বিষাদ সিন্ধুর' শিল্পমূল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক হলেও এটি ভুললে চলবে না যে ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলিম সমাজের দ্বন্দ্বময় পরিবেশে থেকে লিখিত এই গ্রন্থ নি:সন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রথম মুসলিম সার্থক উপন্যাসিক। এক্ষেত্রে তাঁকে মুসলিম লেখকদের পথপ্রদর্শকও বলা যেতে পারে। 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার পাশাপাশি অনৈতিহাসিক ঘটনা ও কাল্পনিক চরিত্রের অবতারনার কারণে তিনি সমালোচিত হলেও বিষাদ-সিন্ধুর ভাষার বিদগ্ধ সমাজে প্রশংসিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। সে সময়ের অসংগঠিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবেশ ও সামাজিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে তিনি ঊনিশ শতকের পরিবর্তিত নতুন মধ্যবিত্ত

সমাজের বাংলা সাহিত্যের প্রাণবান ধারাটির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন। 'বিষাদ সিন্ধু'র সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক এর ভাষা। সেখানে তিনি মধুসূদন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

Z_¨wb‡‘k

১. নীহার রঞ্জন রায়, ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৭

২. নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৩. নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯-৩৪

৪. দিলওয়ার হোসেন, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাস ব্যবহার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৭

৫. আর. সি. দত্ত, নবভারতের স্রষ্টা রমেশ চন্দ্র দত্ত, ইম্পেরিয়াল বুকস, নতুন দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬, পৃ. ৮

৬. দিলওয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২০

৭. দিলওয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৩

mnvqK MšcwÄ

অঞ্জলি কাঞ্জিলাল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, আরব জাতির ইতিহাস, নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২/৩ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, এপ্রিল ১৯৮৩

অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ১৯৪৭, কলকাতা, রত্না প্রকাশন

অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম-মানস, পুস্তক বিপনী, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫

অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৯৯৭, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা

অসীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৮

আকবরনামা, (৩য় খন্ড) মূলের পৃ: ৫৮০ বেভারিজ কর্তৃক অনুবাদের পৃ: ৮৮৯ উদ্ধৃত- যদুনাথ সরকার

আবুল আহসান চৌধুরী মীর মশারফ হোসেন, সাহিত্যকর্ম ও সমাজ চিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬

আর. সি. দত্ত, নবভারতের স্রষ্টা রমেশ চন্দ্র দত্ত, ইম্পেরিয়াল বুকস, নতুন দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬

আব্দুল করিম, evi fBqv cwiwPZ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১ মার্চ ১৯৯২

আনন্দমঠ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং) ভূমিকা

আসাদুল করিম শাহীন (বফ.), ১৯৯৪, 'খালেদা জিয়া ঃ অনমনীয়, আপোষহীনতা পান মজুমদার' বেগম খালেদা জিয়া – আপোষহীন দেশনেত্রীর প্রতিকৃতি অনন্যা, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান, '‡Mkb»'bx, (প্রবন্ধ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী ১৯৭৬

আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৭১, কলিকাতা, মুক্তধারা, ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন

আহমদ শরীফ, বঙ্কিমবীক্ষা অন্য নিরিখে

এ. কে. এম. আবদুল আলীম, ভারতে মুসলিম রাজত্বে ইতিহাস, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

কালিকারঞ্জন কাননুগো, রাজস্থান কাহিনী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৮৪

কাশীনাথ ভট্টাচার্য, 'ভূদেব জীবনী', ১৩১৮, চুঁচুড়া

কে আলী, বাংলাদেশের ইতিহাস

কে আলী, fvivZxq Dcgnv‡'‡ki BwZnvm

কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, evsjv‡'k BwZnvm cwiµgv

খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ, ভারতের ইতিহাস, গ.অ.ওউ.ঝ

খান মোহাম্মদ শাহীন ও আক্তার রুমা (২০১২), "নারী ক্ষমতায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ একটি প্রাথমিক সমীক্ষা", ÿgZvqb, উইমেন ফর উইমেন, উইমেন ফর উইমেন ঃ গবেষণা ও পাঠচক্র

গোলাম হোসেন সলীম রিয়াজ, উসসালাতিন অনুবাদ, (শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত)

গৌরীহর মিত্র, বীরভূমের ইতিহাস, পৃথম খন্ড ১৯৪৩, দ্বিতয়ি খন্ড ১৯৪৫

ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ, এ শর্ট হিষ্ট্রি অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া

ড. এম. এ. ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, রয়েল লাইব্রেরী, ৩১/৩২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৮৯

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, প্রকাশক- শ্রী সুবজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩

দিলওয়ার হোসেন, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

দেবী (চৌধুরাণী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং) ভূমিকা

নীহারঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (রইস)

নীহার রঞ্জন রায়, ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রণব রঞ্জন ঘোষ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মনন ও সাহিত্য, ১৩৭৫, লেখাপড়া ১৮ বি শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, কলিকাতা ১৯২৫

প্রভাভাংশু মাইতি, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা,

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, e¨¼g cm½, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড) সাহিত্য সংসদ ১৩৭৬

বঙ্কিমচন্দ্র, 'আনন্দমঠ'

e¨¼g iPbvej x, ২য় খন্ড বাঙ্গালার ইতিহাস, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭৬

বঙ্কিমচন্দ্র, রাজসিংহ উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন দ্র:

বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলিকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, মাঘ ১৪০২

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ভূমিকা

ভবতোষ দত্ত, 'বঙ্কিমচন্দের ইতিহাস'

ভবতোষ দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

ভারতে মুসলমান সভ্যতা, অষ্টম অধ্যায় (হাবিবর ২৪৯)

ভূঁইয়া, মোঃ হাফিজ উদ্দীন (২০১২), "হোটেল-রেস্টুরেন্টে কর্মরত নারী-শ্রমিক ঃ ঢাকা মহানগরভিত্তিক একটি সমীক্ষা", ÿ gZvqb, উইমেন ফর উইমেন, উইমেন ফর উইমেন ঃ গবেষণা ও পাঠচক্র

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', ভূদেব রচনা সম্ভার

ভূদেব রচনা সম্ভার, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪, অগ্রহায়ণ, প্রকাশক : শ্রী প্রদোষ কুমার পাল, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কে. পি. রায় রোড, ২৪, পরগনা

ভূদেব রচনা সম্ভার, 'স্বফল স্বপ্ন'

মার্কস এঙ্গেলস, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রি:) প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১

মীর মশাররফ হোসেন, বিষাদ-সিন্ধ, এজিদ বদ পর্ব্ব, তৃতীয় প্রবাহ

মুকুন্দ মুখোপাধ্যায়, "ভূদেব চরিত" (প্রথম ভাগ) ইন্ডিয়া প্রেস,চুঁচুড়া

মুনীর চৌধুরী, তুলনামূলক সমালোচনা

মুনীর চৌধুরী, মীর মানস, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, তয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪

মুনীর চৌধুরী, বিষাদ সিন্ধু

মুহাম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৭১), ১৯৭৬, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭১, ঢাকা, আহম পাবলিশিং হাউজ

মোহিত লাল মজুমদার, e¼g eiY

যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্কিম রচনাবলী, উপন্যাস প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য, সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ, ১৩৭৬

যদুনাথ সরকার, দর্গেশনন্দিনীর ভূমিকা

যদুনাথ সরকার, রাজসিংহের ভূমিকা

রহমান, শেখ ফজলুর (২০০৪), শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জীবনসূচী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ, আশফাক-উল-আলম পরিচালক, গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', সাহিত্য রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ, ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, mwnZ¨ HwZnwmK Dcb¨vm, (মোহিতলাল)

রমেশ, রচনাসম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৯

রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৪৭), চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭৫, কলকাতা

রেখা মিশ্র, উইমেন ইন মোগল ইন্ডিয়া

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, e½v‡jvi BwZnvm, (প্রথম ভাগ), ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলিকাতা

রাজ নারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের পত্র, দ্রষ্টব্য: নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি কলকাতা ১৩৬১

শাহরিয়ার ইকবাল, মোঘল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী

শেখ হবিবর রহমান, 'আলমগীর', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮

শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলিকাতা-৭০০০৭৩, নবম পুনমুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৯২

শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৮৯, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা

শ্রী ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, কলিকাতা

শ্রী প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিম সরণী

শ্রী শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম জীবনী, ৩য় সং ১৩৩৮

শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, e¼gP›'

শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র,

ক্ষেত্রগুপ্ত, 'মীর মশাররফ হোসেন' সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৭

সতীশন্দ্র মিত্র, h‡kvi Ljbvi BwZnvm, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্ধৃত দেলোয়ার হোসেন

স্যার সৈয়দ আমীর আলী, 'এ শর্ট থিষ্ট্রি অব্ ম্যারাসিনস' – অনুবাদক হাবিব আহসান, এম. এ প্রকাশক, ৫৫, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা, ৭০০০৭৩, পৃঃ ৮০-৮৪

সুকুমার সেন, evsjv mvwn‡Z¨ M'¨, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৭৭

সুকুমার সেন, evsjv mvwn‡Z¨i BwZnvm, ২য় খন্ড ৩য় সংস্করণ, ১৩৬২

সুধাবসু, তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী-অনুবাদ

সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশ' বাঙলাদেশ, মনসুর মুসা সম্পাদিত, ১৯৭১, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান

সৈয়দ গোলাম হোসেন খান, সিয়ার-উল-মতাখখিরিন- বাংলা অনুবাদ মূল পারসী থেকে আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া

সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক উপন্যাস' ইতিহাস, বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ, ১ম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৫৮

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, fviZe‡li BwZnvm, প্রকাশক- পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

হুমায়ুন কবির, বাঙালার কাব্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৫, কলিকাতা, চতুর্বঙ্গ

Alexander Dow, (the History of Hindostan Vol.-1)

Aristotle, On the Art of Poetry, Classical Literary Criticism (Translated by T.S. Porsch) London, 1984 ed:

Begum, Najmin Nar, 1997, æWomen in Readymade Garment Industries : Issues and Concerns", The Journal of Social Development, Institute of Social Welfare and Research, Dhaka University, vol. 12, no. 1, December, Dhaka.

Charles Stewart, *History of Bengal,* 1st edition 1813

Dr. Sadiq Ali, A Vindication of Aurangzib, Kapurtliala,Punjab

Edward Gibbon, Dectine and Fall of the Roman Empire, Bury's ed

Hans Kohn, The Idea of Nationalism, New York, 1951

Hunter, Statistical Accountant of Bengal Vo.-VII

Irne Tinker, æThe Making of a Field: Advocates, Practitioners and Scholars", in Visvanathan, et al. (eds.), ***Women, Gender, and Development Reader*** (Zed Books, 1997)

J. N. Sarkar, Anecdotes of Aurangzib

Jadunat Sarkar, A Mughal Administration

Jadunath Sarkar, A Short History of Aurangzib (3rd ed.), Orient longman Ltd., India

Jadunath Sarkar, History of Bengal, vol. 11, Dacca, 1948

Jadunath Sarker, *The History of Bengal,* Vo. 4

James Grant Duff, ***A History of Maharattar***

James Tod (Lieutenant Colonel), Annals and Antiquities of Rajasthan or the central and western Rajpoot States of India. Vol-1, Rev. Edn Calcutta C.S.K. Lahari and Co. SA College Street 1894

James Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan or the central and western Rajput states, crooke, W Ed O.V.P 1920 Vol.-1

Jhon Oakesmith, Race and Nationality – An Enquiry into the Origin and Growth of Patriotism, London, 1919, Preface

Jogesh Chandra Bagla, *Bankim Rachanavali,* Edited Sahitya Samsal, 1969, Calcutta-9

John T. Rourke, ***International Politics on the World Stage*** (Dushkin/McGraw-Hill, 1997)

Kamruddin Ahmad, A Socio-political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Fourth Edition, 1975, Dacca, Inside Library

Karen Armstrong, ***Muhammad: A Biography of the Prophet*** (A Phoenix Press Paperback, 1991)

Muhammad Asad, ***The Road to Makkah*** (New Delhi: Adam Publishers, 2010)

Nathanial Hawthorne, the house of the Seven Gables, Oxford University Press, 1998, Preface, P. 1,

Niccolao Manucci (Venetion), Storia Do Mogor or Mogul India (1553-1708). William Irvine, Vol. 1, London, John Murray Albemarle Street Pub. for the Gat. as India, 1906

P. R. Sen, Western Influence in Bengali Literature, 3rd Ed., ১৯৬৬, Academic Publishers, 11, Panchan Ghose Lane, Calcutta-9, Quoted- P. ১০৯, Bhudeb – Charit

R. C. Majumdar, H. C. Ray Chaudhuri and Kalikinkar Datta, An Advanced History of India, Fourth Edition, Published – S. G. Wasani for MacMillan, India Limited

Raksa Misra, Women in Mughal India (1526-17. A. D) 1st Edn., 1967 (Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy) 1963, Munskiram Monohar, 10 B, Netaji Subhash Marg, Delhi- 6

Richard Chase, The American Novel and its Tradition, New Delhi, 1st Indian edition 1973

Robert Orme (F.A.S), Historical Fragment of the Mongul Empire of the morattoes, and of the English concern indostan from the year M.DC. LIX, London: printed for F. Wingrave, in the strand successor to Mr. Nourse M. DCCC, V (1805)

S. Lane Poole, Aurangzib (And the Deacay of the Mughal Empire) 1893

See, Qurratulain Hyder in her Foreword to ***Hali's Musaddas: A Story in Verse of the Ebb and Tide of Islam,*** translated from Urdu by Syeda Saiyidain Hameed (New Delhi: Harper Collins Publishers, 2005)

Sir Jadunath Sarkar, The History of Bengal, vol. 11

Stanly Lane Poole, Aurangzib (And the Decay of the Mughal Empire) 2nd Edn., Reph Quoted from Rulers of India, edt. by Sir Wilson Hunter

The Romance of History, India, Vol. 3, ১৮৩৬, Preface

V. D. Mahajan, The Sultanate of Delhi, 1963, New Delhi, India

Virginia Vargas, æWomen's Interests and Emancipatory Process", in Sing C. Chew and Robert A. Denemark (eds.), ***The Underdevelopment of Development*** (Essays in Honor of Andre Gunder Frank) (New Delhi: Sage Publications, reprinted in India in 1999)

W. H. Hudson, An Introduction to the Study of Literature, Imperial Books, New Delhi, 1st Edition, 1978

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

অঞ্জলি কাঞ্জিলাল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা

আব্দুর রহিম, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: রোমান্স প্রসঙ্গ, সুচয়নী পাবলিশার্স ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, আরব জাতির ইতিহাস, নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২/৩ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, এপ্রিল ১৯৮৩

অমলেন্দু দে., বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ১৯৪৭, কলকাতা, রত্না প্রকাশন

অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম-মানস, পুস্তক বিপনী, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫

অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৯৯৭, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা

অসীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৮

আকবরনামা, (৩য় খন্ড) মূলের পৃ: ৫৮০ বেভারিজ কর্তৃক অনুবাদের পৃ: ৮৮৯ উদ্ধৃত- যদুনাথ সরকার

আবুল আহসান চৌধুরী মীর মশারফ হোসেন, সাহিত্যকর্ম ও সমাজ চিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬

আর. সি. দত্ত, নবভারতের স্রষ্টা রমেশ চন্দ্র দত্ত, ইম্পেরিয়াল বুকস, নতুন দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬

আব্দুল করিম, evifBqv cwiwPZ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১ মার্চ ১৯৯২

আনন্দমঠ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং) ভূমিকা

আসাদুল করিম শাহীন (বফ.), ১৯৯৪, 'খালেদা জিয়া ঃ অনমনীয়, আপোষহীনতা পান মজুমদার' বেগম খালেদা জিয়া – আপোষহীন দেশনেত্রীর প্রতিকৃতি অনন্যা, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান, '‡Mkb»'bx, (প্রবন্ধ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী ১৯৭৬

আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৭১, কলিকাতা, মুক্তধারা, ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন

আহমেদ শরীফ, বঙ্কিমবীক্ষা অন্য নিরিখে

এ. কে. এম. আবদুল আলীম, ভারতে মুসলিম রাজত্বে ইতিহাস, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

কালিকারঞ্জন কাননুগো, রাজস্থান কাহিনী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৮৪

কাশীনাথ ভট্টাচার্য, 'ভূদেব জীবনী', ১৩১৮, চুঁচুড়া

কে আলী, বাংলাদেশের ইতিহাস

কে আলী, fvivZxq Dcgnv‡'‡ki BwZnvm

কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, evsjv‡'k BwZnvm cwiµgv

খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ, ভারতের ইতিহাস, গ.অ.ওউ.ঝ

খান মোহাম্মদ শাহীন ও আক্তার রুমা (২০১২), "নারী ক্ষমতায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ একটি প্রাথমিক সমীক্ষা", ÿgZvqb, উইমেন ফর উইমেন, উইমেন ফর উইমেন ঃ গবেষণা ও পাঠচক্র

গোলাম হোসেন সলীম রিয়াজ, উসসালাতিন অনুবাদ, (শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত)

গৌরীহর মিত্র, বীরভূমের ইতিহাস, পৃথম খন্ড ১৯৪৩, দ্বিতয়ি খন্ড ১৯৪৫

ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ, এ শর্ট হিষ্ট্রি অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া

ড. এম. এ. ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, রয়েল লাইব্রেরী, ৩১/৩২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৮৯

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, প্রকাশক- শ্রী সুবজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩

দিলওয়ার হোসেন, বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

দেবী (চৌধুরাণী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং) ভূমিকা

নীহারঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (রইস)

নীহার রঞ্জন রায়, ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রণব রঞ্জন ঘোষ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মনন ও সাহিত্য, ১৩৭৫, লেখাপড়া ১৮ বি শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, কলিকাতা ১৯২৫

প্রভাভাংশু মাইতি, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা,

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, e¼g cm½, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড) সাহিত্য সংসদ ১৩৭৬

e¼g iPbvejx, ২য় খন্ড বাঙ্গালার ইতিহাস, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭৬

বঙ্কিমচন্দ্র, রাজসিংহ উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন দ্রঃ

বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলিকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, মাঘ ১৪০২

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ভূমিকা

ভবতোষ দত্ত, 'বঙ্কিমচন্দের ইতিহাস'

ভবতোষ দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

ভারতে মুসলমান সভ্যতা, অষ্টম অধ্যায় (হাবিবর ২৪৯)

ভূঁইয়া, মোঃ হাফিজ উদ্দীন (২০১২), "হোটেল-রেস্টুরেন্টে কর্মরত নারী-শ্রমিক ঃ ঢাকা মহানগরভিত্তিক একটি সমীক্ষা", ÿgZvqb, উইমেন ফর উইমেন, উইমেন ফর উইমেন ঃ গবেষণা ও পাঠচক্র

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', ভূদেব রচনা সম্ভার

ভূদেব রচনা সম্ভার, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪, অগ্রহায়ণ, প্রকাশক : শ্রী প্রদোষ কুমার পাল, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কে. পি. রায় রোড, ২৪, পরগনা

ভূদেব রচনা সম্ভার, 'স্বফল স্বপ্ন'

মার্কস এঙ্গেলস, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রিঃ) প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১

মীর মশাররফ হোসেন, বিষাদ-সিন্ধ, এজিদ বদ পর্ব্ব, তৃতীয় প্রবাহ

মুকুন্দ মুখোপাধ্যায়, "ভূদেব চরিত" (প্রথম ভাগ) ইন্ডিয়া প্রেস,চুঁচুড়া

মুনীর চৌধুরী, তুলনামূলক সমালোচনা

মুনীর চৌধুরী, মীর মানস, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, তয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪

মুনীর চৌধুরী, বিষাদ সিন্ধু

মুহাম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৭১), ১৯৭৬, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭১, ঢাকা, আহম পাবলিশিং হাউজ

মোহিত লাল মজুমদার, e¼g eiY

যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্কিম রচনাবলী, উপন্যাস প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য, সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ, ১৩৭৬

যদুনাথ সরকার, দর্গেশনন্দিনীর ভূমিকা

যদুনাথ সরকার, রাজসিংহের ভূমিকা

রহমান, শেখ ফজলুর (২০০৪), শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জীবনসূচী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ, আশফাক-উল-আলম পরিচালক, গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', সাহিত্য রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ, ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, mwnZ¨ HwZnwmK Dcb¨vm, (মোহিতলাল)

রমেশ, রচনাসম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৯

রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৪৭), চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭৫, কলকাতা

রেখা মিশ্র, উইমেন ইন মোগল ইন্ডিয়া

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, ev½v‡jvi BwZnvm, (প্রথম ভাগ), ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলিকাতা

রাজ নারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের পত্র, দ্রষ্টব্য: নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি কলকাতা ১৩৬১

শাহরিয়ার ইকবাল, মোঘল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী

শেখ হবিবর রহমান, 'আলমগীর', ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮

শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলিকাতা-৭০০০৭৩, নবম পুনমুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৯২

শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৮৯, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা

শ্রী ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, কলিকাতা

শ্রী প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিম সরণী

শ্রী শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম জীবনী, ৩য় সং ১৩৩৮

শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, e¼gP›'

শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র,

ক্ষেত্রগুপ্ত, 'মীর মশাররফ হোসেন' সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৭

সতীশন্দ্র মিত্র, h‡kvi Ljbvi BwZnvm, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্ধৃত দেলোয়ার হোসেন

স্যার সৈয়দ আমীর আলী, 'এ শর্ট থিষ্ট্রি অব্ ম্যারাসিনস' – অনুবাদক হাবিব আহসান, এম. এ প্রকাশক, ৫৫, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা, ৭০০০৭৩, পৃ: ৮০-৮৪

সুকুমার সেন, evsjv mwn‡Z¨ M'¨, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৭৭

সুকুমার সেন, evsjv mwn‡Z¨i BwZnvm, ২য় খন্ড ৩য় সংস্করণ, ১৩৬২

সুধাবসু, তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী-অনুবাদ

সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশ' বাঙলাদেশ, মনসুর মুসা সম্পাদিত, ১৯৭১, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান

সৈয়দ গোলাম হোসেন খান, সিয়ার-উল-মতাখখিরিন- বাংলা অনুবাদ মূল পারসী থেকে আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া

সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক উপন্যাস' ইতিহাস, বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ, ১ম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৫৮

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, fvivZe‡li BwZnvm, প্রকাশক- পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

হুমায়ুন কবির, বাঙালার কাব্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৫, কলিকাতা, চতুরঙ্গ

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Alexander Dow, (the History of Hindostan Vol.-1)

Aristotle, On the Art of Poetry, Classical Literary Criticism (Translated by T.S. Porsch) London, 1984 ed:

Begum, Najmin Nar, 1997, æWomen in Readymade Garment Industries : Issues and Concerns", The Journal of Social Development, Institute of Social Welfare and Research, Dhaka University, vol. 12, no. 1, December, Dhaka.

Charles Stewart, *History of Bengal,* 1st edition 1813

Dr. Sadiq Ali, A Vindication of Aurangzib, Kapurtliala,Punjab

Edward Gibbon, *Dectine and Fall of the Roman Empire,*

Hans Kohn, The Idea of Nationalism, New York, 1951

Hunter, Statistical Accountant of Bengal Vo.-VII

Irne Tinker, æThe Making of a Field: Advocates, Practitioners and Scholars", in Visvanathan, et al. (eds.), ***Women, Gender, and Development Reader*** (Zed Books, 1997)

J. N. Sarkar, Anecdotes of Aurangzib

Jadunat Sarkar, A Mughal Administration

Jadunath Sarkar, A Short History of Aurangzib (3rd ed.), Orient longman Ltd., India

Jadunath Sarkar, History of Bengal, vol. 11, Dacca, 1948

Jadunath Sarker, *The History of Bengal,* Vo. 4

James Grant Duff, ***A History of Maharattar***

James Tod (Lieutenant Colonel), Annals and Antiquities of Rajasthan or the central and western Rajpoot States of India. Vol-1, Rev. Edn Calcutta C.S.K. Lahari and Co. SA College Street 1894

James Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan or the central and western Rajput states, crooke, W Ed O.V.P 1920 Vol.-1

Jhon Oakesmith, Race and Nationality – An Enquiry into the Origin and Growth of Patriotism, London, 1919, Preface

Jogesh Chandra Bagla, *Bankim Rachanavali,* Edited Sahitya Samsal, 1969, Calcutta-9

John T. Rourke, ***International Politics on the World Stage*** (Dushkin/McGraw-Hill, 1997)

Kamruddin Ahmad, A Socio-political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Fourth Edition, 1975, Dacca, Inside Library

Karen Armstrong, ***Muhammad: A Biography of the Prophet*** (A Phoenix Press Paperback, 1991)

Muhammad Asad, ***The Road to Makkah*** (New Delhi: Adam Publishers, 2010)

N. Manucei, Storio do Mogor, Vol. 11

Niccolao Manucci (Venetion), Storia Do Mogor or Mogul India (1553-1708). William Irvine, Vol. 1, London, John Murray Albemarle Street Pub. for the Gat. as India, 1906

P. R. Sen, Western Influence in Bengali Literature, 3rd Ed., 1966, Academic Publishers, 11, Panchan Ghose Lane, Calcutta-9, Quoted- P. 109, Bhudeb – Charit

R. C. Majumdar, H. C. Ray Chaudhuri and Kalikinkar Datta, An Advanced History of India, Fourth Edition, Published – S. G. Wasani for MacMillan, India Limited

Raksa Misra, Women in Mughal India (1526-17. A. D) 1st Edn., 1967 (Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy) 1963, Munskiram Monohar, 10 B, Netaji Subhash Marg, Delhi- 6

Richard Chase, The American Novel and its Tradition, New Delhi, 1st Indian edition 1973, D×…Z, Avãyi iwng, ew¼gP‡›`ªi Dcb¨vm †ivgvÝ cÖm½ NyPqbx cvewjkvm©, XvKv, cÖ_g cÖKvk, 208

Robert Orme (F.A.S), Historical Fragment of the Mongul Empire of the morattoes, and of the English concern indostan from the year M.DC. LIX, London: printed for F. Wingrave, in the strand successor to Mr. Nourse M. DCCC, V (1805)

S. Lane Poole, Aurangzib (And the Deacay of the Mughal Empire) 1893

See, Qurratulain Hyder in her Foreword to ***Hali's Musaddas: A Story in Verse of the Ebb and Tide of Islam,*** translated from Urdu by Syeda Saiyidain Hameed (New Delhi: Harper Collins Publishers, 2005)

Sir Jadunath Sarkar, The History of Bengal, vol. 11

Sir Mutaquorin, Vol. 11, ew¼gP‡›`ªi Dcb¨vm fe‡Zvl

Sir Judunath Sarkar, A Short history of Aurangzib....

Stanly Lane Poole, Aurangzib (And the Decay of the Mughal Empire) 2nd Edn., Reph Quoted from Rulers of India, edt. by Sir Wilson Hunter

The Romance of History, India, Vol. 3, 1836, Preface

V. D. Mahajan, The Sultanate of Delhi, 1963, New Delhi, India

Virginia Vargas, æWomen's Interests and Emancipatory Process", in Sing C. Chew and Robert A. Denemark (eds.), ***The Underdevelopment of Development*** (Essays in Honor of Andre Gunder Frank) (New Delhi: Sage Publications, reprinted in India in 1999)

W. H. Hudson, An Introduction to the Study of Literature, Imperial Books, New Delhi, 1st Edition, 1978

Wraxall, *History of my own times,*